প্রখ্যাত সাহাবী হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা.)-এর
জীবনভিত্তিক ঐতিহাসিক উপন্যাস

নাঙ্গা তলোয়ার

৫

এনায়েতুল্লাহ আলতামাশ

প্রখ্যাত সাহাবী হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা)-এর
জীবনভিত্তিক উপন্যাস

নাঙ্গা তলোয়ার

(৫ম খণ্ড)

প্রখ্যাত সাহাবী হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা)-এর
জীবনভিত্তিক উপন্যাস

(৫ম খণ্ড)

মূলঃ
এনায়েতুল্লাহ্ আলতামাশ

অনুবাদঃ
মাওলানা আলমগীর হোসাইন
উস্তাদ ঃ জামিয়াতুস সুন্নাহ
শিবচর, মাদারীপুর

আল হিকমাহ্ পাবলিকেশন্স
(মাতৃভাষা বাংলায় বিশুদ্ধভাবে ইসলামকে সর্বস্তরে পৌঁছানোর একটি প্রয়াস)
১১/১, ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন : ০১৯১৫৫২৭২২৫, ০১৮১৯৪২৩৩২১

উৎসর্গ

তাঁদের প্রতি
যাঁদের সাধনা ও ত্যাগের বিনিময়,
ইসলামের সত্যবাণী
উদ্ভাসিত হয়েছে বিশ্বময় ॥

ভূমিকা

হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা) ইসলামের ঐ তলোয়ারের নাম যা কাফেরদের বিরুদ্ধে চিরদিন খোলা থাকে। হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) 'সাইফুল্লাহ্' – 'আল্লাহর তরবারী'– উপাধিতে ভূষিত করেছেন। তিনি নাম করা ঐ সকল সেনাপতি সাহাবীদের অন্যতম যাঁদের অবদানে ইসলামের আলো দূর-দূরান্তে পৌছতে পেরেছে। শুধু ইসলামী ইতিহাস নয়; বিশ্ব সমরেতিহাসও হযরত খালিদ (রা)-কে শ্রেষ্ঠ সেনাপতিদের কাতারে গণ্য করে থাকে। প্রখ্যাত সমরবিদ, অভিজ্ঞ রণকুশলী এবং স্বনামধন্য বিশেষজ্ঞগণও হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা)-এর রণকৌশল, তুখোর নেতৃত্ব, সমরপ্রজ্ঞা, প্রত্যুৎপন্নমতীত্ব এবং বিচক্ষণতার স্বীকৃতি দিয়ে থাকেন।

প্রতিটি রণাঙ্গণে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য। কাফেরদের সংখ্যা কোথাও দ্বিগুণ, কোথাও তিনগুণ। ইয়ারমুকের যুদ্ধে রোম সম্রাট এবং তার মিত্র গোত্রসমূহের সৈন্য ছিল ৪০ হাজারের মত। শত্রুর সৈন্য সারি সুদূর ১২ মাইল প্রলম্বিত, এর মধ্যে কোথাও ফাঁক ছিল না। অপরদিকে, মুসলমানরা (শত্রুবাহিনীর দেখাদেখি) নিজেদের সৈন্যদের ১১ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত করতে সক্ষম হয়। তাও প্রতি দু'জনের মাঝে যথেষ্ট ব্যবধান ছিল।

শত্রুসৈন্যের বিন্যস্ত সারিও বৃহদাকার ছিল। সৈন্যরা একের পর এক সাজানো ছিল। একজনের পিছনে আরেকজন দাঁড়ানো। যেন একটি প্রাচীরের পিছনে আরেক প্রাচীর খাঁড়া। এর বিপরীতে মুসলমানদের সৈন্য বিন্যাসের গভীরতা ছিল না বললেই চলে।

ইতিহাস মুক। সমর বিশেষজ্ঞগণ বিস্মিত। সকলের অবাক জিজ্ঞাসা– ইয়ারমুকের যুদ্ধে মুসলমানরা রোমীয়দের কিভাবে পরাজিত করল? রোমীয়দের সেদিন চূড়ান্ত পরাজয় ঘটেছিল। এ অবিশ্বাস্য ঘটনার পর বাইতুল মুকাদ্দাস পাকা ফলের মত মুসলমানদের ঝুলিতে এসে পড়েছিল।

এটা ছিল অভূতপূর্ব সমর কুশলতার ফল। ইয়ারমুক যুদ্ধে হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা) যে সফল রণ-কৌশল অবলম্বন করেছিলেন তা আজকের উন্নত রাষ্ট্রের সেনা প্রশিক্ষণে গুরুত্বের সাথে তা ট্রেনিং দেয়া হয়।

হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা) এটা মানতে রাজি ছিলেন না যে, দুশমনের সৈন্যসংখ্যা বেশী হলে এবং তাদের রণসম্ভার অত্যাধুনিক ও উন্নত হলে আর মুসলমানরা সংখ্যায় কম হলে শত্রুর মুখোমুখি হওয়া উদ্বেগজনক ও আত্মঘাতী হবে। এমন ঘটনাও তাঁর বর্ণাঢ্য জীবনে ঘটেছে যে, তিনি সরকারী নির্দেশ এড়িয়ে শত্রুর উপর আক্রমণ করে শ্বাসরুদ্ধকর বিজয় ছিনিয়ে এনেছেন। এটা তাঁর প্রগাঢ় ঈমান এবং দৃঢ় প্রত্যয়ের ফসল ছিল। ইসলাম এবং রাসূল (সা.)-এর প্রতি অগাধ ভালবাসার চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ছিল।

এ ছাড়া হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা)-এর ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ। যে কোন পাঠক শ্রোতাই তাতে চমৎকৃত হয়। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা) হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা)-কে প্রধান সেনাপতির পদ থেকে অপসারণ করলে তিনি এতটুকু বিচলিত কিংবা

ভগ্নাহত হননি। খলিফার নির্দেশের সাথে সাথে সেনাপতির আসন থেকে নেমে গেছেন সাধারণ সৈনিকের কাতারে। সেনাপতি থাকা অবস্থায় যেমন শৌর্য-বীর্য প্রদর্শন করেছেন, সৈনিক অবস্থায় তার থেকে মোটেও কম করেননি। ইয়ারমুক যুদ্ধশেষে হযরত ওমর (রা) এক অভিযোগে হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা)-কে মদীনায় তলব করেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে মদীনায় এসে উপস্থিত হন এবং আদালতের কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়ান। প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী সেনাপতির সাথে 'অসেনাপতিসুলভ' আচরণ করলেও হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা)-এর প্রতিক্রিয়া এমন শান্ত ছিল যে, হযরত উমর (রা)-কে এর জন্য একটুও চাপের সম্মুখীন হতে হয়নি। তিনি অবনত মস্তকে খলিফার নির্দেশ শিরোধার্য বলে মেনে নেন। প্রদত্ত শাস্তি অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করেন।

হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা)-বরখাস্তের দরুণ দুঃখিত হন ঠিকই কিন্তু তাই বলে খলিফার বিরুদ্ধে তিনি টুশব্দটি করেননি। খলিফাকে ক্ষমতাচ্যুত করার কল্পনাও মাথায় আনেননি। নিজস্ব বাহিনী তৈরী করেননি। পৃথক রণাঙ্গন সৃষ্টি করেননি। তিনি এমন কিছু করতে চাইলে পুরো সেনাবাহিনী থাকত তাঁর পক্ষে। জাতির চোখে তিনি অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তিত্ব এবং শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। ইতোমধ্যে দু'টি বিশাল সমরশক্তিকে ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেয়ায় তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল আকাশচুম্বী। এক ছিল পরাক্রমশালী ইরানী শক্তি আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে অপর পরাক্রমশালী রোম শক্তি। হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা) তাদেরকে চরম নাকানি-চুবানি খাইয়ে পরাজিত করে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমা ইরাক এবং সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। খেলাফতের প্রতি ছিল তাঁর অসীম শ্রদ্ধা। তিনি খলিফার সিদ্ধান্তে রুখে দাঁড়ান না। তিনি নিজের সম্মান-মর্যাদার কথা বিবেচনা না করে মাননীয় খলিফার মর্যাদা সমুন্নত রাখেন।

হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা)-এর পরিচয়, ইসলামের প্রতি তাঁর অবদান এবং বর্তমান মুসলমানরা তাঁর থেকে কি আদর্শ গ্রহণ করতে পারে–বক্ষমাণ উপন্যাসে পাঠক তা মর্মে মর্মে অনুধাবন করতে পারবেন।

ইসলামের ইতিহাস অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ির সম্মুখীন হয়েছে। বিভিন্ন ঐতিহাসিক এবং জীবনীকার কোন কোন ঘটনায় পদস্খলনের শিকার হয়েছেন। একই ঘটনা একাধিকরূপে চিত্রিত হয়েছে। ফলে তা হতে সত্য ও বাস্তব তথ্য আহরণ পাঠকের জন্য গলদঘর্মের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।...

এ উপন্যাসের প্রত্যেকটি ঘটনা সত্য-সঠিকরূপে পেশ করতে আমরা বহু গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছি। সম্ভাব্য যাচাই-বাছাই করেছি এবং অনেক পরীক্ষা- নিরীক্ষার পর তা লিখেছি।) মাঝে মাঝে এমন স্থানে এসে হোচট খেয়েছি যে, কোন্‌টা বাস্তবভিত্তিক আর কোন্‌টা ধারণা নির্ভর–তা শনাক্ত করা প্রায় অসম্ভব ছিল। সেক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য তথ্য-সূত্রের উপর ভিত্তি করে বাস্তবতা উদ্ধারের প্রয়াস পেয়েছি। এ কারণে মতান্তর ঘটবে; আর তা ঘটাই স্বাভাবিক। তবে এ মতবিরোধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং অপ্রসিদ্ধ ঘটনায় গিয়ে প্রকাশিত হবে মাত্র।

যে ধাঁচে এ বীরত্ব-গাঁথা রচিত, তার আলোকে এটাকে কেউ উপন্যাস বললে বলতে পারে, কিন্তু এটা ফিল্মি স্টাইল এবং মনগড়া কাহিনী ভরপুর বাজারের অন্যান্য ঐতিহাসিক উপন্যাসের মত নয়। এর পাঠক উপন্যাসের চাটনিতে 'ঐতিহাসিকতার পথ্য' গলধঃকরণ করবেন গোগ্রাসে। এতে ঐতিহাসিকতা বেশী, ঔপন্যাসিকতা কম।

এটা কেবল ইতিহাস নয়, ইসলামী ঐতিহ্যের অবয়ব। মুসলমানদের ঈমানদীপ্ত ঝাণ্ডা। পূর্বপুরুষের গৌরব-গাঁথা এবং মুসলিম জাতির জিহাদী জযবার প্রকৃত চিত্র। পাঠক মুসলিম জাতির স্বকীয়তা জানবেন, সাহিত্যরস উপভোগ করবেন এবং রোমাঞ্চ অনুভব করবেন।

বাজারের প্রচলিত চরিত্রবিধ্বংসী উপন্যাসের পরিবর্তে সত্যনির্ভর এবং ইসলামী ঐতিহ্যজাত উপন্যাস পড়ুন। পরিবারের অপর সদস্যদের পড়তে দিন। নিকটজনদের হাতে হাতে তুলে দিন মুসলিম জাতির এ গৌরবময় উপাখ্যান।

এনায়েতুল্লাহ্ আলতামাশ
লাহোর, পাকিস্তান

প্রকাশকের মিনতি

╟► সম্মানিত পাঠকবৃন্দের প্রতি এটি আমাদের একটি আনন্দঘন আয়োজন। মজাদার পরিবেশনা। ইতিহাসের উপাদান, সাহিত্যের ভাষা আর উপন্যাসের চাটনিতে ভরপুর এর প্রতিটি ছত্র। শ্বাসরুদ্ধকর কাহিনী ঝরঝরে বর্ণনা আর রুচিশীল উপস্থাপনার অপূর্ব সমন্বয় আপনার হাতের এই *নাঙ্গা তলোয়ার*।

╟► পাঠক অবশ্যই মুগ্ধ হবেন। লাভ করবেন অনাবিল আনন্দ। তুলবেন তৃপ্তির ঢেকুর। নাঙ্গা তলোয়ারের ৫ম খণ্ডের আত্মপ্রকাশের এ শুভ মুহূর্তে আমরা এ ব্যাপারে গভীর আশাবাদী।

╟► ***শমশীরে বে-নিয়াম***-এর ভাষান্তর ***নাঙ্গা তলোয়ার***, মূল লেখক এনায়েতুল্লাহ্ আলতামাশ। পাকিস্তানের জনপ্রিয় এই লেখকের সাথে বাংলাদেশের পাঠকবৃন্দকে নতুন করে পরিচয় করানোর কোন প্রয়োজন আছে বলে আমাদের মনে হয় না। ইতোমধ্যে তাঁর জ্ঞানদীপ্ত হাতের একাধিক উপন্যাস বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়ে সারাদেশে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। বাংলার জনগণ এমন ঔপন্যাসিক পেয়ে বড়ই গর্বিত এবং আনন্দিত। এর জলন্ত প্রমাণ হলো – তাঁর কোন উপন্যাস ছেপে বাজারে আসতে দেরী, ছাপা ফুরাতে দেরী না।

╟► এনায়েতুল্লাহ্ আলতামাশ-এর এমনি একটি অনবদ্য উপন্যাস ***শমশীরে বে-নিয়াম*** যা এখন বাংলায় অনূদিত হয়ে ***নাঙ্গা তলোয়ার*** নামে আপনার হাতে।

╟► সবটুকু মেধা, যোগ্যতা, অধ্যাবসায় সেঁচে পাঠকের রুচিসম্মত মুক্তা-মানিক্য উপহার দিতে আমরা একটুও কার্পণ্য করিনি। ভুল-ভ্রান্তি এড়িয়ে যাবার প্রাণান্ত প্রয়াস চালিয়েছি। পাঠক এ গ্রন্থ হতে জানতে পারবে মর্দে মুজাহিদ সাহাবী (রা)দের ঈমানদীপ্ত চেতনা, হযরত খালিদ (রা)-এর দুঃসাহসিক অভিযান ও বীরত্বগাঁথা। এবং লাভ করবেন মুসলিম মানসের দৃঢ়চেতা মনোবল। পাঠক সামান্যতম উপকৃত হলেও আমাদের শ্রম সার্থক হবে। অনুবাদের মূল উদ্দেশ্য পাবে বাস্তবতা। আল্লাহ্ আমাদের সকলকে কবুল করুন। আমীন!

নিরাশা, হতাশা, দুশ্চিন্তা ও দুঃখ-বেদনা আযাদাবাহকে ঘিরে রেখেছে। সাথে সাথে এক ধরনের ত্রাস ও ভীতিও তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। সব মিলিয়ে তার অবস্থা এমন হয়েছে, যেন তার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়েছে আর পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গিয়েছে। সে ঝুঁকে ঝুঁকে প্রাচীরের উপর দিয়ে চলছে। তার পা কাঁপছিল। প্রভুর এই নাজুক অবস্থা দেখে তার দুই দেহরক্ষী দ্রুত পাশে এসে দাঁড়ায়। সে ডানে বামে উদাস ও হতাশাপূর্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে থেমে যায়। দুই পাশে দুই দেহরক্ষী দেখে তার চেহারা মলিন হয়ে যায়।

"আমি তোমাদের সাহায্য ছাড়াই চলতে পারব" সে দেহরক্ষীদের উদ্দেশে বলে "আমার সামনে আসার দুঃসাহস করো না"।

তার ধমকে দেহরক্ষী কয়েক কদম পেছনে সরে যায়। আযাদাবাহ অবনত মস্তক উপরে তুলে সম্মুখপানে অগ্রসর হয়। কিন্তু তার কাঁধ তাকে সহযোগিতা করে না। ক্রমেই তার কাঁধের বাঁধন ঢিলে হতে থাকে এবং এক সময় কাঁধ দু'দিকে ঢলে যায়। যেন তার কাঁধে এমন ভারী বোঝা চাপানো হয়েছে যা বহন করা তার সাধ্যের বাইরে। বোঝা তো তার কাঁধে আগেই চেপে ছিল। তা ছিল দায়িত্বের বোঝা। হীরা ছিল তার দায়িত্বের অন্তর্গত। এখানে তার পুত্র ছিল প্রধান সহযোগী। কিন্তু সে-ও আজ পাশে নেই।

সম্রাট উরদূশেরের অত্যন্ত প্রিয়ভাজন ও আস্থাভাজন ছিল আযাদাবাহ। উরদূশের তাকে ডান হাত মনে করত। কিন্তু উরদূশের ছাড়া আর কারো কাছে তার মূল্য ছিল না। উরদূশের তাকে বিশাল মর্যাদা দিয়ে রেখেছিল। সে হীরার মত গুরুত্বপূর্ণ শহর ও তার সীমান্তবর্তী এলাকার শাসনকর্তা ছিল। অনেক এলাকার সে ছিল স্বাধীন একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী। এসব কিছুই ছিল সম্রাট উরদূশেরের বদান্যতার ফল। সে-ই তাকে এই বিশাল মর্যাদা ও ক্ষমতার আসনে আসীন করে রেখেছিল। কিন্তু সেই উরদূশেরও আজ মৃত। পরবর্তী সম্রাট হয়ে পারস্যের রাজ সিংহাসনে যিনি আরোহণ করবেন, তার থেকে আযাদাবাহ তত বেশি মর্যাদা পাওয়ার আশাবাদী ছিল না। মদীনার মুজাহিদেরা বাস্তবিকই তার পায়ের তলা থেকে মাটি ছিনিয়ে নিয়েছিল।

"কিন্তু কেন?" তার এক সালার তাকে এই কথা তখন বলে, যখন সে নিজের শাহী মহলের খাস কামরায় গিয়ে পৌঁছেছিল। সালার তাকে বলে "মনে হচ্ছে যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই আপনি পরাজয় মেনে নিয়েছেন"। "আপনার পুত্রের খুনী মদীনার বদ্দুদের ক্ষমা করে দিবেন?" তার নিহত পুত্রের মা রাগত স্বরে প্রশ্ন ছুঁড়ে মারে।

"আমাকে ভাবতে দাও" আযাদাবাহ গর্জে ওঠে·কিন্তু তার গর্জন ছিল কাঁপাকাঁপা। সে বলে, "তোমরা কী মনে করেছ যে, আমি মুসলমানদের সামনে অস্ত্র সমর্পণ করছি? তোমরা কি শোননি?" সহসা তার কণ্ঠ নিচু হয়ে যায়। ধরা গলায় বলে, "সম্রাট উরদূশের মারা গেছেন"।

কক্ষে মুহূর্তে পিনপতন নীরবতা নেমে আসে।

"সম্রাট মারা গেছেন?" আযাদাবাহ-এর স্ত্রী কথাটি এমনভাবে বলে যেন সে দীর্ঘশ্বাস নিচ্ছিল। "উরদূশের মারা গেছেন ... আমার পুত্রও নিহত"।

অতঃপর সে আযাদাবাহ-এর দিকে তাকিয়ে উচ্চ আওয়াজে বলে "যরথুস্ত্র আমাদের তার অপমানের শাস্তি দিচ্ছেন। এখন আমাদের ঐ আগুনে পুড়ে ভস্ম হওয়ার বিকল্প নেই, যে আগুনকে আমরা পূজা করি। আপনি যরথুস্ত্রের উৎসর্গস্থলে গিয়ে নিজের রক্ত-জানের এই নজরানা পেশ করতে পারেন যে, কোনো একজন মুসলমানকেও এখান থেকে জীবন নিয়ে ফিরতে দিবেন না?"

ইত্যবসরে এক দেহরক্ষী ভেতরে এসে দাঁড়ায়। এক ঘণ্টা যাবত ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থেকে সে আযদাবাহকে সালাম দিয়ে বলে "দূত এসেছে"। আযদাবাহকে নিরুত্তর দেখে তার স্ত্রী দূতকে পাঠিয়ে দিতে বলে।

দেহরক্ষী বাইরে যেতেই এক সিপাহি ভেতরে প্রবেশ করে। সে-ও ঘণ্টা খানেক দাঁড়িয়ে থেকে সালাম জানায়। আযাদাবাহ উদাস দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায়।

"মদীনাবাসীদের নৌযানগুলো বাঁধ পেরিয়ে অনেক সামনে এগিয়ে এসেছে" দূত জানায় "তাদের গতি খুব দ্রুত"।

"সৈন্য সংখ্যা কত হতে পারে?" আযাদাবাহ জানতে চায়।

"জনাব! আমাদের অর্ধেকও নয়" দূত জবাব দেয় "আমার ধারণা মতে ২০ হাজারও হবে না।"

"আমরা তাদের ঘোড়ার পদতলে পিষ্ট করে ফেলব।" সালার বলে "আপনি সর্বাধিনায়ক; নির্দেশ দিন, আমরা ফোরাতের মধ্যেই তাদের উপর তীরের বৃষ্টি বর্ষণ করব। নৌযানগুলো তাদের লাশ ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।

"তীরের বৃষ্টি বর্ষণের পূর্বে দরিয়ার পাড় পর্যন্ত পৌঁছার জন্য একটি লড়াইয়ের প্রয়োজন হবে।" দূত বলে "তাদের অনেক অশ্বারোহী দরিয়ার উভয় পাড় দিয়ে নৌযানগুলোর সঙ্গে সঙ্গে আসছে। আমি এটাও জানতে পেরেছি যে,

অশ্বারোহীদের কমান্ডার হলো মুসান্না বিন হারেছা এবং বেশির ভাগ সৈন্য হলো পারস্য সম্রাটের মুসলমান বাসিন্দারা। আর যে নৌযানে চড়ে তারা আসছে, সেগুলো আমাদের নৌযান।"

"এগুলো সেসব ভীরুদের নৌযান, যারা মুসলমানদের হাতে পরাজিত হয়ে পলায়ন করেছিল" আযাদাবাহ্ বলে "তারা এমন শত্রুদের জন্য রাস্তা পরিষ্কার করে দিয়েছে, যারা অত্যন্ত দুর্বল ছিল। মদীনার এসব আরবদের আমরা কখনও পাত্তা দিইনি।"

"এখনও আমরা তাদের দুর্বল মনে করি"–সালার বলে। "মহামান্য সেনাপ্রধান! আমি আদেশপ্রার্থী। বলুন, মুসলমানদের কোথায় আটকাতে হবে। নাকি কেল্লার অভ্যন্তরে থেকেই আপনি তাদের সঙ্গে লড়তে চান?"

"যদি আমি বলি যে, আমি এ মুহূর্তে লড়াই করতে চাই না"– আযাদাবাহ বলে।

"তাহলে তোমরা ...!"

"আমরা এটা মানতেই পারি না যে, আপনি এমন কথা বলতে পারেন" সালার বলে "এখন আপনি সম্রাট উরদূশের এবং স্বীয় পুত্রের মৃত্যুতে এত বেশি শোকাচ্ছন্ন যে, ভাল করে চিন্তা-ভাবনা করার শক্তিও আপনার নেই।" আযাদাবাহ-এর স্ত্রী বলে "শোকাচ্ছন্ন সত্ত্বেও আমাদের চিন্তা করতে হবে এবং খুব দ্রুত চিন্তার কাজ সারতে হবে। আমাদের সৈন্যের কোনো কমতি নেই। কোনো বস্তুর স্বল্পতা নেই। আরব খ্রিস্টানরা আমাদের সঙ্গে আছে। আমরা নিজেরাই তাদের এখানে সমবেত করেছি, যেন মুসলমানরা হীরা থেকে সামনে অগ্রসর না হতে পারে এবং তাদের এখানেই কবর দেয়া যায়।"

"ঠিক বলেছ, আমাদের সৈন্যের কোনো অভাব নেই" আযাদাবাহ্ বলে। "তবে অন্য কোনো ঘাটতি অবশ্যই আছে, যার কারণে আমরা প্রতি রণাঙ্গনে পরাজিত হচ্ছি। আমি আমার নামের সাথে পরাজয়ের অপবাদ সংযুক্ত হওয়ার সুযোগ দিব না। আমি বিজয় অর্জনের জন্য চিন্তা করে অন্য কোনো উপায় বেছে নিব। আমি মাদায়েন যাব এবং সেখানে গিয়ে দেখব পরিস্থিতি কেমন। আমি এটাও দেখব যে, সম্রাট উরদূশেরের মৃত্যুর পর আমাদের কোনো সাহায্যকারী আছে কিনা?"

"না, মহামান্য সেনাপতি" তার সালার অনুনয়ের স্বরে বলে "এখনই মাদায়েন যাবেন না। শত্রুবাহিনী মাথার উপর এসে গেছে।"

"তুমি আমার থেকে বেশি জান?" আযাদাবাহ্ ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলে "তোমরা কী এটা মনে করছ যে, আমি পালিয়ে যাচ্ছি? যা আমি ভাবছি, তা তোমাদের মাথায় আসার কথা নয়। আমাকে খতিয়ে দেখতে হবে যে, সেই দুর্বলতা কী, যা প্রতি রণাঙ্গনে আমাদের পরাজয়ের কারণ হয়ে দেখা দিচ্ছে। তোমাদের ভাবনার সূচিতে এই বিষয়টি থাকার দরকার যে, হুরমুজের মত যুদ্ধবাজ সেনাপতি মুসলমানদের হাতে নিহত হয়েছে। ... আনুযান এবং কুববাজ কোনো মামুলি সালার ছিল না। আন্দাযগরের পরিণতি কেমন ভয়াবহ হয়েছিল? যাবান কেমন মার খেয়েছে? ... আমার থেকে চূড়ান্ত যুদ্ধ এবং বিজয়ের আশা কেন করা হয়? ... আমি অবশ্যই লড়ব, তবে ভেবে-চিন্তে ... সমস্ত সেনাপতি ও উপসেনাপতিদের ডেকে পাঠাও।"

✪

হযরত খালেদ (রা.)-এর বাহিনী ফোরাত নদীর বুক চিরে সম্মুখপানে এগোচ্ছিল। অশ্বারোহী বাহিনী নদীর উভয় পাড়ে বিস্তৃতভাবে নৌযানগুলোর সঙ্গে সঙ্গে চলছিল। প্রতিক্ষণে এই আশংকা ছিল যে, হীরার সৈন্যরা যে কোনো স্থানে এসে হামলা চালাতে পারে। কিন্তু দূর-দূরান্ত পর্যন্ত হীরা বাহিনীর কোনো চিহ্ন নজরে পড়ছিল না। মুসান্না বিন হারেছার অশ্বারোহী বাহিনী দরিয়ার পাড় থেকে দূর-দূরান্তে শত্রুবাহিনীর উপস্থিতি খুঁজে ফিরছিল।

হযরত খালিদ (রা.)-এর জানা ছিল যে, হীরার যুদ্ধ বড়ই রক্তক্ষয়ী হবে। মুসান্না বিন হারেছা সংবাদ পেয়েছিলেন যে, আযাদাবাহ্ হীরায় অসংখ্য সৈন্য সমবেত করে রেখেছে। হযরত খালিদ (রা.)-এর দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে, তিনি শত্রুবাহিনীর এক অত্যন্ত মজবুত সেনাছাউনির দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। এক দুর্বার আকর্ষণ তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, নতুবা মুসলিম বাহিনী ও শত্রুবাহিনীর শক্তি-সামর্থ্য তুলনা করলে বাস্তবতার দাবী এই ছিল যে, এক পা অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে তিনি মুসলিম বাহিনীকে পশ্চাতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। কিন্তু হযরত খালিদ (রা.) রাজ্যজয়ের নেশায় এই বিপদের ঝুঁকি নিচ্ছেন না, বরং তিনি আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ পালন করছেন মাত্র। এত বিরাট এবং শক্তিধর বাতিলের সহাবস্থান ইসলামের জন্য এত বিপদজনক ছিল যে, এই বাতিলের মূলোৎপাটন না করা হলে, খোদ বাতিলই তাকে পেছনে টেনে নিয়ে যেত এবং নিতে নিতে এক সময় ধরা থেকে তার চিহ্ন মুছে দিত।

"ইবনে ওলীদ!" দরিয়ার কিনারা থেকে হযরত মুসান্না বিন হারেছার আওয়াজ হযরত খালিদ (রা.) শুনতে পান "মনযিল নিকটবর্তী।"

হযরত খালিদ (রা.) নাবিকদের বলেন, নৌযান কিনারায় লাগিয়ে তাদের নামিয়ে দিয়ে নৌযানগুলো যেন সামনে এগিয়ে নিয়ে যায়। হযরত মুসান্না এই এলাকা চিনতেন, কিন্তু তারপরও এলাকার দুই ব্যক্তিকে ধরে এনে তাদের পুরস্কার দেন এবং পথ প্রদর্শনের জন্য তাদের সাথে রেখে দেন।

হযরত খালিদ (রা.) দরিয়ার পাড়ে নেমে এলে হযরত মুসান্না তার এক অশ্বারোহীকে বলেন, সে যেন তার ঘোড়াটি হযরত খালিদ (রা.)-কে প্রদান করে। হযরত খালিদ (রা.) ঘোড়াটিতে আরোহণ করেন। হযরত মুসান্না এবং হযরত খালিদ (রা.)-এর ঘোড়া পাশাপাশি চলছিল। হযরত মুসান্নার দৃষ্টি হযরত খালিদ (রা.)-এর চেহারায় নিবদ্ধ ছিল। হযরত খালিদ (রা.) এদিক-সেদিক দেখছিলেন। তাঁর দৃষ্টি হযরত মুসান্না (রা.)-এর উপর পড়লেও মুসান্নার দৃষ্টি পূর্ববৎ তাঁর প্রতিই নিবদ্ধ থাকে।

"ইবনে হারেছা! কী হল?" হযরত খালিদ (রা.) মুচকি হেসে জিজ্ঞাসা করেন "তুমি আমাকে চেনার চেষ্টা করছ?"

"হাঁ, ওলীদের বেটা!" হযরত মুসান্না গভীর এবং ধীর কণ্ঠে বলেন "আমি আপনাকে চেনার চেষ্টা করছি। আপনাকে আমার মানুষ বলে মনে হয় না। আপনার চেহারায় কিছুটা ভীতি এবং অল্প হলেও উদ্বেগের ছাপ থাকা দরকার ছিল।"

"আমি ভেতরে ভেতরে পেরেশান" হযরত খালিদ (রা.) বলেন। "আমার অন্তরে ভয়ও আছে। এটা এই জন্য যে, আমিও একজন মানুষ। তবে এই উদ্বেগ ও ভয় আমি চেহারায় জায়গা দিতে নারাজ।

"এই চেহারা একজন সৈন্যের চেহারা" মুসান্না বলে। "এটা ইসলামের চেহারা। আমি বুঝি ইবনে ওলীদ! সেনাপতির চেহারায় চিন্তার ছাপ দেখা গেলে প্রতিটি সৈন্যের চেহারায় তা অবশ্যই প্রকাশ পায়।"

"আমাকে বলো ইবনে হারেছা!" হযরত খালিদ (রা.) জিজ্ঞাসা করেন। "তুমি এ কথা বলছ কেন? তুমি আমাকে পেরেশান ও উদ্বিগ্ন দেখতে চাও?"

"ঠিকই ধরেছেন ইবনে ওলীদ!" মুসান্না বলে। "সম্ভবত আপনি অনুমান করতে পারছেন না যে, আপনি কত বড় এবং কেমন শক্তিধর শত্রুর মুখোমুখী হতে যাচ্ছেন।"

"আমি ব্যক্তিগত স্বার্থে যাচ্ছি না যেন এই চিন্তা আমাকে বিব্রত করবে যে, বাদশা হওয়ার স্বপ্নপূরণের আগেই মৃত্যু হয়ে যায় কি না" হযরত খালিদ (রা.) বলেন। "আমি আল্লাহর নির্দেশ পালনের জন্য এগিয়ে চলছি। আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন। আমার এবং তোমার পেরেশান হওয়া কিংবা ঘাবড়ানোর মোটেও প্রয়োজন নেই। আমাকে ভাল করে বল, সামনে কী আছে?"

মুসান্না স্থানীয় অধিবাসী দুজনকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন, খুলে বল সামনের পরিস্থিতি কেমন! লোক দুজন সামনের পরিস্থিতি এবং সেখানকার ভোগৌলিক তথ্য সরবরাহ করে। হযরত খালিদ (রা.) তাদের বিদায় দেন এবং মুসান্নার সঙ্গে হীরা আক্রমণের পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন।

✪

হীরা শহর ছিল নদীর কূল ঘেষে অবস্থিত। হযরত খালিদ (রা.) তাঁর দু'জন সালার আসেম বিন আমর ও আদী বিন হাতেমকে নৌযান হতে উপকূলে ডেকে নেন।

"আমি মানতে পারি না যে, অগ্নিপূজারীরা আমাদের হীরার রাস্তায় বাধা দিবে না" হযরত খালিদ (রা.) বলেন। "তাদের কাছে এত সৈন্য আছে যে, চাইলে সমস্ত এলাকায় সেসব সৈন্য ছড়িয়ে দিতে পারে। খ্রিস্টানরাও তাদের সঙ্গে আছে। যদি আমরা হীরায় গিয়ে নৌযান হতে অবতরণ করি, তাহলে শত্রুরা সেখানেই হামলা করে বসবে। আমরা হীরার অদূরে নৌযানগুলো রেখে সামনে এগিয়ে যাব"।

হযরত খালিদ (রা.) মাটিতে বসে পড়েন এবং তলোয়ারের আগা দ্বারা হীরার অবস্থানস্থল এবং আক্রমণের নকশা তৈরি করতে থাকেন। তিনি বর্তমানস্থান থেকে হীরা পর্যন্ত পৌঁছার রাস্তার একটি রেখা টানেন। কিন্তু রেখাটি সরল ছিল না; বরং আঁকাবাঁকা ছিল। তিনি রেখাটি টেনে এমন স্থানে গিয়ে শেষ করেন, যেখানে কিছু জনবসতি ছিল। হীরা থেকে তিন মাইলের মত দূরে ছিল এলাকাটি।

"জনবসতিটির নাম খাওয়ারানাক" হযরত খালিদ (রা.) বলেন "আমরা তার নিকটবর্তী এলাকা দিয়ে অতিবাহিত হয়ে দ্রুত হীরার দিকে অগ্রসর হব। আমি আশা করছি, অগ্নিপূজারিরা শহর থেকে কিছু দূর এগিয়ে এসে পথিমধ্যে আমাদের গতিরোধ করবে। আমার ভাইয়েরা; এবারের যুদ্ধটি হবে খুবই ভয়ঙ্কর।

যরথুষ্ট্রের পূজারিরা আর কোনো পরাজয়ের ঝুঁকি নিতে চায় না। সামনে মাদায়েন। আমি তোমাদেরকে মহা পরীক্ষার মুখে ঠেলে দিয়েছি। কিন্তু এই পরীক্ষাতে আমাদের শতভাগ উত্তীর্ণ হতে হবে। দুশমনের সংখ্যা আমাদের থেকে কয়েকগুণ বেশি ...। যদি আমি হীরা অবরোধের সুযোগ পাই, তবে অবরোধ খুবই বিলম্বিত হবে। আমরা এত বেশি অপেক্ষা করতে পারি না। দিলে দিলে অঙ্গীকারাবদ্ধ হও যে, আমাদের অবশ্যই হীরা বিজয় করতে হবে। ... এখন নৌযানগুলো নোঙ্গর করে পুরো বাহিনীকে উপকূলে নিয়ে আস।"

মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ১৮ হাজার। সমস্ত বাহিনী নৌযান ছেড়ে জমিনে নেমে আসে। দ্রুত সামনে অগ্রসর হওয়ার জন্য শ্রেণীবদ্ধ হয়। হযরত খালিদ (রা.) সালার আসেম বিন আমরকে আগে এবং অপর সালার আদী বিন হাতেমকে পিছনে রাখেন আর নিজে থাকেন মধ্য বাহিনীতে। মুসান্না বিন হারেছার বাহিনী অগ্রবর্তী বাহিনী হিসেবে মূল বাহিনী থেকে প্রায় এক মাইল আগে চলে গিয়েছিল।

হযরত খালিদ (রা.)-এর নির্দেশে মুজাহিদ বাহিনী নীরবে চলছিল। নারাধ্বনি এবং রণসঙ্গীত নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। যাতে প্রকাশ না পায় যে, সৈন্য আসছে। হযরত খালিদ (রা.) সাধারণ পথ ছেড়ে ঐ পথ ধরেছিলেন, যা জঙ্গল এবং বিরান এলাকার মধ্য দিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল। সাধারণ মানুষজন ঐ পথ ব্যবহার করত না।

মুসান্না বিন হারেছার সৈন্যরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে চলছিল, যাতে কোথাও ওঁত পেতে থাকার সন্দেহ হলে মূল বাহিনীকে জানিয়ে তাদের যাত্রা স্থগিত করে দেয়া যায় এবং তারা যেন আচমকা আক্রমণের শিকার না হয়।

হযরত খালিদ (রা.)-এর সৈন্যরা খাওয়ারনাক পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। দীর্ঘ এ পথের কোথাও শত্রুবাহিনীর নাম গন্ধ পাওয়া যায় না। হযরত খালিদ (রা.) সৈন্যদের যাত্রা বিরতির নির্দেশ দেন এবং একজন গুপ্তচরকে এই বলে পাঠান, তুমি বসতিতে গিয়ে খোঁজ নাও এখানে শত্রু সৈন্য আছে কি না? এদের মধ্যে সেসব মুসলমানদের সংখ্যাই বেশি ছিল, যারা একদিন পারসিকদের গোলাম ছিল। তারা দজলা এবং ফোরাতের মোহনায় অবস্থান করত। তাদের মধ্য হতে এক গুপ্তচর বেশভূষা বদল করে খাওয়ারনাক গিয়ে এই খবর নিয়ে আসে যে, সেখানে কোনো সৈন্য নেই এবং বসতি পূর্ণ নিরাপদ। ইতিহাস বলে, এই বসতিতে অনেক ধনী লোকদের বসবাস ছিল। বর্তমানে সেখানে খাওয়ারনাকের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় না।

মানুষ মাটির সাথে মিশে মাটি হয়ে যায়। স্থান নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। উঁচু উঁচু বালাখানা, শাহীমহল কালের গর্ভে হারিয়ে যায়। শুধু রয়ে যায় ইতিহাস। ভাল অথবা মন্দ। মানুষ মরে গেলেও তাদের নাম জীবিত থাকে, তাদের কথা-কাজ জিন্দা থাকে, কখনো মরে না। আজ সে এলাকা নেই যেখানে বণিক শ্রেণীসহ অন্যান্য ধনীরা বসবাস করত। হযরত খালিদ (রা.) নমরূদের আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ার কাছাকাছি স্থানে গিয়ে অবস্থান করেছিলেন। বর্তমানে এলাকাটি নেই কিন্তু হযরত খালিদ (রা.) জিন্দা রয়েছেন। তার কথা-জীবনী জিন্দা। মুসান্না বিন হারেছা, হযরত আসেম এবং আদী (রা.) সহ ঐ জানবায ১৮ হাজার মুজাহিদদের ইতিহাস অমর করে রেখেছে। তাদের ঘোড়ার ক্ষুরে সূর্যকিরণ চুমো দিয়েছে।

মুজাহিদ বাহিনীর উদ্দেশ্য কী ছিল? অথচ তারা এমন শক্রর মোকাবেলায় এগিয়ে চলছিল, যারা ১৮ হাজার সৈন্যকে গিলে ফেলার মত শক্তি-সামর্থ্য রাখত। হযরত খালিদ (রা.)ও তাঁর উপসেনাপতিদের মধ্যে সিংহাসন-রাজমুকুটের প্রতি ভ্রুক্ষেপ ছিল না। ছিলনা স্বর্ণ-রৌপ্য কিংবা জওহারের লোভ। তাদের মধ্যে ছিল সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় অগ্নিপ্রত্যয়, যা তাদেরকে এ পথে অটল রেখেছিল। তারা এই পৃথিবীর মাঝে এমন কোনো জাতির উপস্থিতি দেখতে প্রস্তুত ছিল না, যারা ইসলামের অস্তিত্ব ও উন্নতির পথে অন্তরায় হতে পারে। তাদের বিবেচনায় না কোনো দ্বিধা-সংশয় ছিল। না কোনোরূপ অস্থিরতা কিংবা সিদ্ধান্তহীনতা ছিল। তারা আল্লাহর রাহে জান কুরবান করে রক্তাক্ষরে ভবিষ্যতের ইতিহাস রচনা করতে অমর হওয়ার জন্য চলছিল।

ঐতিহাসিকগণ সে যুগের বর্ণনাকারীদের বরাত দিয়ে লিখেন, হযরত খালিদ (রা.) নীরবতায় ডুবে গিয়েছিলেন। কোনো সিপাহী তার দিকে তাকালে তিনি মুচকি হাসি দিতেন। হযরত খালিদ (রা.) যখন খাওয়ারনাক পেছনে ফেলে এগিয়ে যান তখন তার মুখ থেকে হয়ত কোনো নির্দেশ, না হয় নির্দেশনা বের হতো। এ ছাড়া তিনি কিছুই বলেন না; সম্পূর্ণ নীরব থাকেন। হযরত মুসান্না বিন হারেছা রাতে গেরিলা আক্রমণ এবং দিনে অতর্কিত হামলা চালিয়ে নিমিষে গায়েব হওয়ার উস্তাদ ছিলেন। তিনি যখন হযরত খালিদ (রা.) কে বলতেন যে, তিনি এমন এমন করবেন, তখন হযরত খালিদ (রা.) শুধু বলতেন– "আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিন ইবনে হারেছা!" এর বাইরে একটি কথাও বলতেন না তিনি।

হযরত খালিদ (রা.) সুপরিকল্পিতভাবে পুরো বাহিনীকে খাওয়ারনাক পেরিয়ে সামনে এগিয়ে নিয়ে যান। তিনি কখনো এই ধারণার বশবর্তী ছিলেন না যে, শত্রুবাহিনীর অজান্তেই তিনি তাদের টুঁটি চেপে ধরবেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, এবার শত্রুরা আগের চেয়ে বেশি সতর্ক ও সাবধান হবে। হযরত খালিদ (রা.) এক সালারকে নির্দেশ দেন, যেন তিনি পেছনে ছেড়ে আসা এলাকার প্রতি গভীর নজরদারী করার জন্য কিছু সৈন্য সেখানে রেখে যান, যাতে এ এলাকার কোনো লোক হীরায় গিয়ে এই সংবাদ না দিতে পারে যে, 'মুসলিম বাহিনী আসছে'।

এটা ছিল শত্রুদের একটি পাতা ফাঁদ, যে ফাঁদে মুসলিম বাহিনী ক্রমেই জড়িয়ে পড়ছিল। এলাকাটি ছিল ওঁত পাতার জন্য অত্যন্ত মোক্ষম। কিন্তু বাইরে থেকে তা বোঝা এমনকি অনুমান করারও কোনো চিহ্ন ছিল না। এ সম্ভাবনা ছিল যে, শত্রুবাহিনী হঠাৎ এসে পুরো বাহিনীর উপর একযোগে চড়াও হবে এবং ১৮ হাজার সৈন্যকে ঘেরাওয়ের আওতায় এনে অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় তাদেরকে নৃশংসভাবে খুন করবে।

আরও কিছু দূর অগ্রসর হলে একটি পর্বতশৃঙ্গ মাঝপথে এসে দাঁড়ায়। হযরত খালিদ (রা.) ঘোড়ার গোড়ালিতে ইঙ্গিতস্পর্শ করলে অশ্ব তাকে নিয়ে পর্বতে উঠে পড়ে। এদিকে তাঁর নির্দেশে মুসলিম বাহিনী পর্বতের গোড়ায় এসে থেমে যায়।

"আল্লাহর সৈনিকগণ!" হযরত খালিদ (রা.) উচ্চকণ্ঠে বলেন। "তোমাদের প্রতি আল্লাহর রহমত হোক। আজ আল্লাহ তোমাদেরকে এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করেছেন। আল্লাহর রসূলের পবিত্রাত্মা আজ তোমাদের দেখছেন। আজ তোমরা এক কঠিন পাহাড়ের সঙ্গে লড়াই করতে এবং তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে ছুটে চলেছো। সামনে যে বাহিনীর সঙ্গে তোমাদের বোঝাপড়া হবে তারা পাহাড়ের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।

মুজাহিদীনে ইসলাম, হয় বিজয় নয় মৃত্যু। আমাদের জান আল্লাহর দেয়া আমানত। অবশ্যই এই আমানত আমাদের ফিরিয়ে দিতে হবে। তবে আমরা সেটা ফিরিয়ে দিতে চাই মর্যাদার সাথে, গৌরবের সাথে। আল্লাহর তোমাদের সহায়। সংখ্যার স্বল্পতা এবং রসদ হাতিয়ারের কমতি দ্বারা কখনো জয় পরাজয়ের সমাধান হয় না। সংখ্যার স্বল্পতা পরাজয়কে অনিবার্য করে না, তেমনি সংখ্যাধিক্যের দ্বারাও জয় নিশ্চিত হয় না। বিজয় আসে প্রেরণা এবং দৃঢ়তার দ্বারা। এই বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে অগ্রসর হও যে, আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর পবিত্র রূহ তোমাদের সঙ্গে আছেন।"

হযরত খালিদ (রা.) মুজাহিদ বাহিনীর জযবা ও প্রেরণা বহুগণ বাড়িয়ে দেন এবং ইস্পাতদৃঢ় প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হয়ে সামনে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেন।

✪

তিনি হীরাকে পেছনে রেখে চলছিলেন। এভাবে চলায় তাকে বহুদূর ঘুরে আসতে হয়। শহরের উপকণ্ঠে পৌঁছে গেলেও কোনো শত্রুসৈন্য তাঁর নজরে পড়ে না। প্রাচীরের উপরে এবং কেল্লাতেও কাউকে দেখা যায় না। কোথাও কোনো সৈন্য না দেখায় হযরত খালিদ (রা.) এমন 'সৈন্যহীন' অবস্থাকে শত্রুর পাতা ফাঁদ বলে মনে করতে থাকেন। কিন্তু বাস্তবে এটা কোনো ধোঁকা ছিল না। দুশমন স্বেচ্ছায় শহর ছেড়ে চলে গিয়েছিল। হীরার কোথাও অগ্নিপূজারীদের একজন সৈন্যেরও দেখা মেলে না। কেল্লার প্রধান ফটক ছিল উন্মুক্ত।

মুসান্না বিন হারেছা নিজের কয়েকজন অশ্বারোহী নিয়ে শহরের চারপাশে ঘুরে আসেন।

"ইবনে ওলীদ" মুসান্না হযরত খালিদ (রা.) কে বলেন। "প্রধান ফটকও খোলা, লোকজনকেও স্বাভাবিক চলাচল করতে দেখা যাচ্ছে– বিষয়টি আমার বুঝে আসছে না।"

"এটা স্বাভাবিক ব্যাপার নয়" হযরত খালিদ (রা.) বলেন "নিরাপত্তা চৌকিগুলো খালি, এদিকে তুমি বলছ, শহরে লোকজন আছে ... এটা নিশ্চয় পরিকল্পিত ফাঁদ ইবনে হারেছা! ... আসেম এবং আদীকে ডেকে পাঠাও।"

উভয় সালার এলে হযরত খালিদ (রা.) তাদেরকে শহরের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানান। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে করণীয় নির্ধারণে পরস্পর মত বিনিময় এবং আলোচনা হয়। পরিশেষে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, শহরে প্রবেশের সমস্ত দরজা দিয়ে মুসলিম বাহিনী একযোগে তুফানের মত প্রবেশ করে সারা শহরে ছড়িয়ে পড়বে।

বিপর্যয় ঘটলে তা অত্যন্ত ভয়াবহ হত। হযরত খালিদ (রা.) যেভাবে মুজাহিদদেরকে শহরে প্রবেশ করতে বলেন, তাতে শত্রুকর্তৃক তাদের কচুকাটা হওয়া কিংবা ঘরে ঘরে লুক্কায়িত তীরন্দাজদের তীরের নিশানা হওয়ার বিরাট আশংকা ছিল। কিন্তু হযরত খালিদ (রা.) বিপদের পাহাড় সত্ত্বেও জীবনমরণ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন। শহরে প্রবেশের নির্দেশ দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম বাহিনী অশ্ব ছুটিয়ে তুফানের গতিতে শহরের ভেতর প্রবেশ করে।

শহরের বাসিন্দারা আত্মগোপন কিংবা পলায়নে তৎপর হওয়ার পরিবর্তে সকলে খোলা আকাশের নীচে এসে দাঁড়ায়। মহিলারা ছাদের উপর উঠে যায়। কিছু লোক ঘরের দরজা বন্ধ করে ঘরের অভ্যন্তরে রয়ে যায়। প্রথমে তাদের ধারণা হয়েছিল, মুসলিম বাহিনী হয়ত এখনই তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবে। কিন্তু যখন তারা অবাক বিস্ময়ে দেখলো যে, মুসলিম বাহিনী তাদের উপর অস্ত্রধারণ করেনি, করছে না কোনো লুটপাট, জুলুম, হত্যাযজ্ঞ তখন অবশিষ্ট লোকেরাও ঘরের দোর খুলে বাইরে চলে আসে।

হযরত খালিদ (রা.) সারা শহরে এই নির্দেশ প্রচার করে দেন যে, কারো ঘরে অগ্নিপূজারীদের কোনো সৈন্য থাকলে তাকে বের করে দাও। অন্যথা কারো ঘর হতে একটি তীরও যদি বের হয় তাহলে তা জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেয়া হবে।

শহরের সম্মানিত ও নেতৃস্থানীয়দের একটি প্রতিনিধি দল হযরত খালিদ (রা.) এর নিকটে এসে বলে, শহরের কোনো ঘরে সেনাবাহিনীর কোনো লোক নেই।

"তাহলে সৈন্যরা কোথায়?" হযরত খালিদ (রা.) জিজ্ঞাসা করেন।

"মাদায়েনে চলে গেছে" প্রতিনিধি দলের নেতা বলে।

"শাসক আযাদাবাহ কোথায়?"

"তিনিও চলে গেছেন" প্রতিনিধি দলপতি হযরত খালিদ (রা.)-কে জানায়।

"আমাকে কে আশ্বস্ত করতে পারে যে, ব্যাপারটি মোটেও প্রতারণাপূর্ণ নয়" হযরত খালিদ (রা.) জিজ্ঞাসা করেন। "কে এটা বিশ্বাস করবে যে, শাসক এলাকা ছেড়ে চলে যাবে, সৈন্যরাও থাকবে না অথচ দুশমনদের দেখলেও সাধারণ জনগণ ভয় পাবে না; বরং স্বাভাবিকভাবেই চলাফেরা করবে।"

"আমরা মদীনার সেনাপতিকে এই বিশ্বাস দিতে এসেছি যে, হীরার জনগণ সম্পূর্ণ শান্ত ও স্বাভাবিক থাকবে। আমরা যেন শান্তির সাথে থাকতে পারি এই অনুরোধ জানাচ্ছি।" প্রতিনিধি দলের নেতা বলে ধোঁকা আপনাকে কখনও দেয়া হবে না। প্রতারণার শিকার হয়েছি আমরা। যে জনতাকে রেখে তাদের শাসক ও সৈন্যরা এলাকা ছেড়ে চলে যায় আর জনগণকে শত্রুর দয়া-করুণার উপর রেখে যায়, সে জনতা শত্রুদের বন্ধু বানাতে চেষ্টা করবে। শত্রুদের ধোঁকা দেয়ার ঝুঁকি নেবে না। আমরা সেসব সৈন্যের সঙ্গ দিতে পারি না। যারা কাজিমায় পরাজিত হয়েছে। উলাইয়িস থেকে পালিয়েছে। আমিনিশিয়ার মত শহর ছেড়ে পলায়ন করেছে। আমাদের শহর এবং জনগণকে ফেলে পালিয়ে গেছে।"

"তোমরা কী চাও?" হযরত খালিদ (রা.) জানতে চান।

"নিরাপত্তা" প্রতিনিধি দলের নেতা জবাবে বলে। "শহরের বাসিন্দারা নিরাপত্তা এবং নিজেদের জান-মাল ও ইজ্জত সংরক্ষণের উপযুক্ত মূল্য দিবে।

"আমরা মূল্য নিই না" হযরত খালিদ (রা.) বলেন। "খোদার কসম! নিরাপত্তা চেয়েছো, নিরাপত্তাই পাবে। ... আমার বাহিনীর একজন সদস্যও কী কারো ঘরের কোনো বস্তুতে হাত দিয়েছে? কারো ইজ্জতের উপর হামলা করেছে?"

"না" প্রতিনিধি দলের নেতা জানায়।

"আমরা কেবল সেসব শহরের ধন-সম্পদকে গণীমতের মাল মনে করি, যার অধিবাসীরা পালিয়ে যায়" হযরত খালিদ (রা.) বলেন। "তোমরা নিজেদের ঘরে ছিলে এবং আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণও করনি, সেজন্য এটা আমার কর্তব্য যে, আমি এই শহরের অধিবাসীদেরকে নিজের আশ্রয়ে নিয়ে নিব ... আর আমি এর জন্য এক পয়সাও নিব না। ... যাও! যেমনি নিরাপদে এসেছ, তেমনি নিরাপদে চলে যাও।"

"নিঃসন্দেহে এটা ঐ শক্তি যা আপনাকে প্রতি রণাঙ্গনে বিজয় দান করছে" প্রতিনিধি দলের নেতা বলে।

ইতিহাসে এর কোনো ইশারা পাওয়া যায় না যে, হযরত খালিদ (রা.) হীরার অধিবাসীদের ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিয়েছিলেন কি না। অবশ্য স্পষ্ট ভাষায় এই তথ্য পাওয়া যায় যে, হীরার জনগণের মাঝে এই ভয়-ভীতি ছিল যে, মুসলিম বাহিনী তাদের ঘরে লুটপাট চালাবে এবং তাদের সুন্দরী নারীদেরকে নিজেদের শয্যাশায়িনী বানাবে। কিন্তু মুসলিম বাহিনী তাদের ঘরে ঘরে গেলেও তাদের উদ্দেশ্য ছিল শুধু এটা দেখা যে, সেখানে কোনো পারসিক সৈন্য লুকিয়ে আছে কি না। হীরাবাসী যখন মুসলমানদের এই উন্নত ভদ্রতা ও চারিত্রিক দৃঢ়তা দেখে এবং হযরত খালিদ (রা.) যখন তাদের এই বলে আশ্বস্ত করেন যে, এই শহরের বাসিন্দারা মুসলমানদের নিরাপত্তা বলয়ে থাকবে, তখন তারা এত বিমোহিত হয় যে, অনেকে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করে।

হীরার লোকদের থেকে হযরত খালিদ (রা.)-এর একটি বিরাট লাভ এই হয় যে, নবমুসলিমরা এবং কয়েকজন গোত্রনেতা তাঁকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি সম্পর্কে অবহিত করে।

"হীরা আপনার" হীরার এক সর্দার হযরত খালিদ (রা.)-কে বলে। "তবে আপনি শহরটি কব্জা করে নিরাপদ থাকতে পারবেন না। আপনি হয়তবা জেনে থাকবেন যে, হীরার আশেপাশে আরও চারটি কেল্লা আছে। এসব কেল্লার অধিকর্তা বিভিন্ন গোত্রের সর্দারগণ। প্রতিটি কেল্লায় বিদ্যমান রয়েছে অসংখ্য আরব খ্রিস্টান সৈন্য।"

"আমরা যখন পারস্যের নামকরা সেনাপতিদের পরাজিত করতে পেরেছি তখন এসব কেল্লাবাসীদের পরাস্ত করতে আশা করি মোটেও বেগ পেতে হবে না" হযরত খালিদ (রা.) বলেন। এবং জানতে চান "কেল্লার সেনারা যুদ্ধে কেমন?"

"প্রত্যেকটি সৈন্য জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করে" অগ্নিপূজারী সর্দার জানায়। "আমরা এ বাহিনীকে পারস্য বাহিনী অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ও বাহাদুর মনে করি।"

হযরত খালিদ (রা.) কে ঐ চার কেল্লা সম্পর্কে যে বিস্তারিত তথ্য দেয়া হয়, তার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ–

প্রতিটি কেল্লার স্বতন্ত্র নাম রয়েছে। একটি কেল্লার নাম 'কসরে আবয়ায'। এ কেল্লাপতির নাম আয়াস বিন কুবাইসা। দ্বিতীয় কেল্লার নাম 'কসরুল আদাসীন'। কেল্লাপতির নাম আদী বিন আদী। তৃতীয় কেল্লার নাম 'কসরে বনূ মাযিন।' কেল্লাপতির নাম ইবনে আককাল। চতুর্থ কেল্লার নাম 'কসরে ইবনে বুকায়লা'। কেল্লাপতির নাম আবদুল মাসীহ্ বিন আমর বিন বুকায়লা।

হযরত খালিদ (রা.) কেল্লার বিস্তারিত তথ্য জেনে উপসেনাপতিদের ডেকে পাঠান এবং তাদের বলেন যে, এসব কেল্লা জয় করা জরুরী। নতুবা হীরা হাতছাড়া হয়ে যাবে। ইসলামী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রাণই হলো "কোনো স্থান থেকে শংকার আভাস পেলে সেখানে আক্রমণ করা।" আর ইসলামী যুদ্ধবিদ্যার ভিত্তি হলো, দুশমনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা এবং শত্রুপক্ষকে প্রস্তুতি গ্রহণের সুযোগ না দিয়ে তাদের উপর চড়াও হওয়া। এই রণনীতির ভিত্তিতে হযরত খালিদ (রা.) সহসেনাপতিদের জানিয়ে দেন যে, কে কোন কেল্লা আক্রমণ করবে।

কসরে আবয়াযের উপর আক্রমণ করার দায়িত্ব সেনাপতি যিরার বিন আযওয়ারকে প্রদান করা হয়। আরেক সেনাপতি যিরার বিন খাত্তাবকে 'কসরুল আদাসীন' আক্রমণের নির্দেশ দেয়া হয়। 'কসরে ইবনে বুখায়লার' দায়িত্ব পড়ে

হযরত মুসান্না-এর উপর। হযরত খালিদ (রা.) নির্দেশ দেন যেন এখনই কেল্লাগুলো অবরোধ করা হয়। হযরত খালিদ (রা.) সর্বপ্রথম চার কেল্লাপতি বরাবর এই পয়গাম পাঠান যে, হয় ইসলাম গ্রহণ কর নতুবা কর প্রদানে রাজি হও। আর এ দু'প্রস্তাবের কোনোটা মানতে ব্যর্থ হলে মুসলমানদের তলোয়ারে কচুকাটা হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও।

চার কেল্লা থেকেই জবাবী পত্র আসে। সকলের কথা এক। সব কয়জনই অত্যন্ত দাপটের সাথে এ কথা জানায় যে, তারা কেল্লার নেতৃত্বও ছাড়বে না এবং স্বধর্মও পরিত্যাগ করবে না।

কেল্লাপতিদের আপোষহীন জবাবে হযরত খালিদ (রা.) নাঙ্গা তলোয়ারের পথ বেছে নেন। মুসলিম সেনারা একই সময়ে চার কেল্লায় হামলা চালিয়ে কেল্লা অবরোধ করে এবং কেল্লার অভ্যন্তরে ঢুকতে জোর প্রয়াস চালায়। অনুপম বীরত্ব প্রদর্শন করে কেল্লা টপকাতে চেষ্টা করে। কিন্তু প্রতিটি কেল্লার সৈন্যরা মুজাহিদ বাহিনীর অগ্রযাত্রা ও প্রচেষ্টা নস্যাৎ করে দিতে থাকে। কসরে আবয়াযের প্রতিরোধ সেনাপতি যিরারকে ভীষণ পেরেশান করে তোলে। কেল্লার পাঁচিল হতে খ্রিস্টানরা তীর বৃষ্টি বর্ষণ অব্যাহত রাখে। মুসলমানরা পাঁচিল পর্যন্ত যেতে হিমশিম খেয়ে যায়। কেল্লার পাঁচিলের উপর একটি কামান বসানো ছিল, যা থেকে পাথরের বড় বড় খণ্ড মুসলমানদের উপর নিক্ষেপ করা হচ্ছিল।

সেনাপতি যিরার ঘোড়া ছুটিয়ে কেল্লার চারপাশ প্রদক্ষিণ করেন। কোনো দিক দিয়ে কেল্লা কাবু করার সম্ভাবনা দেখা যায় না। কামান দ্রুত বেগে প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করছিল। সেনাপতি যিরার এমন তীরন্দায বাহিনীকে আলাদা করেন, যারা দৈহিক দিক দিয়ে অত্যন্ত সবল ও সুদৃঢ় ছিল। সেনাপতি তাদের নির্দেশ দেন, তারা যেন যথাসম্ভব কামানের কাছে যায় এবং একযোগে কামান পরিচালকদের উপর তীর নিক্ষেপ করে।

তীরন্দাযগণ অত্যন্ত আবেগ ও প্রেরণাদীপ্ত হয়ে সামনে অগ্রসর হয়। উপর হতে তাদের প্রতি ঝাঁকে ঝাঁকে তীর নেমে আসে। সাথে সাথে কামান হতে নিক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ডও। কয়েকজন মুজাহিদ তীরের আঘাতে গুরুতর আহত হয়। কিন্তু তারপরও তাদের উদ্দীপনায় ভাটা পড়ে না। যিরারের কয়েকজন তীরন্দায এমন অবস্থায় সামনে অগ্রসর হতে থাকে যে, তাদের দেহে দু'তিন তীর বিদ্ধ হয়েছিল। তারা শরীরে তীর নিয়েই এগিয়ে যায় এবং কামান পরিচালকদের

উপর তীর নিক্ষেপ করে। কামান পরিচালকরা একেবারে সামনেই ছিল। জানবায মুজাহিদদের নিক্ষিপ্ত তীরে তাদের প্রায় সবাই তীরাহত হয়ে পড়ে যায়। ফলে কামান বন্ধ হয়ে যায়।

মুসলমান তীরন্দাযগণ ঐ হুকুম বর্ণে বর্ণে পালন করে, যা তাদের দেয়া হয়েছিল। তারা কামান অকেজো ও অচল করে দেয়। শুধু এটুকু করেই তারা ফিরে আসে না। তারা ঐ অবস্থায় কেল্লার তীরন্দাযদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করতে থাকে। শূন্যে তীরের আসা-যাওয়া ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছিল না। জানবায মুজাহিদদের অভূতপূর্ব নির্ভীকতা ও বীরত্ব দেখে আরো কয়েকজন তীরন্দায চলে আসে। এটা ছিল তীরের যুদ্ধ। উভয় পক্ষের লোকজন তীরবৃষ্টির শিকার হচ্ছিল।

সেনাপতি যিরার মুষ্টিমেয় তীরন্দাযদের অকুতোভয় ও নির্ভীকতা দেখে কেল্লার চার পাশ প্রদক্ষিণ করেন এবং তীরন্দাযদের প্রতি আবারও এ বার্তা পাঠান যে, তারা যেন আরও সামনে অগ্রসর হয়ে তীর নিক্ষেপ করে।

অপর তিন কেল্লার অবস্থাও অনেকটা এমনই ছিল। খ্রিস্টানরা বীরত্বের সঙ্গে মোকাবেলা করছিল। মুসলিম অশ্বারোহীরা দ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে পাঁচিলের কাছে আসত এবং ধাবমান ঘোড়ায় বসে তীর নিক্ষেপ করে বের হয়ে যেত। এ কৌশলে অশ্বারোহীদের এই ফায়দা হয় যে, তারা শত্রুপক্ষের তীরের নিশানা হতে বেঁচে যেত। তারপরও কিছু অশ্বারোহী আহত হয়। কতিপয় মুজাহিদ কেল্লার প্রধান ফটক পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং তারা দরজা ভাঙ্গার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালায়। কিন্তু ফটকের রক্ষীরা অধিকতর বীরত্ব দেখিয়ে তাদের সকল চেষ্টা ভণ্ডুল করে দিতে থাকে। মুসলিম বাহিনীর তীরের আঘাতে পাঁচিলের উপরের যত সৈন্য ভূপতিত হত তার চেয়ে বেশি সৈন্য এসে তাদের শূন্যস্থান পূরণ করত।

✪

হযরত খালিদ (রা.) প্রতিটি কেল্লা চক্কর দিয়ে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবগত হতে থাকেন এবং মুজাহিদ বাহিনীকে এই একটি কথাই বলেন যে, যেভাবেই হোক সন্ধ্যার পূর্বেই কেল্লা জয় করা চাই। কেল্লা জয় করতে বেশি সময় নেয়ার অবকাশ আমাদের নেই। হযরত খালিদ (রা.) শুধু পেছনে থেকেই নির্দেশ দেন না; বরং কেল্লার পাঁচিলের তত কাছে পর্যন্ত চলে যেতেন যেখানে তীরবৃষ্টি হচ্ছিল। তিনি দু'টি কেল্লার প্রধান ফটক পর্যন্ত পৌঁছে যান আর তীর তার চারপাশ দিয়ে শো শো করে উড়ছিল।

হযরত খালিদ (রা.) এই জন্য বেশি দেরী করতে পারছিলেন না যে, তার আশঙ্কা ছিল, হয়ত হঠাৎ পশ্চাৎদিক হতে আযাদাবাহের আত্মপ্রকাশ ঘটতে পারে এবং সে মুসলিম বাহিনীর উপর চড়াও হতে পারে। ভূখণ্ডটি ছিল অগ্নিপূজারীদের। কেল্লা তাদের। সৈন্য তাদের। এলাকার লোকজনও ছিল তাদের পক্ষে। এর বিপরীতে মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা ছিল নেহায়েত কম। উপরন্তু এই দূরদেশে তাদের আশ্রয়স্থলও ছিল না। এটা হযরত খালিদ (রা.)-এর অসাধারণ বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা এবং তার উপসেনাপতিদের নজিরবিহীন দুঃসাহসিকতার পরিচয় ছিল যে, তারা শত শংকা দু'পায়ে দলিত-মথিত করে একের পর এক শুধু এগিয়েই চলছিলেন। তাদের অভিধানে 'পশ্চাদমুখিতার' কোনো নাম-গন্ধও ছিল না। মূলত এই দুঃসাহসিকতার কারণেই পারসিক বাহিনীর জন্য মুসলিম বাহিনী ত্রাসে পরিণত হয়েছিল। মুসলমানদের নাম শুনলেই তারা ঘাবড়ে যেত। তাদের হৃদপিণ্ডে কম্পন সৃষ্টি হত। যার ফলে তারা মুসলমানদের অনেক অনেক গুণ বেশি হওয়া সত্ত্বেও রণাঙ্গনে টিকে থাকতে পারত না এবং যারা থাকত তারা গাজর-মূলার মত কাটা পড়ত।

হযরত খালিদ (রা.) কখনও এই আত্মতৃপ্তিতে ভুগতেন না যে, যারা পরাজিত হয়ে রণে ভঙ্গ দিয়েছে তারা আর আক্রমণের সাহস পাবে না। তিনি এই চার কেল্লাকে শত্রুর পাতা ফাঁদ কিংবা বিছানো জাল মনে করতেন। তাই তিনি অধিকতর সতর্কতার জন্য দূর দূরান্তে গুপ্তচর পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। যারা উঁচু বৃক্ষে চড়ে, উঁচু জায়গায় উঠে সর্বদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। তাদের প্রতি এই নির্দেশ ছিল যে, দূর থেকে সৈন্যের কোনো চিহ্ন নজরে এলেই তা যেন হযরত খালিদ (রা.) কে তাৎক্ষণিক জানানো হয়।

"তারা আসবে ... অবশ্যই আসবে" হযরত খালিদ (রা.)-এর এই পয়গাম সকল সালার ও সৈন্য বরাবর পৌঁছে দেয়া হয়েছিল। সঙ্গে এ আহ্বানও ছিল যে, "খোদার সিংহগণ, হিম্মত কর। কেল্লা কজা কর। যদি দুশমন বাস্তবিকই এসে পড়ে, তবে তাদের প্রতি তোমাদের তীর কেল্লার পাঁচিলের উপর থেকে বর্ষিত হবে।"

লাগাতার যুদ্ধ, নতুন রণাঙ্গণে যাত্রা এবং অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকায় মুজাহিদ বাহিনী তাদের দেহ ও তার দাবীর কথা একরকম ভুলেই গিয়েছিল। তারা আত্মিক শক্তিতে লড়ছিল। একে অপরকে উৎসাহ, অনুপ্রেরণা যোগাত এবং শত্রুকে আহ্বান জানাত। তাদের তীর নিচ হতে শুধু উপরের দিকেই উড়ে যাচ্ছিল।

✪

এদিকে কেল্লাভ্যন্তরের দৃশ্য এমন ছিল যে, পাঁচিল হতে আহত তীরন্দাযদের সরিয়ে নেয়া হচ্ছিল। বেশিরভাগ তীর তাদের চেহারা, চোখ এবং ঘাড়ে লেগেছিল। আহতদের আত্মচিৎকারে তাদের সঙ্গীদের উৎসাহ-উদ্দীপনায় ভাটা পড়তে শুরু হয়েছিল। মুসলিম বাহিনীর নারাধ্বনি ও গর্জন কেল্লার এ দিক থেকে শোনা যাচ্ছিল। এতে কেল্লাবাসীদের হৃদকম্পন শুরু হয়ে গিয়েছিল। ভীতি ও ত্রাস তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। তারা ভেতর থেকে এটা বুঝছিল যে, অগণিত ও অসংখ্য সৈন্য কেল্লা অবরোধ করে রেখেছে।

ঐতিহাসিকদের সূত্রে মুহাম্মাদ হুসাইন হায়কাল লিখেছেন, সকল কেল্লাতে পাদ্রী এবং অন্যান্য ধর্মীয় নেতারা ছিল। তারা যখন দেখল, পাঁচিল হতে বহু পরিমাণ আহত সৈন্যদের নামানো হচ্ছে, তখন তারা কেল্লার অধিকর্তাদের কাছে যায়। ইতিহাস হতে শুধু এক কেল্লার অভ্যন্তরের বিস্তারিত অবস্থা জানা যায়। এটা ছিল 'কসরে ইবনে বুকায়লা' কেল্লা। এ কেল্লার অধিপতির নাম ছিল আব্দুল মাসীহ্ বিন আমর বিন বুকায়লা।

আবদুস মাসীহ্ সম্পর্কে এই তথ্য জানানো দরকার যে, তিনি কোনো যেনতেন কেল্লাপতি ছিলেন না। তিনি 'ইরাকের শাহজাদা' হিসেবেও পরিচিত ছিলেন। অগ্নিপূজারীরা এক সময় ইরাক দখল করে নিয়েছিল। কিন্তু আব্দুল মাসীহ্ এর বাপ-দাদারা এই কেল্লাকে নিজেদের কাছেই রাখেন। পারস্য সম্রাটের পক্ষ হতে তাকে কর্তৃত্ব দেয়া হয়নি, তিনি ছিলেন স্বঘোষিত অধিকর্তা। তিনি অন্যান্য কেল্লাপতিকেও নিজের প্রভাবে প্রভাবান্বিত রেখেছিলেন। তিনি ছিলেন অসাধারণ বিচক্ষণ। বীরত্বেও ছিলেন অদ্বিতীয়। তার সবচেয়ে বড় গুণ ছিল প্রতুৎপন্নমতিত্ব এবং উপস্থিত জবাব। তিনি বার্ধক্যে উপনীত হয়েছিলেন। কিন্তু তারপরও প্রেরণা ও উদ্দীপনায় ছিলেন টগবগে যুবক।

তিনি ন্যায়পরায়ণ নওশেরওয়ার যুগও দেখেছিলেন। এর থেকে বুঝা যায়, তার বয়স অনেক বেশিই হয়েছিল। বাকপটুত্ব এবং বিচক্ষণতার কারণে নওশেরওয়ার (কিসরা উর্দূশেরের দাদা) আব্দুল মাসীহকে খুব ভালবাসতেন।

"নওশেরওয়া!" তিনি একবার ন্যায়পরায়ণ নওশেরওয়াকে বলেছিলেন "আমি এবং আমার কিছু সর্দার আপনার আনুগত্য মেনে নিব না। আমরা নিজ নিজ কেল্লাতেই অবস্থান করব। এতে আশা করি আপনারও কিছু ফায়দা হবে।"

"আমি তোমাকে এবং তোমার কাঙ্ক্ষিত সর্দারদেরকে চার কেল্লা দিয়ে দিলাম" নওশেরওয়া বলেছিলেন "কিন্তু আমার মৃত্যুর পরে তোমাদের সঙ্গে পারসিকদের আচরণ কেমন হবে আমি তা বলতে পারি না।"

"আপনার মৃত্যুর পর পারস্য সাম্রাজ্যের অধঃপতন শুরু হবে" আব্দুল মাসীহ বলেছিলেন।

"মধুবর্ষণকারী মুখ হতে আমি এমন কথা শুনতে পারি না-ইবনে বুকায়লা!" নওশেরওয়া বলেছিলেন। "তবে কি তুমি আমাকে বদদোয়া দিচ্ছ নাকি পারস্যের অধঃপতনের কারণ তুমি নিজেই হবে?"

"কোনটিই নয়" আব্দুল মাসীহ্ বলেছিলেন "আপনি সৎশাসক। আপনার পর ন্যায়পরায়ণতাও মরে যাবে, শুধু রাজাগিরি রয়ে যাবে। তৃতীয় অথবা চতুর্থ প্রজন্ম আপনার নাম কলংকিত করবে। এতে করে পারস্যের সীমানা সংকুচিত হতে থাকবে এবং তদস্থলে অন্য কোনো জাতি এসে ক্ষমতা দখল করে নিবে।"

"অন্তর তোমার কথায় সায় দিতে চায় না" নওশেরওয়া বলে। "পারস্য একটি শক্তির নাম।"

"তবে মন দিয়ে শুনুন নওশেরওয়া!" আব্দুল মাসীহ্ বলেছিল। "যে মাথায় একবার রাজাগিরি ঢোকে সেখান থেকে ন্যায়-ইনসাফ বেরিয়ে যায়। সিংহাসনে বসলে প্রজাদের মহব্বত অন্তর থেকে উধাও হয়ে যায়। আপনার পরে আগত শাসকেরা যদি সৈন্যদের উপর ভরসা করে প্রজাদের শান্তি-সুখের চিন্তা না করে, তাহলে তারা তাদের পতনকে তরান্বিত করবে। তাদের দ্বারা নিষ্পিষ্ট জনগণ তাদের সঙ্গ দিবে, যারা বাইরে থেকে এসে হামলা করবে। আমার বয়সও তত বেশি নয় যে, অভিজ্ঞতার আলোকে কথা বলব, কিন্তু আমি অনুভব করছি যে, পারস্যবাসীদের জন্য আগত ভবিষ্যত মোটেও সুখকর হবে না।"

এটা ছিলো অনেক পূর্বের আলাপন। এখন আব্দুল মাসীহের বয়স এত বেশি হয়েছে যে, তার কোমর নুয়ে পড়েছে। কাঁধ বাঁকা হয়ে গেছে। কাঁপুনির রোগে তিনি এত বেশি আক্রান্ত যে, সর্বদা তার মাথা ও হাত কাঁপতে থাকে। নওশেরওয়ার দ্বিতীয় প্রজন্মের সম্রাট পরাজয়ের গ্লানি সইতে না পেরে মারা গিয়েছিল এবং বাস্তবিকই পারস্যের পতনধারা শুরু হয়েছিল।

✪

হযরত খালিদ (রা.) আজ সেই আব্দুল মাসীহ্ ও তার সর্দারদের কেল্লা অবরোধ করে রেখেছেন। সময়ের গতি যত বাড়ছিল, কেল্লার সৈন্যদেরও প্রেরণা তত হ্রাস পাচ্ছিল। এক সময় তাদের মধ্যে এমন কেউ ছিল না, যে হিম্মত করে পাঁচিলে উঠে মুসলমানদের অবস্থা দেখে আসবে। সম্ভবত মুসলমানদের সংখ্যা সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা ছিল না।

মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা ছিল সর্বসাকুল্যে ১৮ হাজার। এই সৈন্যরা ভাগ হয়ে চার কেল্লা অবরোধ করে রেখেছিল। শুধু অবরোধ নয়; বীরদর্পে এগিয়ে হামলাও করছিল। আব্দুল মাসীহ্ তার মহলে গেলে সেখানে দু'জন পাদ্রী তার সাক্ষাতের জন্য অপেক্ষমাণ ছিল।

"গীর্জায় কী নিজেদের বিজয় এবং শত্রুদের ধ্বংসের দোয়া চলছে?" আব্দুল মাসীহ্ পাদ্রীদের জিজ্ঞাসা করেন।

"চলছে" প্রধান পাদ্রী জবাব দেয়।

"তবে আপনারা এখানে কেন এসেছেন?" আব্দুল মসীহ্ জানতে চান। "যান, গীর্জার ঘণ্টাধ্বনি যেন বন্ধ না হয়।"

"আমরা নিজেদের সৈন্য, জনসাধারণের ব্যাপক হত্যা এবং তাদের ঘর বাড়ীকে লুটতরাজ হতে বাঁচানোর জন্য এসেছি" প্রধান পাদ্রী জানায়। "আপনি কী দেখছেন না যে, আমাদের কত সৈন্য আহত এবং নিহত হয়েছে? আপনার কান পর্যন্ত দুশমনদের রণহুংকার ও নারাধ্বনি পৌঁছেনি?"

"তবে কি তোমরা আমাকে এ কথা বলতে এসেছ যে, আমরা আত্মসমর্পন করি?" আব্দুল মাসীহ্ জিজ্ঞাসা করে।

"আপনার স্থলে অন্য কোনো কেল্লাপতি হলে আমরা এমন পরামর্শ দিতাম না" দ্বিতীয় পাদ্রী বলে। "কিন্তু আপনি অভীজ্ঞ এবং বিচক্ষণ। যা আপনি বুঝেন তা অন্য কারো মাথায় আসে না। বাস্তবতা সামনে রাখুন। মুসলমানরা কেল্লা কব্জা করা এবং কেল্লায় ঢুকে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ, লুটতরাজ এবং নারীদের ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়ার পূর্বেই আপনি যদি কিছু শর্তসাপেক্ষে কেল্লা তাদের হাওলা করে দেন, তাহলে এটা বড় কল্যাণজনক হবে।"

"আমাকে চিন্তা করতে দাও" আব্দুল মাসীহ্ বলে।

"চিন্তা করার সময় কোথায়?" পাদ্রী বলে "উপরের দিকে চেয়ে দেখুন, মুসলমানদের তীর পাঁচিল টপকে ভিতরে এসে পড়ছে। ... আরো দেখুন, জখমীদের কাঁধে করে কীভাবে নিচে নামিয়ে আনা হচ্ছে। আপনি কি খেয়াল করেননি যে, পাঁচিলের ওপরে এবং বুরুজে অবস্থানরত আমাদের তীরন্দায বাহিনীর সংখ্যা কত দ্রুত কমে যাচ্ছে? রক্তের বন্যা আর বইতে দেয়া ঠিক হবে না।"

কেল্লার বাইরের মুসলমানদের নারাধ্বনি এবং তীরবর্ষণ আরও জোরদার হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাদেরও জখমী ও শহীদদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। আব্দুল মাসীহ্ পাদ্রীদের বর্তমানে একজন দূত পাঠিয়ে বলেন যে, সে যেন দ্রুত কেল্লা প্রতিরক্ষার অবস্থা সরেজমিনে দেখে এসে প্রকৃত রিপোর্ট পেশ করে।

দূত ফিরে এসে যে অবস্থা তুলে ধরে তা মোটেও আশাব্যঞ্জক ছিল না। অন্যান্য কেল্লার অবস্থাও খ্রিস্টানদের পক্ষে ছিল না। মুসলমানদের পাল্লাই ভারী ছিল। কেল্লার দরজা খুলে যায়। অশ্বে উপবিষ্ট এক বৃদ্ধ লোক বাইরে বেরিয়ে আসে। তার সাথে দু'তিন জন সর্দার ছিল। এক সর্দার উচ্চ আওয়াজে জানায় যে, তারা মিত্রতার পয়গাম নিয়ে এসেছে। তারা বের হতেই দরজা বন্ধ হয়ে যায়।

"আমরা তোমাদের সেনাপতির সাক্ষাৎ চাই" আব্দুল মাসীহ-এর পক্ষে প্রতিনিধি হিসেবে আসা সর্দার বলে।

পাঁচিলের উপর হতে তীরের আনাগোনা থেমে গিয়েছিল। মুসলমানগণও তীরবর্ষণ বন্ধ করে দেয়। হযরত খালিদ (রা.)-কে কেউ সংবাদ দেয় যে, শত্রুপক্ষ বাইরে বেরিয়ে এসেছে।

"সে কে?" হযরত খালিদ (রা.) জানতে চান।

"কেল্লাপতি আব্দুল মাসীহ্ নিজে এসেছেন" হযরত খালিদ (রা.) জবাব পান।

"তাকে বলো, তার সাথে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছে আমার নেই" হযরত খালিদ (রা.) বলেন। "আমি জানি সে সকল কেল্লাপতির নেতা। তাকে বল যে, যদি সন্ধ্যা নাগাদ অপর তিন কেল্লাপতিও অস্ত্র সমর্পণ না করে, তবে আমরা তাদের এমন কোণঠাসা করে ছাড়ব যে, তারা আমাদের শর্ত মানতে রাজি হয়ে যাবে। একজনকেও জিন্দা ছাড়ব না।"

আব্দুল মাসীহ্ হযরত খালিদ (রা.)-এর এই পয়গাম শুনে বুঝে নেন যে, পরিশেষে বিজয় মুসলমানদেরই হবে। তিনি তৎক্ষণাৎ তার সর্দারদেরকে অন্যান্য কেল্লায় পাঠিয়ে দেন। অন্যান্য কেল্লার অভ্যন্তরীণ দৃশ্যও এমন ছিল, যা আব্দুল মাসীহ্-এর ছিল। কেল্লার সৈন্যদের উদ্দীপনায় ভাটা পড়েছিল এবং সাধারণ জনতা ছিল ভীত, চরম উদ্বিগ্ন। সেসব কেল্লাপতিরা অস্ত্র সমর্পণ করতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু কেউ এটা চাচ্ছিল না যে, তার অস্ত্র সমর্পণ প্রথমে হোক আর এই কলঙ্ক তার গায়ে লাগে যে, সে সর্বপ্রথম অস্ত্র সমর্পণ করেছে। এ ক্ষেত্রে আব্দুল মাসীহ্-এর পয়গাম তাদের মাঝে স্বস্তি এনে দেয়। তার পয়গাম পেয়েই তীর বর্ষণ বন্ধ করে দিয়ে তিন কেল্লাপতি বাইরে বেরিয়ে আসে। তাদেরকে হযরত খালিদ (রা.) এর সামনে আনা হয়। তখন হযরত খালিদ (রা.) একটি ঘন বৃক্ষের নিচে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

"তোমরা আমাদের দুর্বল মনে করে মুকাবেলা করছিলে?" হযরত খালিদ (রা.) কেল্লাপতিদের লক্ষ্য করে বলেন "তোমরা কি ভুলে গেছ যে, তোমরা সবাই আরব? তোমাদের কি জানা নেই যে, আমরাও আরব? তোমরা অনারবী হলেও এই আশা না রাখাই উচিত ছিল যে, তোমরা ঐ সেনাদলকে পরাস্ত করতে পারবে না, যারা ন্যায়-ইনসাফে নজিরবিহীন এবং যাদের তলোয়ারের খ্যাতি সর্বজনবিদিত।"

"আপনি যা ইচ্ছে বলতে পারেন" বয়োবৃদ্ধ আব্দুল মাসীহ্ বলেন। "আপনি বিজয়ী। আজ আমাদের কিছু বলার অধিকার নেই। কেননা আমরা আপনার সামনে অস্ত্র সমর্পণ করেছি।"

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আবু ইউসুফ হযরত খালিদ (রা.) এবং আব্দুল মাসীহ্-এর কথোপকথনের বিবরণ দিতে গিয়ে আরও লিখেন, আব্দুল মাসীহ্ এত বেশি বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিল যে, তার ভ্রু পর্যন্ত দুধের মত সাদা হয়ে গিয়েছিল এবং তা এত বেশি লম্বা হয়ে গিয়েছিল যে, তাতে তার চোখ পর্যন্ত ঢাকা পড়েছিল। এই ঐতিহাসিকের সূত্রে জানা যায় যে, হযরত খালিদ (রা.) আব্দুল মাসীহ্-এর ব্যক্তিত্বে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন।

"আপনার বয়স কত?" হযরত খালিদ (রা.) আব্দুল মাসীহ্-এর কাছে জানতে চান। "দুইশত বছর" আবদুল মাসীহ্ জবাব দেন।

বুড়োর এই জবাবে হযরত খালিদ (রা.) বড়ই বিস্মিত হন। তিনি ঐ বুড়ো কেল্লাপতির কথায় সন্ধিহান হয়ে গভীরভাবে তার চেহারায় দৃষ্টিপাত করেন।

কোনো ঐতিহাসিক আব্দুল মাসীহ্-এর প্রকৃত বয়স লেখেননি। বিভিন্ন ঘটনা হতে জানা যায় যে, তার বয়স একশত বছরের কিছু বেশি ছিল।

"আপনি দীর্ঘ হায়াত পেয়েছেন" হযরত খালিদ (রা.) বলেন। "এখন বলুন এই দীর্ঘ জীবনে আপনি সর্বাধিক বিস্ময়কর কী দেখেছেন।"

"নওশেরওয়ার ন্যায়-ইনসাফ" আব্দুল মাসীহ্ জবাবে বলেন। "বর্তমানে শাসক তিনি হন যার বাহুবল বেশি এবং যিনি তরবারী চালাতে বেশি পারদর্শী। কিন্তু নওশেরওয়া ন্যায়-ইনসাফের মাধ্যমে মানুষের মন জয় করে নিয়েছিলেন। আপনি দাবী করেছেন যে, মুসলমানরা ন্যায় ইনসাফে অদ্বিতীয় ... না, আমি নওশেরওয়াকে ইনসাফগার বলে মানি।"

"আপনার বাড়ী কোথায়?" হযরত খালিদ (রা.) আব্দুল মাসীহ্-এর কাছে জিজ্ঞাসা করেন। "আপনি কোন এলাকার বাসিন্দা?"

"একটি গ্রামের" আব্দুল মাসীহ্ জবাবে বলেন। যেখানে কোনো মহিলাও সফর করলে তার জন্য রুটির একটি টুকরোই যথেষ্ট হয়ে যায়।"

"আপনি কি নির্বোধ নন?" হযরত খালিদ (রা.) বলেন। "আমি কী জিজ্ঞাসা করছি আর আপনি জবাব কী দিচ্ছেন? ... আমি জানতে চাচ্ছি, আপনি কোথা হতে এসেছেন?"

"আমার পিতার মেরুদণ্ডের হাড় হতে" আব্দুল মাসীহ্ জবাবে জানান। "আপনি কেল্লাপতি হওয়ার যোগ্য কবে থেকে হয়েছেন?" হযরত খালিদ (রা.) ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলেন "আমি জিজ্ঞাসা করছি, আপনি কোথা হতে এসেছেন?"

"আমার মায়ের উদর হতে" আব্দুল মাসীহ্ জবাবে বলে।

হযরত খালিদ (রা.) যখন দেখেন যে, বুড়োর কথাবার্তা বলা, চিন্তা-ভাবনা করা এবং উত্তর প্রদানের ঢং অনেকটা রসিকতামূলক, তখন তিনিও চিত্ত বিনোদনের জন্য তার ঢংয়ে কথা বলা শুরু করেন। ঐ সময় যে প্রশ্নোত্তর চালাচালি হয়েছিল তা প্রায় সকল ঐতিহাসিকই লিপিবদ্ধ করেছেন। তা অনেকটা এমন–

"আপনি কোথায় যাবেন?" হযরত খালিদ (রা.) জিজ্ঞাসা করেন।

"সম্মুখপানে" আব্দুল মাসীহ্ জবাব দেন।

"আপনার সম্মুখে কী আছে?"

"আখেরাত" আব্দুল মাসীহ্ জবাবে বলে।

"জানেন, কোথায় আপনি দাঁড়ানো?' হযরত খালিদ (রা.) জিজ্ঞাসা করেন।
"মাটির উপর" আব্দুল মাসীহ্ বলে।

হযরত খালিদ (রা.) তার নির্ভীক ও বেপরোয়া অবস্থা দেখে তার মধ্যে এই অনুভূতি জাগ্রত করতে চান যে, তিনি একজন বিজেতা সেনাপতির সামনে দণ্ডায়মান। আল্লাহই ভাল জানেন, তিনি কী যেন ভেবে তাকে জিজ্ঞাস করেন "আপনি কীসের মধ্যে আছেন?"

"স্বীয় কাপড়ের মধ্যে" আব্দুল মাসীহ্ জবাব দেন।

দীর্ঘমেয়াদী হেয়ালীর কারণে হযরত খালিদ (রা.)-এর রাগ চড়তে থাকে। তিনি ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বলেন "দুনিয়া নির্বোধদের ধ্বংস করে কিন্তু লোকেরা দুনিয়াকে ধ্বংস করে। আমি জানি না, আপনি নির্বোধ না জ্ঞানী। আপনার গোত্রের লোকেরাই কেবল পারে আমার কথার সঠিক জবাব দিতে।"

"জনাব বিজয়ী সেনাপতি!" আব্দুল মাসীহ্ বলেন। "পিঁপড়াই ভাল জানে তার গুহার মধ্যে কিছু রেখেছে কিনা, উট কখনো তা বলতে পারে না।"

তার এ কথায় হযরত খালিদ (রা.) চমকে উঠে আব্দুল মাসীহ্-এর দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকান। তার রাগ পড়ে গিয়েছিল। তিনি বুড়োর এতটুকু কথায় বুঝে ফেলেন যে, লোকটি মোটেই নির্বোধ কিংবা অশিক্ষিত নন। হযরত খালিদ (রা.)-এর সম্মান ও শ্রদ্ধা চলে আসে।

"সম্মানিত বুযুর্গ" হযরত খালিদ (রা.) বলেন। "এমন একটি কথা বলুন, যা সর্বদার জন্য আপনি মনে রাখতে চান।"

ঐতিহাসিকগণ লেখেন, হযরত খালিদ (রা.)-এর এই প্রশ্নে আব্দুল মাসীহ্ গভীর চিন্তায় হারিয়ে যান। তার চেহারায় উদাস ও বিষণ্নতার ছাপ প্রকাশ পায়। তিনি কিছুক্ষণ পর চোখ খুলে কেল্লা পানে তাকান।

"আমার সে সময়ের কথা মনে পড়ছে" আব্দুল মাসীহ্ বলেন, "যখন এই কেল্লার পাশ ঘেঁষে প্রবহমাণ ফোরাত নদীতে চীনের সামুদ্রিক জাহাজ পাল তুলে চলাচল করত। আমার জানা মতে, সেটা ছিল বাদশা নওশেরওয়ার শাসনামল। প্রজারা সুখী ও সমৃদ্ধ ছিল। কেউ প্রাসাদে থাকুক আর গাছতলায় থাকুক, সকলের জন্য নওশেরওয়ার ন্যায়- ইনসাফ ছিল এক, বিচার ছিল অভিন্ন।"

"মাননীয় বুযুর্গ!" হযরত খালিদ (রা.) বলেন। "খোদার কসম, আপনি মুসলমানদের ন্যায়–ইনসাফও স্মরণে রাখবেন ...। যদি আপনি আপনার

লোকবলসহ ইসলাম গ্রহণ করেন, তাহলে আপনিসহ আপনার এলাকার সকল জনতার হেফাজতের দায়িত্ব হবে আমাদের। আপনারা সেসব অধিকার ভোগ করবেন, যা মুসলমানরা করে থাকে। যদি আপনি ইসলাম গ্রহণ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে আপনাকে এবং অন্যান্য কেল্লাপতিদের আমাদের নির্ধারিত কর আদায় করতে হবে। আপনি যদি এতেও সম্মত না হন, তাহলে ইতোমধ্যেই আপনি দেখেছেন যে, মুসলমানরা কীভাবে কেল্লা বিজয় করে এবং তাদের তালায়ারের ধার কেমন।" "আমাদের থেকে অন্য কিছু চান আমরা দিব" আবদুল মাসীহ বলে। "কিন্তু কোনোভাবেই আমাদের স্বধর্ম ত্যাগ করব না। বলুন কত কর দিতে হবে।"

"আপনার মত জ্ঞানী ব্যক্তির থেকে এমন জবাবের আশা আমার ছিল না" হযরত খালিদ (রা.) বলেন। "কুফর আপনাকে পরাজয়ের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়েছে। ঐ আরবকে আমি অবিবেচকই মনে করি, যিনি আরবি রাস্তা হতে দূরে সরে গিয়ে অনারবি রাস্তা অবলম্বন করে।"

হযরত খালিদ (রা.) এর এই কথা আবদুল মাসীহকে কোনোরূপ প্রভাবিত করে না। কোনো ভাবান্তর ঘটে না অন্যান্য কেল্লাপতি ও সর্দারদের মাঝে। তারা ইসলাম গ্রহণ না করার উপর অটল অবিচল থাকে। অগত্যা হযরত খালিদ (রা.) তাদের প্রতি কর ধার্য করেন। করের পরিমাণ বলতেই তারা তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে মেনে নেয়। আর তা ছিল, এক লাখ নব্বই হাজার দেরহাম। যে চুক্তিনামা লিখিত হয় তার বিবরণ ছিল এরূপ–

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

এটি একটি চুক্তিপত্র, যা হযরত খালিদ (রা.) হীরার শাসকগণ তথা আদী বিন আদী, আমর বিন আদী, আমর বিন আব্দুল মাসীহ, আয়াস বিন কুরাইসা এবং ইবনে আক্কালের সঙ্গে করছেন। চুক্তিটি হীরার সমস্ত জনগণ মেনে নিয়েছে। এটা পালন করা হীরার শাসনকর্তাদের দায়িত্ব। এই চুক্তিপত্র মোতাবেক হীরাবাসী মুসলিম রাজধানী মদীনায় এক লাখ নব্বই হাজার দেরহাম প্রতি বছর কর আদায় করবে। এই কর হীরার পাদ্রী এবং অন্যান্য ধর্মীয় নেতাদেরও আদায় করতে হবে। শুধুমাত্র প্রতিবন্ধী, গরীব-নিঃস্ব এবং দুনিয়া বিরাগী সন্ন্যাসীরা এই করের আওতার বাইরে থাকবে। তাদের থেকে এই কর উসূল করা হবে না।

এই বাৎসরিক কর রীতিমত প্রদান অব্যাহত থাকলে হীরাবাসীর নিরাপত্তা বিধানের জিম্মাদার হবে মুসলমানগণ। মুসলমানরা স্বীয় দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে কর আদায় করা হবে না। যদি হীরাবাসী এই চুক্তির খেলাফ করে তাহলে মুসলমানরাও তাদের দায়িত্ব হতে মুক্ত হয়ে যাবে। ১২ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে এই চুক্তি সম্পাদিত হল।

✪

হীরার উপর মুসলমানদের পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ চলে আসে। চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর সমস্ত কেল্লাপতি, সর্দারগণ এবং শাসনকর্তারা হযরত খালিদ (রা.)-এর আনুগত্য মেনে নেয়। এটা মূলত খলীফা হযরত আবু বকর (রা.)-এর আনুগত্য ছিল। হযরত খালিদ (রা.) ছিলেন মাঝে প্রতিনিধিস্বরূপ। এরপর হযরত খালিদ (রা.) সমস্ত সৈন্যসহ আট রাকাত শুকরিয়া নামায পড়েন। নামায শেষে হযরত খালিদ (রা.) সৈন্যদের উদ্দেশে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন।

"মুতা যুদ্ধে আমার হাতে নয়টি তলোয়ার ভেঙে ছিল। কিন্তু অগ্নিপূজারীরা যে বীরত্বের সাথে মোকাবেলা করেছে তা আমার চিরদিন মনে থাকবে। তারা উলাইয়িস ময়দানে আমাদের সঙ্গে যেভাবে লড়েছে, ইতিপূর্বে আমি এমন লড়াই আর কখনো দেখিনি ...।

ইসলামের সৈনিকগণ! জয়-পরাজয় আল্লাহর হাতে। আল্লাহর নাম, তাঁর প্রদত্ত নেয়ামত এবং তাঁর রসূলের কল্পনা সর্বক্ষণ অন্তরে রাখবে। হীরা বিরাট নেয়ামত যা আল্লাহপাক আমাদের অনুদান দিয়েছেন। তবে মনে রেখ, আমাদের জিহাদ কিন্তু শেষ হয় নি। কুফর নিশ্চহ্ন না হওয়া পর্যন্ত জিহাদ চলতে থাকবে।

এরপর হযরত খালিদ (রা.) শহীদদের রূহের মাগফিরাতের জন্য দোয়া করে আহতদের খোঁজ-খবর নিতে যান। শহীদদের জানাযা নামায পড়ার দৃশ্যটি ছিল বড়ই বেদনাবিধুর। মাতৃভূমি হতে এত দূরে এসে শহীদদের জন্য প্রতিটি চোখ ছিল অশ্রুপ্লাবিত। শহীদদের কবরে সমাহিত করা হলে কবরস্থানটি ইতিহাসের মাইলফলক হিসেবে পরিণত হয়।

হযরত খালিদ (রা.) হীরার ব্যবস্থাপনা ঢেলে সাজাতে আযাদাবাহ-এর শাহী মহলে যান, তখন সেখানে বহু আমীর ও নেতারা তার জন্য উপহার হাতে দণ্ডায়মান ছিল। এসব উপহার দিয়ে তারা হযরত খালিদ (রা.)-কে স্বাগত জানান। উপহারসমূহ অত্যন্ত দামী ও মূল্যবান ছিল। এর মধ্যে হীরা-জওহারও ছিল। মদীনার মুজাহিদগণ এই ভেবে বিস্মিত হন যে, পৃথিবীর কোনো জাতি এত সম্পদশালীও হতে পারে!

হযরত খালিদ (রা.) সকলের উপহার গ্রহণ করেন ঠিকই কিন্তু মাদুরে বসে শাসন করা সম্প্রদায়ের এই সেনাপতি নিজের জন্য একটি উপহারও রাখলেন না; বরং সমুদয় উপহার গণীমতের মালের সাথে মিলিয়ে আমীরুল মু'মিনীনের খেদমতে পেশ করার জন্য মদীনায় পাঠিয়ে দেন। গনীমতের মাল বেশি ছিল না। কেননা, হীবাবাসী করারোপ মেনে নিয়েছিল এবং আনুগত্যও স্বীকার করে নিয়েছিল।

✪

একটি বিস্ময়কর ও আজব ঘটনা ঘটে।

কয়েক বছর পূর্বের ঘটনা। রসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের মাঝে বসা ছিলেন। বৈঠকে বিভিন্ন কথাবার্তা হচ্ছিল। এক পর্যায়ে কথার মোড় কাফের এলাকার দিকে ঘুরে যায় এবং আলোচনার টেবিলে পারস্য সম্রাটের প্রসঙ্গ চলে আসে। হীরা ছিল পারস্য সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। এক সাহাবী মন্তব্য করেন, হীরা কব্জায় এসে গেলে সেখানে সেনানিবাস গড়ে তুলে কিসরার সাথে টক্কর লাগানো যেতে পারত।

দুইজন ঐতিহাসিক বালাপুরী এবং তবারী (রহ.) লিখেন, জবাবে নবীজী বলেন, কিছুদিন পরেই হীরা আমাদের হাতে চলে আসবে। উভয় ঐতিহাসিক লিখেন, নবীজীর ঐ আলোচনা মজলিসে হীরার গুরুত্ব এবং অত্র অঞ্চলের সৌন্দর্যের বিভিন্ন বিবরণ আলোচিত হতে থাকে।

আব্দুল মাসীহ প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। কাররামা নামে তার এক কন্যা ছিল, যার রূপলাবন্য ও সৌন্দর্যের কথা বিভিন্ন দেশের বণিকদের মুখে মুখে লেগে ছিল। অনেক দূর-দূরান্ত পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল তার রূপের খ্যাতি। তৎকালে কাররামা ছিল বিশ্বসুন্দরী। সকলেই তার সৌন্দর্যের প্রশংসা করত।

বালাজুরী এবং তবারী লিখেন, নবীজীর উক্ত বৈঠকে অত্যন্ত সাধাসিধা এবং সাধারণ পর্যায়ের একজন মানুষ ছিল শাবীল।

"হে আল্লাহর রসূল!" শাবীল নিবেদন করে। "হীরা বিজিত হলে আব্দুল মাসীহ এর কন্যা কাররামাকে আমার হাতে তুলে দিবেন।"

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হেসে রসিকতাচ্ছলে বলেন- "হীরা বিজিত হলে কাররামা বিনতে আব্দুল মাসীহ তোমার হবে।"

কোনো ঐতিহাসিক এ তথ্য লিখেননি যে, হীরা বিজয়ের কত বছর পূর্বে এ আলোচনা হয়। যখন হীরা বিজিত হয় তখন হযরত খালিদ (রা.)- এর সৈন্যদের মধ্য হতে আধাবয়স্ক একটি লোক ঐ সময় হযরত খালিদ (রা.)-এর সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, যখন আব্দুল মাসীহ্ ও হযরত খালিদ (রা.)-এর মাঝে চুক্তির শর্তাবলী নির্ধারিত হচ্ছিল।

"তোমার নাম কী?" হযরত খালিদ (রা.) ঐ সিপাহীকে জিজ্ঞাসা করেন। "আমার কাছে কেন এসেছ?"

"মহান সেনাপতি!" সিপাহী বলে "আমার নাম শাবীল। আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এই ওয়াদা দিয়েছিলেন যে, হীরা বিজিত হলে তোমাকে আব্দুল মাসীহ্ এর কন্যা কাররামাকে দিয়ে দেয়া হবে। আজ হীরা বিজিত হয়েছে। তাই শাহজাদী কাররামাকে আমার হাতে তুলে দেয়া হোক।"

"তোমার কথার সত্যতার পক্ষে কোনো সাক্ষী পেশ করতে পার?" হযরত খালিদ (রা.) বলেন খোদার কসম দিয়ে বলছি, আমি নবীজীর প্রতিশ্রুতির বর-খেলাপ করার দুঃসাহস দেখাতে পারি না। তবে সাক্ষী না হলে তোমার দাবী মানতে পারব না।"

শাবীলের পক্ষে দু'জন সাক্ষী জুটে যায়। তারা হীরার বিজিত সেনাদলের মধ্যেই ছিল। তারা সত্যায়ন করে যে, তাদের উপস্থিতিতে নবীজী ঠিকই শাবীলকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

"নবীজীর প্রতিশ্রুতি আমার জন্য নির্দেশসম" হযরত খালিদ (রা.) আব্দুল মাসীহ্কে বলেন "আপনার কন্যাকে এই ব্যক্তির হাতে তুলে দিতে হবে।"

"তাহলে এটাও শর্তের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করুন" আবদুল মাসীহ্ বলেন। "যে আমার কন্যা কাররামাকে জনৈক সৈন্যকে প্রদান করতে হবে।"

আব্দুল মাসীহ-এর বাসভবনে এ সংবাদ পৌঁছে যায় যে, কাররামা যেন মুসলমানদের সিপাহসালারের কাছে চলে আসে। কাররামা জানতে চায়, তাকে কেন ডাকা হচ্ছে? তাকে বলা হয় যে, এক সিপাহী তাকে পাবার আব্দার জানিয়েছে, ফলে তাকে ঐ সিপাহীর হাওলা করে দেয়া হবে।

"এমন হতে দিও না" আব্দুল মাসীহ-এর মহলে অন্যান্য মহিলাদের গুঞ্জন ওঠে "এমন হতে দেয়া যায় না। শাহী খান্দানের এক কন্যাকে এক এমন সিপাহীর হাওলা না করা হোক, যে একজন সাধারণ আরব এবং জংলী বুদ্দু।"

"আমাকে তার কাছে নিয়ে চলো" কাররামা বলে "মনে হয় ঐ মুসলমান সিপাহী আমার যৌবনকালের সৌন্দর্যের কথা শুনে থাকবে। মনে হচ্ছে লোকটি বড়ই অজ্ঞ এবং নির্বোধ। সে হয়ত কাউকে জিজ্ঞাসা করেনি যে, আমার যে সৌন্দর্যের প্রশংসা তার কানে পড়েছে তা ছিল যৌবনকালের ব্যাপার। এখন তো আমি বুড়ি হয়ে গিয়েছি। আমার যে রূপ-খ্যাতির কারণে সে আমাকে চায় তা তো অনেক আগেই হারিয়ে গেছে। যৌবন বিদায় নিয়েছে অনেক আগেই।"

বালাজুরীর তথ্যমতে কাররামাকে হযরত খালিদ (রা.)-এর সামনে উপস্থিত করা হয়। শাবীলও সে মজলিসে উপস্থিত ছিল। সে তার সামনে এমন এক বুড়ি মহিলাকে দেখে যার চেহারার চামড়া ঝুলে পড়েছিল এবং চুল সাদা হয়ে গিয়েছিল। ঐতিহাসিক তবারী (রহ.) কাররামার বয়স লিখেন ৮০ বছর। তার পিতা হযরত খালিদ (রা.)-কে তার বয়স ২০০ বছর বলেছিলেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিক তাঁর এই দাবী সমর্থন করেন না। তাদের মতে, আব্দুস মাসীহ এর বয়স ১১০ এর কিছু বেশি হয়েছিল আর কাররামার বয়স ছিল তখন ৬০ থেকে ৭০ বছর এর মাঝামাঝি। সারকথা হলো, কাররামা তখন একজন বুড়ি ছিল।

শাবীল যখন কাররামাকে দেখে তখন তার চেহারায় পূর্ব হতে কাররামাকে পাবার যে আনন্দ ঝলমল করছিল তা হঠাৎ উবে যায়। খুশির স্থান সহসা নিরাশার আবরণে ঢেকে যায়। কিন্তু হঠাৎ একটি খেয়াল তাকে পেয়ে বসে।

"সম্মানিত আমীর!" শাবীল বলে "চুক্তিপত্রে লেখা হয়েছে যে, করারামা বিনতে আব্দুল মাসীহ আমার বাদী। যদি সে আযাদ হতে চায়, তবে তার জন্য মূল্য দিতে হবে।"

"কত মূল্য?" কাররামা জানতে চায়।

"এক হাজার রৌপ্যমুদ্রা" শাবীল বলে "আমি যদি মায়ের ছেলে হয়ে থাকি তবে এক মুদ্রাও কম নিব না।"

কাররামার বুড়ো ঠোঁটে মুচকি হাসি খেলে যায়। তার সঙ্গে আগত এক খাদেমাকে সে ইঙ্গিত করে। খাদেমা দ্রুত ছুটে যায় এবং ঘর হতে ১ হাজার দেরহাম নিয়ে আসে। কাররামা দেরহামের থলেটি শাবীলের হাতে তুলে দেয় এবং নিজে আযাদ হয়ে যায়।

এদিকে শাবীলের অবস্থা এই হয়েছিল যে, চোখের সামনে এক হাজার দেরহাম দেখে তার চোখ ছানাবড়া হয়ে যায়। সে মজলিস থেকে উঠে গিয়ে

সাথীদেরকে বিজয়ের ভঙ্গিতে বলে, যদিও সে প্রথম দিকে এই ধোঁকা খেয়েছিল যে, এক বুড়িকে যুবতী ভেবেছিল কিন্তু সে তার থেকে এক হাজার দেরহাম খসিয়ে ছাড়ে।

"মাত্র এক হাজার দেরহাম?" এক সঙ্গী তাকে বলে "তুমি সারাজীবন নির্বোধই থেকে গেলে। কারারামা ছিল শাহী খান্দানের মেয়ে। তুমি চাইলে এই সুযোগে আরও অনেক হাজার দেরহাম আদায় করতে পারতে।"

"তাই নাকি?" শাবীল হতাশ হয়ে বলে "আমার তো ধারণা ছিল এক হাজার দেরহামের চেয়ে অধিক মূল্য আর হয়ই না।"

তার কথা শুনে সঙ্গীরা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে তাকে আরও নিরাশ ও হতাশ করে দেয়।

হযরত খালিদ (রা.) গণীমতের মালের সাথে সমস্ত উপহারও মদীনায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। মদীনা হতে আমীরুল মু'মিনীন হযরত খালিদ (রা.) বরাবর এই বার্তা পাঠান যে, উপহারগুলো যদি গনীমতের মাল হয়ে থাকে অথবা আদায়কৃত কর হয়ে থাকে, তবে তা গ্রহণযোগ্য, আর যদি তা না হয় তবে উপহারগুলো যারা দিয়েছে তাদের থেকে তার মূল্য জেনে নিয়ে ধার্য্যকৃত করের অন্তর্গত করে নাও। যদি তোমরা কর আদায় করে ফেলে থাক, তাহলে উপহারের দামের সমপরিমাণ মূল্য তাদের ফেরৎ দিয়ে দাও।

হযরত খালিদ (রা.) উপহারদাতাদের ডেকে তাদের নায্যমূল্য পরিশোধ করে দেন। হীরা বিজয়ের কয়েক দিনের মধ্যে হযরত খালিদ (রা.) সেখানকার পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা সুবিন্যস্ত করেন এবং হীরার বর্তমান প্রশাসকদের হাতেই সকল দায়িত্বভার অর্পণ করেন। পূর্বের প্রশাসকদের তিনি স্বপদে বহাল রাখেন। সকলকে নিজ নিজ জিম্মাদারী বুঝিয়ে দেন।

✪

"আমার ভ্রাতাগণ!" হযরত খালিদ (রা.) তাঁর সালারদের উদ্দেশে বলেন "আমার হাতে এত সময় নেই যে, আমি বসে দিন কাটাব। তবে হীরার ব্যবস্থাপনা ও কার্যক্রম সুবিন্যস্ত করাও জরুরী ছিল। এক্ষেত্রে সবচেয়ে জরুরী কথা হলো, এখানকার ব্যবস্থাপনা সেভাবেই ঢেলে সাজানো, যাতে স্থানীয় এলাকাবাসীর উপকার হয়। সকল বাসিন্দা যেন এই প্রশান্তি লাভ করে এবং সকলে এই ভেবে আশ্বস্থ হয় যে, তাদের জান-মাল ও ইজ্জত-আবরু পূর্ণ

সুরক্ষিত ও নিরাপদ। আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, আমি এলাকাবাসী, খ্রিস্টান জাতি এবং অগ্নিপূজারীদের সামনে এ কথার সুস্পষ্ট প্রমাণ রাখতে চাই যে, ইসলাম এমন একটি ধর্মমত, যা জুলুম-অত্যাচারকে সর্বাপেক্ষা ঘৃণ্য মনে করে। আমি প্রতিটি প্রজাকে নিজের সন্তানের মত মনে করব। এরই প্রমাণ হিসেবে আমি অত্র এলাকার ববস্থাপনার দায়-দায়িত্ব স্থানীয় লোকদের হাতেই অর্পণ করেছি। কাবা ঘরের প্রভুর শপথ! আমি তাদের উপর নিজের নিয়ম-কানুন ও আইন চাপিয়ে দিব না।"

হযরত খালিদ (রা.)-এর এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের ফলাফল কিছু দিনের মধ্যেই প্রকাশ পায়। হীরাবাসীকে তাদের পূর্বেকার নিয়ম নীতির উপর ছেড়ে দেয়ার যে উদারতা হযরত খালিদ (রা.) প্রদর্শন করেন, তা হীরাবাসীর হৃদয় ছুঁয়ে গিয়েছিল। তারা এতে হযরত খালিদ (রা.) এবং ইসলামের প্রতি এতই প্রভাবিত হয়, যা শত আইন প্রয়োগেও সম্ভব হত না।

ইসলামের অন্যতম মৌলিক নীতি হলো, মানুষের মন জয় কর। তাদের ধোঁকা দিও না। তাদের ন্যায্য অধিকার প্রদান কর। হযরত খালিদ (রা.) ছিলেন ইসলামের ঐ প্রথম সেনানায়ক, যিনি মদীনা হতে বের হয়ে অন্য জাতির এলাকা বিজয় করে সেখানে ইসলামের উল্লিখিত মৌলিক রীতি কার্যকর করার সুযোগ পান। মিসরী ঐতিহাসিক মুহাম্মদ হুসাইন হাইকাল অনেক ঐতিহাসিকের বরাত দিয়ে লিখেন, হযরত খালিদ (রা.) শত্রুদের শিরচ্ছেদ শুরু করলে ফোরাতকে রক্তে রঞ্জিত করে দেন এবং এমন একজনকেও অক্ষত রাখেন না, যার থেকে ইসলামের প্রতি সামান্যতম হুমকির সম্ভাবনা দেখেন। হযরত খালিদ (রা.) ব্যক্তিগত শত্রুতায় বিশ্বাসী ছিলেন না। সাম্প্রদায়িক ঐতিহাসিকরা হযরত খালিদ (রা.)-কে জালিম সেনানায়ক বলেছেন। কিন্তু হযরত খালিদ (রা.) যেকোন এলাকা পদানত করে সেখানকার কর্তৃত্ব ও শাসনভার বিজিত এলাকার পূর্ববর্তী শাসকদের হাতেই অর্পণ করতেন। অবশ্য প্রধানতম প্রশাসক মুসলমানদেরই নিযুক্ত করা হত।

হীরা জয় মানেই সমগ্র পারস্যের জয় ছিল না। হযরত খালিদ (রা.) হীরা জয় করলেও পারস্যের বিস্তৃত ভূখণ্ড ছিল এখনও জয়ের বাইরে। এমনকি হীরা জয় তাকে নতুন চ্যালেঞ্জের মুখে ছুঁড়ে ফেলেছিল। সার্বক্ষণিক এই আশঙ্কা ছিল যে, অগ্নিপূজারীরা চতুর্দিক হতে তাদেরকে আক্রমণ করবে। বৃহৎ পরিসরে

আক্রমণ না করলেও গেরিলা হামলা করে মুসলিম বাহিনীকে বিব্রত ও বিপর্যস্ত করতে পারত। কিন্তু অগ্নিপূজারীরা এমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ থেকে বিরত ছিল। এর পেছনে অনেক কারণও ছিল। তবে একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হলো, বিজিত এলাকার জনগণ মুসলমানদের আচার ব্যবহারে মুগ্ধ ও অভিভূত হয়ে তাদের সহযোগী ও সাহায্যকারী হয়ে যেত।

হীরার সীমান্তবর্তী এলাকায় 'বীরনাতেফ' নামক একটি বসতি ছিল। এটা ছিল খ্রিস্টানপ্রধান এলাকা। সেখানে একটি বিরাট গীর্জা ছিল, যার পাদ্রীর নাম ছিল সালুবা বিন নাসতুনা। তিনি কেবল খ্রিস্ট ধর্মের পাদ্রীই ছিলেন না; বরং খ্রিস্টবাহিনীর সর্বাধিনায়কও ছিলেন। তিনি কোনো রণাঙ্গনে স্বশরীরে না গেলেও সামরিক বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন।

পারস্যের খ্রিস্টানরা হুংকার গর্জন করে মুসলমানদের মোকাবেলায় এসেছিল এবং মুসলমানদের তীর-তলোয়ারে মারাত্মকভাবে হতাহত হয়েছিল। পরপর কয়েক লড়াইয়ে তাদের ব্যাপক জীবনহানী হওয়ায় বর্তমানে এমন খ্রিস্টানদের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছিল, যারা ময়দানে নেমে যুদ্ধ করতে সক্ষম ছিল। শুধু বুড়োরা বেঁচে ছিল অথবা নারীরা রয়ে গিয়েছিল। সালুবা বিন নাসতুনা প্রায়ই বলতেন, "একটি ধর্মই শুধু অক্ষয় হয়ে থাকবে। আর তা হলো খ্রিস্ট ধর্ম।"

"না যরথুস্ত্র থাকবে, না মদীনার ইসলাম!" তিনি তার ওয়াজে এ কথাটি কয়েকবার বলেছিলেন "সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে; সমগ্র বিশ্বে কেবল ঈসা মসীহ -এর একক কর্তৃত্ব ও রাজত্ব থাকবে।"

হীরা বিজয় হওয়া পর্যন্ত ধারাবাহিক লড়াইয়ে হাজার-হাজার ঈসায়ী নিপাত হয়ে গিয়েছিল। বাকী যারা ছিল তারা মুসলমানদের ভয়ে পালিয়ে এদিক সেদিক আত্মগোপন করেছিল। তবে নেতৃস্থানীয় লোকেরা পাদ্রী সালুবা বিন নাসতুনার সাথে গোপনে যোগাযোগ রেখেছিল। সালুবা এই প্রচেষ্টায় ছিল যে, কিভাবে ঈসায়ীদেরকে একত্রিত করে মুসলমানদের উপর গেরিলা আক্রমণ চালানো যায়। কিন্তু ঈসায়ীদের উপর মুসলমান-ভীতি এমনভাবে চেপে বসেছিল যে, অতর্কিত আক্রমণ এবং গেরিলা হামলা করার জন্য তারা উৎসাহী হয় না।

✪

"মুকাদ্দাস পিতা!" এক রাতে শুমাইল বুরযানা নামক এক খ্রিস্টান পাদ্রী সালুবা বিন নাসতুনকে বলে "আপনি কী এই বিশ্বাস রাখেন যে, গীর্জার ঘণ্টাধ্বনি এবং আপনার ওয়াজ ঐ ধ্বংসযজ্ঞ প্রতিহত করতে পারবে, যা আমাদের দিকে দ্রুত ধেয়ে আসছে?"

"না" পাদ্রী সালুবা বলেন "আমার ওয়াজ এবং গীর্জার ঘন্টাধ্বনি বর্তমানের ধেয়ে আসা ধ্বংসস্রোত রুখতে পারবে না।"

"তবে আমাদের এই অনুমতি কেন দিচ্ছেন না যে, আমরা প্রতি রাতে মুসলিম বাহিনীতে গেরিলা হামলা চালাব?" শুমাইল বুরযানা বলে "মদীনার মুসলমানরা জ্বীন-ভূত নয়; মানুষই। আমাদের মতই মানুষ।"

"শুমাইল!" পাদ্রী সালুবা কণ্ঠে গাম্ভীর্য টেনে বলে "নিঃসন্দেহে তারা মানুষ। কিন্তু তোমাদের মত নয়। আমি তাদের মাঝে অন্য কিছু দেখেছি। তারা বিজয়ের সংকল্প করে এসেছে। দেহগত বিষয়ে যদি এটাই হয় তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত, তবে মনে রেখ পরিশেষে বিজয় তাদেরই হবে।"

"মুকাদ্দাস পিতা!" শুমাইল বলে "দেহগত বিষয়টি বুঝলাম না।"

"বুঝার চেষ্টা কর" পাদ্রী সালুবা বলে "কিসরা উর্দ্ধশের যাদেরকে আরবের বুদ্দু বলে, তারা দৈহিক আরাম-আয়েশ এবং স্বাদ-মজা কিছুকেই পাত্তা দেয় না।"

"মুকাদ্দাস পিতার মুখে শত্রুর প্রশংসা মানায় না" শুমাইল বলে।

"যদি তোমরা নিজেদের মধ্যে শত্রুপক্ষের গুণাবলী সৃষ্টি করতে পার, তাহলে তোমরা পরাজয়ের কবল থেকে রক্ষা পাবে" পাদ্রী সালুবা বলে। "তোমাদের বন্ধুরা মুসলমানদেরকে ফাঁদে ফেলতে পনেরটি বালিকা তাদের মাঝে পাঠিয়ে ছিল না? তোমরা কি মনে কর যে, যা কিছু তোমরা কর তা আমার অজানা? তোমাদের তলোয়ারের ধার ভোঁতা হয়ে গেছে। এই জন্য তোমরা নারীদের ব্যবহার করেছ। তোমরা এটা অস্বীকার করতে পারবে?"

"না মুকাদ্দাস পিতা!" শুমাইল লজ্জিত কণ্ঠে বলে "আমাদের এক ধর্মগুরু বলেছিল, একটি তলোয়ার একটি কোপে একজন মানুষকে কাটে। কিন্তু একটি সুন্দরী নারীর এক কোপ একশ মানুষকে ঘায়েল করে।

মুসলিম সেনারা তাদের ঘোড়াকে পানি পান করাতে ঝিলের ধারে আনত। তারা চারজন, ছয়জন করে দলবদ্ধ হয়ে আসত। ঝিলের আশেপাশে উচুঁ প্রান্তর এবং ঘন জঙ্গল ছিল। আমাদের প্রশিক্ষিত বালিকারা মুসলিম অশ্বারোহীদেরকে নিজেদের দিকে আকর্ষিত করতে যারপরনাই চেষ্টা করে। কিন্তু মেয়েদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়। নারীদের ছলনা-চাতুরী তাদের মাঝে কোনো প্রভাব ফেলতে পারে না। আমাদের কয়েকটি মেয়ে তো শেষমেষ নগ্ন হয়ে তাদের পাহাড়ের

পাদদেশে, ঘন জঙ্গলে আসতে ইশারায় আহ্বান জানায়। কিন্তু ফল হয় উল্টো। তারা আকর্ষিত তো হয়ই না; উপরন্তু তাদের দিকে তাকানোও বন্ধ করে দেয় এবং তাদের অশ্লীলতা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে।"

"আমার এটাও জানা আছে শুমাইল।" পাদ্রী সালুবা বলে "তোমরা মুসলিম বাহিনীর প্রহরারত সান্ত্রীদেরকেও ফুসলানোর জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছিলে। তোমরা এটাও পরিকল্পনায় রেখেছিলে যে, মুসলিম সালারগণ এবং সেনানায়ক হযরত খালিদ (রা.)-কে হত্যা করার জন্য নারীদের ব্যবহার করা হবে।"

"হাঁ, মুকাদ্দাস পিতা!" শুমাইল বলে "আমাদের পরিকল্পনা এমনই ছিল।"

"তাহলে ঐ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলো না কেন?"

"এই কারণে যে, যে বাহিনীর সিপাহীদের চরিত্র এত উন্নত, তাদের সর্বাধিনায়ক তো তাহলে ফেরেশতার মত হবেন" শুমাইল জবাবে বলে "বর্তমানে আমাদের সামনে পথ একটিই, আর তা হলো, মুসলিম বাহিনীর উপর গেরিলা হামলা করতে থাকা এবং এ প্রক্রিয়ায় তাদের এত বেশি ক্ষতি ও বিপর্যস্ত করা যে, তারা অবশেষে পাততাড়ি গুটাতে বাধ্য হবে।"

"তবে কি তোমরা কিসরার বাহিনী থেকেও বেশি শক্তিশালী?" পাদ্রী সালুবা জানতে চান।

"একদিন যারা দম্ভ করে বলত, পৃথিবীর মধ্যে এমন কোনো শক্তি নেই, যারা তাদের মোকাবেলায় সামনে এসে দাঁড়াবার দুঃসাহস দেখাতে পারে, তারা আজ কোথায়? অগ্নিপূজারীদের সমস্ত নামী-দামী সেনাপতিরা মুসলমানদের হাতে ধরাশায়ী হয়েছে। আমরা তাদের খাতিরে মুসলমানদের সাথে লড়াই করে ভুল করেছি।"

"তবে কি মুকাদ্দাস পিতা আপনি এটাই বলতে চান যে, আমরা যেন মুসলমানদের সঙ্গে শত্রুতা না রাখি?" শুমাইল বিষণ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে।

"হাঁ!" পাদ্রী সালুবা জবাবে বলেন "আমি এটাই বলতে চাই; এরপরে বরং আমি একধাপ আগে বেড়ে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে ইচ্ছুক।"

"মুকাদ্দাস পিতা!" শুমাইল ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলে "হয়ত এরপরে আপনি বলবেন, আমি মুসলমানদের ধর্মমতও মেনে নিতে চাই।"

"না; এমনটি হবে না" পাদ্রী সালুবা বলে "যখন থেকে হীরা মুসলমানদের কব্জায় চলে এসেছে, তখন থেকে আমি বিষয়টি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছি যে,

তাদের দ্বারা আমাদের ধর্মের কোনো ক্ষতির আশঙ্কা আছে কিনা। আমি দেখেছি তাদের দ্বারা খ্রিস্টধর্ম আক্রান্ত হচ্ছে না। মুসলমানরা স্বীয় ধর্মমত গ্রহণের আহ্বান জানায় ঠিকই কিন্তু স্বীয় ধর্মমত বিজিত জনগণের উপর জোরপূর্বক চাপিয়ে দেয় না। ... তাদের কি এই খবর আছে যে, এখানে একটি গীর্জা আছে, যার মধ্যে আমার মত প্রখ্যাত এবং ধর্মপ্রাণ পাদ্রী বিদ্যমান? ... তাদের ভালভাবেই জানা আছে শুমাইল! আমি পরপর দুই রবিবারে গীর্জায় আগত লোকদের ভীড়ে দুইজন অপরিচিত মুখ দেখেছি। আমি তাদের গলায় ক্রুশ ঝুলানো দেখেছি। সব দিক দিয়ে তারা ছিল পূর্ণ ঈসায়ী। কিন্তু আমার দূরদর্শী চোখ তারা ফাঁকি দিতে পারেনি। আমার চোখে তাদের ছদ্মবেশ ঠিকই ধরা পড়েছে। তারা ছিল মুসলমান। তবে মদীনার নয়; পারস্যের। ওলীদ পুত্র খালিদের গুপ্তচর ছিল তারা। তাদের উপস্থিতি টের পেয়ে আমি ওয়াজে সতর্কতা অবলম্বন করেছিলাম।"

"মুকাদ্দাস পিতা!" শুমাইল বলে "আপনি একটু ইশারা দিলেই তারা জান নিয়ে ফিরে যেতে পারত না।"

"তারপর এই গীর্জার প্রত্যেকটি ইট খুলে ফেলা হত" পাদ্রী সালুবা বলেন "বিবেক এবং আবেগের মধ্যে পার্থক্য এখানেই শুমাইল! তুমি আবেগের বশবর্তী কিন্তু আমি বিবেক খাটিয়ে কাজ করছি। ... আমি তোমাদের মুসলমানদের উপর গেরিলা হামলা করার জন্য কিছুতেই অনুমতি দিব না।"

✪

দু'তিন দিন পর সকল ঈসায়ী নেতাদের উদ্দেশে পাদ্রী সালুবা বিন নাসতুনা তার গীর্জায় বলছিলেন ... "বাস্তবতা সামনে রাখুন। কিসরার বিশাল বাহিনী মদীনার স্বল্প সংখ্যক সৈন্যের মোকাবেলায় দাঁড়াতে পারেনি। আপনারাও মুসলমানদের মোকাবেলা করেছেন। এখন আবার তাদের সাথে লড়তে গেলে নিজেদের চূড়ান্ত ধ্বংস ছাড়া আপনারা আর কিছুই করতে পারবেন না। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলুন। মুসলমানরা আপনাদের ধর্মের জন্য কোনো অন্তরায় কিংবা শংকা সৃষ্টি করেনি। তারা আমাদেরকে এবং অগ্নিপূজারীদেরকে নিজ নিজ ইবাদতস্থলে ইবাদত করার অনুমতি প্রদান করেছেন। মুসলমানরা ন্যায় ও ইনসাফের ক্ষেত্রে যে সাম্য প্রতিষ্ঠা করেছে, তা আপনারা স্বচক্ষে দর্শন করেছেন।" ...

"এর বিপরীতে আপনারা এ চিত্রও দেখেছেন যে, আপনারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে অগ্নিপূজারীদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু মুসলমানরা তার জন্য আপনাদের বিরুদ্ধে কোনো এ্যকশানে যায়নি। তারা আপনাদের ক্ষেত-খামার দখল করেনি। আপনাদের ফল-ফসলে নিজেদের উট-ঘোড়া ছেড়ে দেয়নি। বরং অগ্নিপূজক শাসকেরা গরীব কৃষক-চাষীদের উপর যে জুলুম-নির্যাতন করত এবং তাদের কষ্টার্জিত ফসল কেটে নিয়ে যেত- এই অন্যায় অবিচার দূর হয়েছে। এই বাস্তবতা অস্বীকার করো না যে, মুসলমানরা জনগণের সমস্ত অধিকার পূর্ণমাত্রায় আদায় করেছে।"

"আপনার প্রতি ঈসা মসীহ-এর রহমত হোক?" এক সর্দার পাদ্রী সালুবার কথার রেশ ধরে বলে "তবে কী আপনি আমাদেরকে এ বিষয়ে অনুপ্রাণিত করছেন যে, যেন আমরা মুসলমানদের আনুগত্য মেনে নিই?"

"এটা কি আমাদের জন্য বেইজ্জতী নয়?" আরেক সর্দার মাঝখান দিয়ে বলে।

"মুসলমানরা আপনাদের ইজ্জতের প্রতি চোখ তুলেও তাকায়নি" পাদ্রী সালুবা বলে। "আপনারা তাদের পথচ্যুত এবং ফুসলানোর জন্য নিজেদের নারীদের পাঠিয়েছিলেন। তারা কি আপনাদের মেয়েদের তুলে নিয়ে যেতে পারত না?... আর এ কথাও ভুলবেন না যে, কিসরার শাসকেরা আপনাদের কত মেয়েকে জোরপূর্বক বিবাহ করেছে। যার চোখে যে মেয়েটি ভাল লেগেছে সে তাকে জোর করে তুলে নিয়ে গেছে। ... সাথে সাথে এ কথাও ভাবুন, পারস্যের সেসব কমান্ডার ও সেনাপতিরা আজ কোথায়, যাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আপনারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। তারা কি এখন আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করে যে, আপনারা কেমন আছেন? তারা কি একদিনের জন্য এসে দেখেছে যে, আপনাদের যারা মারা গেছে তাদের স্ত্রীরা কেমন আছে? তাদের সন্তানরা কেমন আছে? মুসলমানরা তো এ কারণে আপনাদের বাড়তি শাস্তি দিচ্ছে না।

"নিঃসন্দেহে তারা আমাদের ভুলে গেছে" এক বৃদ্ধ সর্দার বলে।

"আপনি ঠিকই বলেছেন মুকাদ্দাস পিতা!" আরেক সর্দার বলে "এখন বলুন আমাদের কী করা উচিত। আপনি আমাদেরকে কোন পথে নিয়ে যেতে চান।"

"আমার দেখানো পথ আপনাদের জন্য কল্যাণকর হবে" পাদ্রী সালুবা বলে। "এতে আপনাদের জান-মালের নিরাপত্তা এবং আপনাদের ধর্মের স্বার্থ নিহিত। ... আমি মুসলমানদের আনুগত্য মেনে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং বানকিয়া ও লাসবুমার পুরো এলাকার চাষাবাদযোগ্য জমির ফসল উসূল করে মুসলমানদের প্রদান করব।"

✪

প্রায় সকল ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, মুসলমানদের অমায়িক আচরণ, ন্যায়-ইনসাফ এবং শাসন-পদ্ধতি দেখে প্রভাবিত হয়ে বীরনাতেফের পাদ্রী সালুবা বিন নাসতুনা সর্বাগ্রে হযরত খালিদ (রা.)-এর সামনে তাঁর আনুগত্য মেনে নেন এবং দশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা তাঁকে প্রদান করেন। এই অর্থের সঙ্গে ঐসব মূল্যবান মনি-মানিক্যও ছিল, যা কিসরা উর্দূশের পাদ্রী সালুবাকে হাদীয়াস্বরূপ প্রদান করেছিল। এই মোতিগুলো মূলত ঘুষ ছিল, যা উরদূশের ঈসায়ীদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করানোর জন্য পাদ্রী সালুবাকে দিয়েছিল। হযরত খালিদ (রা.)-এর নির্দেশে একটি চুক্তিনামা লেখা হয়।

"এই চুক্তিটি মদীনার সেনাপতি হযরত খালিদ (রা.) এবং সালুবা বিন নাসতুনার কওমের মধ্যে সম্পাদিত হচ্ছে। এই চুক্তি মোতাবেক সালুবা বিন নাসতুনা ঈসায়ী কওমের পক্ষ হতে বার্ষিক দশ হাজার দীনার কর হিসেবে আদায় করবেন। আর কিসরার হীরা-মোতি উল্লেখিত কর ব্যতীতই আদায়যোগ্য। কর পরিমাণ অর্থ কেবল ঐ সকল ঈসায়ীদের থেকে প্রতিবছর আদায় করা হবে, যারা তা দেয়ার সঙ্গতি ও সামর্থ্য রাখে। আর তারা হতে হবে উপার্জনকারী। প্রত্যেককে ঠিক ততটুকু কর দিতে হবে, যতটুকু সে সহজে দিতে পারে। এই চুক্তির আলোকে মুসলমানদের দায়িত্ব এই বর্তায় যে, তারা ঈসায়ী অধ্যুষিত এলাকা বানকিয়া এবং লাসবুমার সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। ঈসায়ী কওমের প্রতিনিধি বিবেচিত হবেন পাদ্রী সালুবা বিন নাসতুনা। তিনি তার জাতির কাছে পূর্ব হতেই নেতা হিসেবে বিবেচিত। হযরত খালিদ (রা.) কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তির প্রতি সমস্ত মুসলমানের সমর্থন রয়েছে। এখন থেকে চুক্তি কার্যকর হবে।"

পাদ্রী সালুবা অত্র এলাকার অবিসংবাদিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। আশেপাশের বড় বড় নেতা এবং উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গ যখন দেখে যে, পাদ্রী সালুবা হযরত খালিদ

(রা.)-এর আনুগত্য মেনে নিয়েছে, তখন এক এক করে তারাও হীরায় আসে এবং হযরত খালিদ (রা.)-এর আনুগত্য স্বীকার করতে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় ২০ লাখ দেরহাম নগদ উসূল হয়। মুসলমানদের বীরত্বগাঁথা দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। বিস্তৃত অঞ্চল মুসলমানদের কর্তৃত্বে চলে এসেছিল। হযরত খালিদ (রা.) কালক্ষেপণ না করেই অনুগত এলাকায় ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। স্থানীয় নেতৃবৃন্দের মধ্য হতে কাউকে নির্বাচিত করে প্রশাসক নিযুক্ত করেন। পাশাপাশি তার সেনাবাহিনীর কয়েকটি গ্রুপকে এই উদ্দেশ্যে বিজিত এলাকায় ছড়িয়ে রাখেন, যেন কোথাও হতে বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে না উঠতে পারে।

বিদ্রোহ দমনের বাহিনীটি ছিল অশ্বারোহী এবং দ্রুতগতিসম্পন্ন। তাদের নেতৃত্বে ছিল দুর্ধর্ষ ও জানবায তিন সালার-যিরার বিন আযদুর, কা'কা' এবং মুসান্না বিন হারেছা। এই তিন সালারের গতি ও হাবভাব এমন আক্রমণাত্মক ছিল যে, যেদিকেই তারা যেতেন, তাদের সামনে সবাই নতজানু হয়ে যেত এবং সে এলাকার সর্দাররা এসে আনুগত্য ঘোষণা করত। এই প্রক্রিয়ায় ৬৩৩ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে (১২ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে) দজলা এবং ফোরাতের মধ্যবর্তী সমগ্র এলাকা ইসলামী সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হয়ে গিয়েছিল।

✪

রাজসিংহাসন ও মুকুটের কাঙ্গালরা স্বীয় জাতির ইতিহাসকে কালো বানিয়ে নিজ নিজ রাজ্যকে প্রতিপক্ষের হাতে তুলে দেয়। পারস্য সাম্রাজ্য, যাকে অজেয় মনে করা হত এবং এবং যাদের প্রতিটি সেনা ছিল বর্মাচ্ছাদিত, এখন সে সাম্রাজ্যের অস্ত যাওয়ার উপক্রম। মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা পারস্য বাহিনীর মোকাবেলায় কিছুই ছিল না। তারা বর্মাচ্ছাদিতও ছিল না। অগ্নিপূজারী সৈন্যদের মত তত অস্ত্র-শস্ত্রও ছিল না, কিন্তু তারপরও একের পর এক তারা পরাজিত হচ্ছিল। এভাবে প্রতি রণাঙ্গনে তারা পরাজিত হওয়ায় রাজধানী মাদায়েন ঝুঁকির মুখে এসে পড়ে। কিসরা উরদূশের বর্তমানে সম্রাট ছিলেন না। একের পর এক পরাজয়ের খবরের আঘাতে তিনি শোকে-দুঃখে মুহ্যমান অবস্থায় মারা যান।

ইতিহাস সাক্ষী; কুরআনের নির্দেশনা হলো, আল্লাহ যে জাতিকে তাদের জুলুম- অবিচারের শাস্তি দিতে চান, তখন অযোগ্য এবং স্বৈরাচারী শাসক তাদের উপর চাপিয়ে দেন। আল্লাহর এই গজব অগ্নিপূজারীদের উপর পতিত হওয়া অনেক আগেই শুরু হয়েছিল। উরদূশেরের মৃত্যুর পর মাদায়েনে রাজ পরিবারে ক্ষমতা দখলের যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিল।

হযরত খালিদ (রা.)-এর গুপ্তচর শুধু মাদায়েনেই নয়; কিসরার রাজ মহলেও পৌঁছে গিয়েছিল। তারা সেখান থেকে যে তথ্য প্রেরণ করছিল, তা হযরত খালিদ (রা.)-এর জন্য অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক ছিল।

"মাদায়েনের সিংহাসন এখন ঐ তক্তায় পরিণত হয়েছে, যার উপর মৃতকে গোসল দেয়া হয়।" জনৈক গুপ্তচর মাদায়েন থেকে ফিরে হযরত খালিদ (রা.)-কে এ রিপোর্ট দেয় "এই সিংহাসন ইতোমধ্যে তিন শাহজাদার প্রাণ সংহার করেছে। উরদূশেরের স্ত্রী অনেক। প্রত্যেক স্ত্রীর যুবক পুত্র ছিল। প্রত্যেক স্ত্রীর কামনা ছিল তার সন্তানের মাথায় কিসরার রাজমুকুট শোভা পাক। উরদূশেরের মৃত্যুর পর এক শাহজাদাকে সিংহাসনে বসানো হয়। দু'দিন পর তাকে স্বীয় কামরায় এমন অবস্থায় মৃত পাওয়া যায় যে, তার মাথা ধড় থেকে আলাদা ছিল। এর শাস্তিস্বরূপ দু'টি সুন্দরী যুবতী, দারোয়ান এবং দুই প্রহরীকে জল্লাদের হাতে তুলে দেয়া হয়। শাহজাদা হত্যার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে তাদের হত্যা করা হয়।"

"প্রথম শাহজাদার মৃত্যুর পর তার স্থলে সম্রাট উরদূশেরের আরেক বিধবা স্ত্রীর পুত্রকে সম্রাট বানিয়ে তার মাথায় কিসরার মুকুট পরানো হয়। তৃতীয় দিন সে শরাব পান করে অচেতন হয়ে যায় এবং এর কিছুক্ষণ পর মারা যায়। এবার ৭/৮ জন লোক এবং ৩ তিনটি মেয়েকে শাহজাদাকে বিষাক্ত মদ পান করানোর অভিযোগে হত্যা করা হয়।"

"দ্বিতীয় শাহজাদার মৃত্যুর পর তৃতীয় শাহজাদা সিংহাসনে বসে। দ্বিতীয় দিন শাহজাদা মহলের বাগিচায় নর্তকীদের নাচের এক জমকালো অনুষ্ঠানে পায়চারি করছিল। ইত্যবসরে একদিক থেকে হঠাৎ কয়েকটি তীর ছুটে আসে। একটি তীর শাহজাদার চোখে আর আরেকটি তার শাহরগে গিয়ে আমূল বিদ্ধ হয়। ফলে তৃতীয়বারের মত রাজসিংহাসন শূন্য হয়ে যায়।" ...

"মহান সেনাপতি, সিংহাসন এখন পর্যন্ত শূন্য। কিসরার মন্ত্রীবর্গ এবং দুই সেনাপতি রাজ-মুকুট শিরে ধারণের পন্থা পরিহার করেছে। তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যে সমস্ত এলাকা পারস্য সাম্রাজ্যর অধীনে রয়ে গেছে, তা আগে মুসলমানদের হাত থেকে বাঁচাতে হবে। তারা দজলার উপকূলে স্বীয় বাহিনীকে এমনভাবে ছড়িয়ে দিয়েছে, আমরা যেদিক থেকেই অগ্রসর হই না কেন, আমাদের প্রতিহত করা হবে।"

"পারস্য বাহিনীর সদস্য সংখ্যা কত হবে?" হযরত খালিদ (রা.) জিজ্ঞাসা করেন।

"আমাদের চেয়ে দ্বিগুণ হবে" গুপ্তচর জবাবে বলে। "এর থেকেও বেশি হবে কিন্তু কম নয়। মাদায়েন দজলা নদীর ওপারে। অগ্নিপূজারীরা আমাদেরকে নদী পার হতে দিবে না।"

"আল্লাহর দরিয়া আল্লাহর মুজাহিদদের পথে অন্তরায় হতে পারে না" হযরত খালিদ (রা.) বলেন "অগ্নিপূজারীরা আমাদের বাধা দেয়ার সাধ্য রাখে না। যে জাতির নেতৃস্থানীয় লোকদের মাঝে বিরোধ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, সে জাতির কপালে ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই থাকে না।"

✪

"আমরা মাদায়েন অভিমুখে রওনা করতে যাচ্ছি" হযরত খালিদ (রা.) তাঁর সালারদের বলেন। "আমরা শত্রুদের সামলানোর সুযোগ দিব না।" হযরত খালিদ (রা.) সালারদের বিভিন্ন রণনীতি সম্পর্কে অবহিত করছিলেন ইতোমধ্যে তাকে জানানো হয় যে, মদীনা হতে খলীফার দূত এসেছে। হযরত খালিদ (রা.) তৎক্ষণাৎ দূতকে ভেতরে তলব করেন।

"মদীনাবাসী কি আমাদের কথা সুনামের সাথে স্মরণ করে?" হযরত খালিদ (রা.) দূতকে জিজ্ঞাসা করেন।

"খোদার কসম! মদীনার আকাশ-বাতাসও আপনাদের স্মরণ করে" দূত বলে। "আমীরুল মু'মিনীন মদীনার মসজিদে আপনার কথা আলোচনা করেন। খলীফা ইতোমধ্যে কয়েকবার এ কথা বলেছেন যে, মায়েরা কি খালিদের মত আরেকটি সন্তান জন্ম দিতে পারবে? জনতা প্রত্যহ আপনার সংবাদ লাভের আশায় অপেক্ষমাণ থাকে।"

"এবারের বার্তা কী?" হযরত খালিদ (রা.) জিজ্ঞাসা করেন।

দূত লিখিত বার্তাটি হযরত খালিদ (রা.)-এর হাতে তুলে দেন। তিনি পত্রটি পাঠ করছিলেন আর তাঁর চেহারার প্রতিক্রিয়া পরিবর্তিত হচ্ছিল। উপস্থিত সালারগণ বার্তাটি শোনার জন্য অধীর ও অস্থির হয়ে ওঠেন।

"আমীরুল মু'মিনীন ছাড়া আমাকে ঠেকানোর সাধ্য আর কারো ছিল না" হযরত খালিদ (রা.) পত্র পাঠ শেষে প্রথমে এই মন্তব্য করেন এরপর উপস্থিত সালারদের সম্বোধন করে বলেন "আমীরুল মু'মিনীন নির্দেশ পাঠিয়েছেন যে,

আয়াজ বিন গনাম দাওমাতুল যান্দালে যুদ্ধ করছেন। আল্লাহ তাকে বিজয় দান করুন। তিনি সেখানকার যুদ্ধপর্ব শেষ করে আমাদের সঙ্গে এসে মিলিত হবেন। আমীরুল মু'মিনীন বলেছেন, আয়াজ সৈন্য সামন্তসহ আমাদের সাথে এসে মিলিত হওয়ার পর যেন আমরা সম্মিলিতভাবে অগ্রসর হই এবং তার এসে পৌঁছানোর পূর্বে আমরা যেখানে আছি সেখানেই যেন অবস্থান করি।

✪

হযরত খালিদ (রা.)-এর চেহারায় যে দ্বীপ্তি আভা এবং চোখে বিজয় ও সাহায্যের যে ঝিলিক সর্বদা লেগে থাকত, তা নিভে যায় এবং তিনি গভীর চিন্তায় ডুবে যান। সালারদের চলতি অধিবেশনে পিনপতন নিরবতা বিরাজ করে। এর কারণ এই ছিল না যে, আমীরুল মু'মিনীন অগ্রযাত্রা রুখে দিয়েছেন; বরং উদ্বেগের কারণ এই ছিল যে, হযরত খালিদ (রা.)-এর চেহারায় মাঝে মধ্যে এই ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা যেত, যা তুফানের মত বিপদ ডেকে আনত। কোনো সালারের এই দুঃসাহস ছিল না যে, কেউ আমীরুল মু'মিনীনের খেলাফ একটি কথাও বলবে।

কিছুক্ষণ পর হযরত খালিদ (রা.) চিন্তার জগৎ থেকে ফিরে আসেন এবং দূতের দিকে তাকান।

"তোমার সফর শুভ ও নিরাপদ হোক" হযরত খালিদ (রা.) বলেন। "চাইলে কয়েক দিন আরাম করতে পার, তা না হলে ফিরতি সফরের জন্য প্রস্তুত হও। ... আমীরুল মু'মিনীনকে আমার ও সাথীগণের সালাম দিবে। এরপর বলবে, যুদ্ধের সার্বিক অবস্থা সে-ই সবচেয়ে ভাল অবহিত থাকে, যে প্রত্যক্ষ ময়দানে থাকে। রণাঙ্গন হতে দূরে থেকে কোনো সিদ্ধান্ত নিলে অনেক সময় তা যোদ্ধাদের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে। ...

আরও বলবে, ওলীদের পুত্র খেলাফতের নির্দেশ অমান্য করার দুঃসাহস করবে না। কিন্তু যদি পরিস্থিতি আমাকে বাধ্য করে এবং ইসলাম ঝুঁকির মুখে পড়ে তাহলে তখন আমি নির্দেশের অপেক্ষা করব না। আমি মদীনার খেলাফতের একান্ত অনুগত এবং ইসলামের সৈনিক। আমি দুশমনকে আক্রমণ করতে দেখলে তখন ব্যক্তিবিশেষের নির্দেশ আপাতত স্থগিত রাখব। আমি আল্লাহর সন্তোষের ভিখারী; কোনো ব্যক্তিবিশেষের সন্তুষ্টি আমার লক্ষ্য নয়। আমি জেনে নিব, সালার আয়াজের রণাঙ্গনের বাস্তব অবস্থা কী? এমনও হতে পারে যে, তাঁর

নিজেরই সাহায্যের প্রয়োজন হবে। আবার এ সম্ভাবনাও আছে যে, রণাঙ্গন থেকে দ্রুত ফেরা তার পক্ষে সম্ভব হবে না আর এদিকে এই সুযোগে অগ্নিপূজারীরা নিজেদের সামলে নিয়ে প্রবল প্রতাপে ময়দানে আসার উপযুক্ত হয়ে যাবে।...

আর খলীফাতুল মুসলিমীনকে বলবে, আমরা যরথুস্ত্রের আগুন নিভিয়ে দিয়েছি। আল্লাহপাক আমাদের এমন বিজয় দান করেছেন, যা কিসরার মহলকে শয়তানের বেডরুমে পরিণত করেছে। উরদূশেরের সিংহাসনে যে-ই আরোহণ করছে দু'দিন পর সে অপর শাহজাদাদের দ্বারা নিহত হয়ে যায়। পারস্যের শাহানশাহী এবং তার শান-শওকত আমরা দজলা ও ফোরাত নদীতে ডুবিয়ে দিয়েছি। যে হীরা এলাকা পারস্যদের কাছে মানিক্য হীরার মত ছিল, তা বর্তমানে আমাদের সেনানিবাস। আমাদের জন্য আপনারা দোয়া করতে থাকুন।"

দূত বিদায় নিয়ে গেলে হযরত খালিদ (রা.) একজন কমান্ডারকে তলব করে বলেন, তোমার সঙ্গে অত্যন্ত দ্রুতগতির ও স্বাস্থ্যবান সিপাহী নিয়ে খুবই দ্রুতবেগে দাওমাতুল যান্দাল যাও এবং সেখানে গিয়ে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবগত হবে। তুমি জানার চেষ্টা করবে যে, সালার আয়াজ বিন গনামের যুদ্ধ শেষ করতে কতদিন লাগতে পারে এবং তার পক্ষে অল্প সময়ে যুদ্ধ শেষ করার অবকাশ আছে কিনা।

কমান্ডার তৎক্ষণাৎ রওনা হয়ে যায়।

"খলীফাতুল মুসলিমীনের যে নির্দেশ তোমরা শুনেছ, তা মাথা থেকে মুছে ফেল" হযরত খালিদ (রা.) তার অপেক্ষমাণ সালারদের বলেন "অন্তরে মদীনার প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধাবোধ রাখার পাশাপাশি ঐ অবস্থাও দেখো, যা আমরা অগ্নিপূজারীদের জন্য সৃষ্টি করেছি। আমরা এখানে আয়াজের অপেক্ষায় বসে থাকলে কিসরার বাহিনী অতীত সামলে নেয়ার মওকা পেয়ে যাবে। আল্লাহর কসম, তোমরা অবশ্যই নিশ্চয়তার সাথে বলতে পার যে, কিসরা বাহিনীর উপর তোমরা যে ত্রাস সৃষ্টি করেছ, তা তাদেরকে কোনো রণাঙ্গনে তোমাদের সামনে দাঁড়াতে দিবে না। মাদায়েনের শাহী মহলে সিংহাসনকে কেন্দ্র করে যে গুপ্তহত্যা ও অপমৃত্যুর সিলসিলা চলছে তা আমাদের পক্ষে যাচ্ছে। কওমের নেতারা যখন রাজ্য ও সিংহাসনমুখী হয়ে যায়, তখন সৈন্যরা দুর্বল হাতের তলোয়ারের মত হয়ে যায়।"

"হাঁ ইবনে ওলীদ!" সালার আসেম বিন আমর বলেন "কিসরার যেসব সালার পারস্যের অবশিষ্ট এলাকায় নিজেদের সৈন্য ছড়িয়ে দিয়েছে, তারাও সিংহাসনপ্রার্থী।

তারা আমাদের উপর বিজয় লাভ করে পারস্যের গদি দখল করতে চায়।"

"বাস্তবতা এমনটি হলে তারা শীঘ্রই ধ্বংস হয়ে যাবে" সালার আদী বিন হাতেম বলেন। "সালারদের মাথায় যখন রাজমুকুট ও সিংহাসনের চিন্তা চেপে বসে, তখন এই চেতনা তাদের রাজ্য ও জাতির ভরাডুবি তরান্বিত করে।"

"যখন সিংহাসন রক্ষা ও ব্যক্তিস্বার্থের উপর চিন্তা নিবদ্ধ হয়ে যায়, তখন শত্রুর দিক হতে দৃষ্টি ঘুরে যায়" হযরত খালিদ (রা.) বলেন। "আমি শত্রুর এই সকল দুর্বলতা পুরোপুরি কাজে লাগাব। সৈন্যদের প্রস্তুত রাখ। দাওমাতুল যান্দালের রিপোর্টকে সামনে রেখে আমরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিব।"

✪

দাওমাতুল যান্দালের অবস্থা সালার আয়াজ বিন গনামের জন্য হুমকিস্বরূপ ছিল। দাওমাতুল যান্দাল ছিল তৎকালীন যুগের বিখ্যাত বাণিজ্য কেন্দ্র। আজকের ইরাক এবং সিরিয়ার হাইওয়ে এখানে এসে মিলিত হয়েছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুক আক্রমণকালে হযরত খালিদ (রা.) দাওমাতুল যান্দালে এসেছিলেন এবং সেখানকার কেল্লাপতি উকাইদার বিন মালিককে গ্রেফতার করে নবীজীর সকাশে পেশ করেন।

উকাইদার বিন মালিক ইসলাম গ্রহণ না করলেও নবীজীর আনুগত্য মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু নবীজীর ইন্তেকালের পর ধর্মান্তরের বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে উকাইদারও নিজেকে অধীনতা মুক্ত ঘোষণা করে। সে ঈসায়ী এবং মূর্তিপূজারীদের দলে ভিড়িয়ে নিজে তাদের নেতা হয়ে যায়। হযরত আবু বকর (রা.) উকাইদারের রাজাগিরি খতম এবং অমুসলিম গোত্রগুলোকে তার নেতৃত্ব হতে দূরে সরাতে সালার আয়াজ বিন গনামকে তথায় প্রেরণ করেছিলেন।

আয়াজ ছিলেন অভিজ্ঞ সালার। কিন্তু তিনি দাওমাতুল যান্দালে গিয়ে দেখেন যে, এক বিরাট সংখ্যক ঈসায়ী প্রতিরোধ যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। ঈসায়ীদের এই গোত্রটি ছিল বড়ই যুদ্ধবাজ। আয়াজ সেখানে পৌঁছে কেল্লা অবরোধ করে রাখেন। কিন্তু ঈসায়ীরা পেছন হতে মুজাহিদ বাহিনীকে ঘিরে ফেলে। ফলে আয়াজ বাহিনীকে সামনে পেছনে উভয় দিকে লড়তে হয়। এই পরিস্থিতি যুদ্ধকে এত দীর্ঘায়িত করে যে, তা সহসা শেষ হবার কোনো লক্ষণ ছিল না। উপরন্তু তিনি উভয় দিক দিয়ে শত্রুর বেষ্টনীতে পড়ায় জয়ের পরিবর্তে পরাজয়ের আশঙ্কাই ছিল বেশি।

✪

হযরত খালিদ (রা.) প্রেরিত কমান্ডার ফিরে এসে হযরত খালিদ (রা.) কে বলেন যে, আয়াজ বিন গনামের আসার কোনোই সম্ভাবনা নেই; বরং এই মুহূর্তে তাঁরই সাহায্যের দরকার বেশি। এরপর কমাণ্ডার বিস্তারিত ভাবে হযরত খালিদ (রা.)-কে দাওমাতুল যান্দাল রণাঙ্গনের চিত্র এবং উভয় পক্ষের সৈন্যের পজিশনের বিবরণ দেন।

"খোদার কসম! আমি এখানে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারি না" হযরত খালিদ (রা.) জোশালো কণ্ঠে বলেন। "শত্রু আসার আগেই আমি তাদের সামনে গিয়ে হাজির হব। মাদায়েনের কেল্লা আমাকে ডেকে ফিরছে।... যাত্রার আয়োজন কর।"

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক তবারী এবং বালাজুরি লিখেন, হযরত খালিদ (রা.) এর একগুয়েমীর কথা প্রসিদ্ধ ছিল। বসে বসে অলসতা করার মত সেনাপতি তিনি ছিলেন না। শত্রুপক্ষ চার চারবার মার খেয়েছে, তাদের ভাবমূর্তি ও গর্ব ধূলায় ধূসরিত হয়েছে, রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থাপনা তছনছ হয়ে গেছে এবং মাদায়েনের শাহী মহলে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়েছে। এই সব অবস্থায় হযরত খালিদ (রা.) চুপচাপ বসে থাকতে পারছিলেন না।

হযরত খালিদ (রা.)-এর গোয়েন্দা ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত চৌকস এবং গতিময় ছিল। প্রত্যেক গুপ্তচর ছিল খুবই সাহসী, চৌকস ও সতর্ক। তাদের বেশিরভাগ সদস্য ছিল সেসব মুসলমান, যারা পারস্যে গোলামের মত জীবনযাপন করছিল। এ বাহিনীর প্রতিটি সদস্য ছিল নিজ নিজ এলাকা সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত। বিভিন্ন কবিলার ভাষা তারা বুঝত এবং বলতে পারত। তদুপরি ছদ্মবেশ ধরতে তারা ছিল বড়ই পারঙ্গম। তারা মাদায়েনের শাহীমহলে ঢুকে অত্যন্ত স্পর্শকাতর সংবাদ নিয়ে এসেছিল। তারা হযরত খালিদ (রা.)-কে পারসিক বাহিনীর অবস্থান ও তাদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করতে থাকে।

গুপ্তচরদের তথ্যমতে ইরানী সৈন্যদের বেশিরভাগই দু'টি শহরে অবস্থানরত ছিল। ১. আয়নুত তামার ২. আম্বার। আয়নুত তামার ছিল হীরার কাছাকাছি। আর আম্বার ছিল উহার দ্বিগুণ দূরে। ফোরাত নদীর কিছু দূর ওপারে ছিল আয়নুত তামার। পক্ষান্তরে আম্বার ছিল ফোরাত উপকূল এলাকায়। হযরত খালিদ (রা.) প্রথমে আম্বার আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন। এটাও ছিল একটি বাণিজ্যিক শহর। সেখানে রবিশস্যের বিশাল বিশাল গোডাউন ছিল।

৬৩৩ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে (দ্বাদশ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসের মাঝামাঝি সময়ে) হযরত খালিদ (রা.) হীরা হতে যাত্রা শুরু করেন। তাঁর সঙ্গে অর্ধেক সৈন্য তথা ৯ হাজার সৈন্য ছিল, যা আক্রমণের জন্য খুবই কম ছিল। কিন্তু হযরত খালিদ (রা.)-এর আল্লাহ্ এবং নিজের যুদ্ধ অভিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতার উপর পূর্ণ আস্থা ছিল। বিজিত এলাকা সৈন্যহীন অবস্থায় রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। ঈসায়ী এবং অন্যান্য গোত্রের লোকেরা আনুগত্য কবুল করলেও বিভিন্ন কারণে মুসলমানদের তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছিল। আনুগত্য স্বীকারকারীরা সুযোগ পেলেই আনুগত্য অস্বীকার করত এবং বিদ্রোহী হয়ে যেত। হীরায় হযরত খালিদ (রা.) কা'কা বিন আমর এবং আকরা' বিন হাবেসকে রেখে যান।

এখানে একটি ভুলের অবসান হওয়া দরকার। আর তা হলো, কয়েকজন ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, হযরত খালিদ (রা.) হীরায় সালার আয়াজ বিন গনামের অপেক্ষায় ১ বছর অপেক্ষা করেন। এ তথ্য সঠিক নয়। তৎকালীন যুগের দলীল প্রমাণ হতে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে, হযরত খালিদ (রা.) হীরায় পূর্ণ এক মাসও অপেক্ষা করেননি। তিনি আমীরুল মু'মিনীনের বরাবর এই বার্তা পাঠান যে, তিনি তার নির্দেশের বিপরীত সালার আয়াজ বিন গনামের অপেক্ষা করা ছাড়াই মাদায়েন অভিমুখে যাত্রা করছেন।

✪

হযরত খালিদ (রা.) নয় হাজার মুজাহিদসহ ফোরাত নদীর তীর ঘেঁষে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে অগ্রসর হতে থাকেন। তাঁর গুপ্তচররা বিভিন্ন ছদ্মবেশে নদীর অপর তীর বেয়ে আগে আগে যাচ্ছিল। আম্বার হতে কিছু দূর থেকেই তিনি নদী পার হয়ে যান। এখন তিনি নদীর ঐ পারে চলে আসেন, যেখানে আম্বার শহর অবস্থিত ছিল। এখানে এসে তিনি হাল্কা যাত্রাবিরতি করেন এবং দু'টি পত্র লিখেন। একটি কিসরার নামে আর অপরটি মাদায়েনের প্রশাসক ও রাজন্যব্যক্তিবর্গের উদ্দেশে। কিসরার নামে যে পত্রটি লিখেন তার কথা ছিল এমন ঃ

"বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম"

হযরত খালিদ (রা.)-এর পক্ষ হতে পারস্য সম্রাটের নামে। আমি আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করছি, যিনি আপনাদের সাজানো সাম্রাজ্য ওলট পালট করে দিয়েছেন। আপনাদের দুর্ধর্ষ যুদ্ধবাজ সেনানায়কদের সফলতা অর্জন করা হতে

বঞ্চিত রেখেছেন। আপনাদেরকে গৃহ-বিবাদের দিকে ঠেলে দিয়েছেন। আল্লাহ আপনাদের আরও সুযোগ দিলেও যে অধঃপতন শুরু হয়েছে তা বেগবান বৈ শ্লথ হবে না। বর্তমানে আপনাদের পরিত্রাণের উপায় মাত্র একটিই। আর তা হলো, মদীনার আনুগত্য। এটা সাদরে মেনে নিলে আমি সন্ধিশর্ত চূড়ান্ত করতে বন্ধুরূপে আসব। সন্ধির কাজ শেষ করে সামনে এগিয়ে যাব। যদি সন্ধির এ আহ্বান উপেক্ষা করে আনুগত্য মেনে নিতে ব্যর্থ হন, তাহলে আপনাদেরকে এমন বাহিনীর হাতে অস্ত্র সমর্পন করতে হবে, যাদের কাছে মৃত্যু তত প্রিয়, জীবন যেমন আপনাদের কাছে প্রিয়।"

হযরত খালিদ (রা.) মাদায়েনের প্রশাসক ও আমীরদের প্রতি লিখেন ঃ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

হযরত খালিদ (রা.)-এর পক্ষ হতে পারস্যের রাজন্যবর্গের প্রতি। আপনাদের জন্য কল্যাণকর পথ এটাই যে, ইসলাম গ্রহণ করে নিন। তাহলে আমরা আপনাদেরকে সার্বিক নিরাপত্তা প্রদান করব। ইসলাম গ্রহণ না করলে কর আদায় করুন। এতেও অপারগ হলে বুঝে রাখবেন, আপনাদের মাথার কাছে এমন এক জাতি দণ্ডায়মান, যাদের কাছে মৃত্যু এত প্রিয়, যত প্রিয় আপনাদের কাছে শরাবপাত্রে চুমুক দেয়া।"

হযরত খালিদ (রা.) পারস্য সম্রাটের নামে লিখিত পত্রটি হীরার অধিবাসী এক লোকের হাতে পাঠিয়ে দেন। আর আমীর উমরাদের নামে লিখিত পত্রটির বাহক ছিলেন আম্বারের অধিবাসী এক লোক। পত্রবাহক দু'জনের নাম কোনো ঐতিহাসিক লিখেননি।

✪

আম্বার অধ্যুষিত এলাকাকে সাবাত বলা হত। সাবাত বর্তমানের কয়েকটি জেলার মত ছিল। আম্বার ছিল জেলাধীন একটি বড় শহর। সাবাতের শাসকের জেলার নাম ছিল শেরযাদ। তিনি সে সময়ে আম্বারেই অবস্থানরত ছিলেন। শেরযাদ ছিলেন যেমনি আলেম, তেমনি বিচক্ষণ ব্যক্তিত্ব। তবে তার মধ্যে প্রতিরক্ষা জ্ঞান কিছুটা কম ছিল। কিন্তু আম্বারের সৈন্যসংখ্যা এত বেশি ছিল যে, প্রতিরক্ষা জ্ঞানের স্বল্পতা পুষিয়ে দেয়ার জন্য তা যথেষ্ট ছিল। নিজের বাহিনী ছাড়াও তার সঙ্গে ঈসায়ী বাহিনীরও বহু সদস্য ছিল।

অসংখ্য সৈন্যের উপস্থিতির পাশাপাশি আম্বারের কেল্লাটিও ছিল বিরাট ও মজবুত। বহিঃশত্রু প্রতিরোধে শহরের চতুর্দিক দিয়ে গভীর গর্ত খনন করা ছিল। গর্তগুলো ছিল পানিতে ভরপুর। এই সমস্ত দিক আম্বারকে অজেয় শহরে পরিণত করে রেখেছিল। হযরত খালিদ (রা.)-এর জন্য শহরটি জয় করা এ কারণেও অসম্ভব ছিল যে, তাঁর সৈন্যসংখ্যা ছিল সর্বসাকুল্যে ৯ হাজার।

আম্বারের গুপ্তচররা মুসলিম বাহিনীকে শহর পানে এগিয়ে আসতে দেখে তারা দ্রুত বিষয়টি নগর প্রধান শেরযাদকে অবহিত করে। এরপর সারা শহরে খবর ছড়িয়ে পড়ে যে, মদীনার বাহিনী আসছে। শেরযাদ খবর পেয়েই দ্রুত কেল্লার বুরুজে উঠেন এবং পরিস্থিতি নিজ চোখে পর্যবেক্ষণ করেন। গুপ্তচররা তাকে জানায় যে, মদীনা বাহিনীর সংখ্যা সর্বসাকুল্যে ১০ হাজার।

"না, এটা সুস্পষ্ট ধোঁকা" বুরুজে উঠে মুসলিম বাহিনীকে দেখে শেরযাদ বলে "যারা আমাদের এত বড় বাহিনীকে একের পর এক চার রণাঙ্গনে পরাজিত করেছে, তারা এই বোকামির পরিচয় দিতে পারে না যে, বিশাল দূর্গ পরিবেষ্টিত এই শহরে হামলা করার জন্য এত কম সৈন্য নিয়ে আসবে। আমার মতে এটা তাদের বাহিনীর অগ্রগামী দল। অগ্রগামী দল না হলেও নিশ্চয় পশ্চাতে সমপরিমাণ আরেকটি বাহিনী থেকে থাকবে অথবা অন্য কোনো দিক দিয়ে তারা আসবে।"

মদীনা বাহিনীর আগমনের সংবাদে শহরবাসীদের মধ্যে হুলস্থুল পড়ে যায়। তারা ইতিপূর্বে মুসলমানদের ব্যাপারে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর ঘটনা শুনেছিল। স্বীয় বাহিনীর পরাজিত আহত সৈন্যদের এবং রণাঙ্গন থেকে পালিয়ে আসা সিপাহীদের তারা গভীরভাবে দেখেছিল। তাদের ত্রাস এবং ভীতিকর অবস্থাও দেখেছিল। রণাঙ্গণ হতে পিছু হটার পক্ষে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে তারা মানুষদেরকে মুসলমানদের যুদ্ধ বিষয়ক এমন এমন ঘটনা শোনাত, যার ফলে শহরবাসীদের কাছে মুসলিম বাহিনী মানুষ ছিল না; বরং সাক্ষাৎ ভূত ও রহস্যময় হয়ে গিয়েছিল। যাদের সম্পর্কে তারা এতদিন গল্প শুনে এসেছে, আজ সেই মুসলিম বাহিনী তাদের বিশাল শহর অবরোধ করতে ধেয়ে আসছে। ফলে মানুষ প্রতিরোধের চিন্তা ভুলে গিয়ে অলঙ্কার, টাকা-পয়সা এবং যুবতী নারীদের লুকিয়ে রাখতে তৎপর হয়ে পড়ে।

শহরের হুলস্থূল ও শহরবাসীদের ত্রাস বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। কেননা পাঁচিলের উপর হতে উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হতে থাকে যে, মুসলমানদের সংখ্যা এত কম যে, সারা জীবন চেষ্টা করেও তারা শহরের কাছ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে না। এ ঘোষণার পাশাপাশি বিকট আওয়াজের অট্টহাসিও শোনা যায়। হাসির আওয়াজ ক্রমেই বাড়তে থাকে।

"হে মুসলমানরা!" অগ্নিপূজারীরা উপহাসের সুরে বলে। "মৃত্যু তোমাদের এ পর্যন্ত টেনে এনেছে।"

"জীবিত থাকতে চাইলে মদীনায় ফিরে যাও।"

শহরে পাঁচিলের উপর তীরন্দাযদের ভীড় ছিল। মুসলিম বাহিনী শহর অবরোধ করে রেখেছিল। পাঁচিলের পাশ দিয়ে খননকৃত কূপ তাদেরকে পাঁচিলের ধারে কাছে ভিড়তে বাধা দিচ্ছিল। ঐতিহাসিক তবারী এবং ইয়াকুত লিখেন, খন্দক পাঁচিলের এত কাছে খনন করা ছিল যে, তার নিকটে আগত ব্যক্তি অতি সহজে উপর হতে নিক্ষিপ্ত তীরের আওতায় চলে আসত। এমনটি না হলেও পরিখা পাড়ি দেয়া সম্ভব ছিল না। পরিখাগুলো বিশাল আয়তনের ছিল। পাঁচিলের উপর বসে তীরন্দাযরা মুসলমানদের অসহায়ত্ব দেখে হাসছিল। হাজার হাজার সৈন্য পাঁচিলের উপর দাঁড়িয়ে মুসলমানদের তামাশা দেখছিল।

"খোদার কসম!" হযরত খালিদ (রা.) গম্ভীর কণ্ঠে বলেন। "এসব লোকেরা জানেনা যে, যুদ্ধ কাকে বলে এবং কিভাবে লড়তে হয়।"

ঐতিহাসিকগণ লিখেন, আম্বার শহর সর্বদিক বিবেচনায় অজেয় ছিল। কিন্তু হযরত খালিদ (রা.)-এর চেহারায় এ কারণে বিন্দুমাত্র চিন্তার ছাপ ছিল না। তিনি ছিলেন ভাবলেশহীন, নিশ্চিন্ত। রাতে তিনি সালারদের ডেকে নিশ্চয়তা দেন যে, বিজয় তাদেরই হবে, তবে এর জন্য বড় কুরবানী দিতে হবে। বিজয়ের ব্যাপারে তাকে বড় আশাবাদী করে তুলেছিল এ বিষয়টি যে, কেল্লার ফটকটি তত উঁচু ছিল না, যেমন কেল্লার দেয়াল উঁচু হয়ে থাকে।

✪

সকাল হতেই হযরত খালিদ (রা.) ঘোড়ায় চেপে বসেন এবং শহরের চতুর্দিক প্রদক্ষিণ করেন। তিনি ঘুরে ঘুরে পাঁচিল এবং পরিখা যাচাই করছিলেন। প্রদক্ষিণ শেষে তিনি সালারদের বলেন, তাঁর এমন এক হাজার তীরন্দাযের প্রয়োজন, যারা নিশানায় সিদ্ধহস্ত। তাদের বাহুতে এমন শক্তি থাকবে যে, কামান ধরে টান দিলে তা দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাবে এবং সাধারণ তীরন্দাযদের তুলনায় তাদের তীর বহু দূরে যাবে।

"জলদি কর" হযরত খালিদ (রা.) বলেন। "দ্রুত কর; সন্ধ্যার আগেই আমাকে এই শহরে প্রবেশ করতে হবে।"

কিছুক্ষণের মধ্যে এক হাজার তীরন্দায চলে আসে। এ বাহিনীর সকলেই ছিল বিশেষভাবে নির্বাচিত। সকলেই ছিল টগবগে যুবক এবং মজবুত দেহের অধিকারী। "তোমরা পরিখা পর্যন্ত এভাবে টহল দিতে দিতে যাও যে, কামান তোমাদের হাতে ঝুলন্ত থাকবে" হযরত খালিদ (রা.) বলেন। "এমনভাবে যাবে যে, দর্শক ভাববে, তোমরা টহল দিতে দিতে পরিখার কাছে চলে এসেছ। পরিখার কাছে গিয়েই চোখের পলকে তূনীর হতে তীর বের করে ধনুকে সংযোজন করবে এবং পাঁচিলের উপর দাঁড়ানো দুশমনের তীরন্দায বাহিনীর চোখকে টার্গেট করে তীর নিক্ষেপ করবে। শত্রুরা টের পাওয়ার আগেই এটা করবে। এক এক করে তীর চালিয়েই যাবে।

ঐতিহাসিক তবারীর মত হলো, হযরত খালিদ (রা.) নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, শুধু চোখে মারবে, ... চোখ টার্গেট করবে।

হযরত খালিদ (রা.)-এর নির্দেশে এক হাজার তীরন্দায ধীর পদক্ষেপে পরিখা পর্যন্ত চলে যায়। তারা ছিল সম্পূর্ণ ভাবলেশহীন। তাদের দেখে পাঁচিলের উপরের শত্রুসেনারা হাসছিল। তারা মুসলমানদের মধ্যে পরিখা পাড়ি দেয়ার কোনো ভাব দেখতে পায় না। পরিখার কাছাকাছি পৌঁছে এক হাজার তীরন্দায উপর পানে তাকায়। এদিক-সেদিক তাকায়। পরিখার মধ্যে নজর করে। ভবঘুরের মত হাবভাব করে। অগ্নিপূজারীদের তীরন্দাযরা তাদেরকে তীরাহত করার প্রয়োজন অনুভব করে না। অথচ মুসলিম বাহিনী তাদের তীরের আওতায় চলে এসেছিল।

আচমকা মুসলিম তীরন্দাযরা তূনীর হতে তীর বের করে চোখের পলকে ধনুকে সংযোজন করে শত্রুদের চোখ টার্গেট করে ছুঁড়ে মারে। বিশেষ বাহিনীর উদ্দেশ্য সফল হয়। এক হাজার তীর একযোগে অগ্নিপূজারীদের চোখ ভেদ করে। এভাবে তারা পর্যায়ক্রমে হাজার হাজার তীর নিক্ষেপ করতে থাকে।

এ দাবী করা ঠিক হবে না যে, মুসলমানদের একটি তীরও ব্যর্থ হয়নি। তবে ইতিহাসে লেখা আছে, বেশিরভাগ তীর শত্রুসেনাদের চোখে লাগে এবং শহরে দ্রুত এই খবর ছড়িয়ে পড়ে যে, "আমাদের বহু সৈন্যের চোখ অকেজো হয়ে গেছে।" যখন পাঁচিলের উপর থেকে তীরাহত সিপাহীদের নামানো হয়, তখন শহরবাসী তাদেরকে চোখে তীরবিদ্ধ এবং আর্তচিৎকার করতে দেখে।

এক ইংরেজ গবেষক কয়েকজন ঐতিহাসিকের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেন, মুসলমানদের পক্ষ হতে ৩ হাজার তীর এত দ্রুত উড়ে আসে যে, অগ্নিপূজারীরা আত্মরক্ষার কোনো সুযোগ পায় না। কিছু তীর শত্রুর চোখ ছুঁতে ব্যর্থ হলেও মুখমণ্ডল অবশ্যই আহত করে। পারস্যের সৈন্যরা এবং তাদের মদদে আসা ঈসায়ীরা ভীড় করে পাঁচিলের উপর দাঁড়িয়ে থাকায় একটি তীরও ব্যর্থ হয় না। প্রত্যেকটি তীরে একজন না একজন আহত হয়-ই।

তবারীর লেখনী মতে আম্বারের অবরোধকে 'জাতুল উয়ুন' বা চোখের জ্বালাও বলা হয়।

মুসলিম বাহিনীর আকস্মিক এই হামলা শুধু শহরবাসীদের উপরে নয়; বরং পারসিক বাহিনীর মাঝেও ত্রাস সৃষ্টি করে। মুসলমানরা সেদিন জাদু দেখিয়েছিল। সাবাতের অগ্নিপূজারী শাসক শেরযাদ বিচক্ষণ এবং দূরদর্শী মানুষ ছিলেন। তিনি স্বীয় অভিজ্ঞতার আলোকে অনুমান করে ফেলেন যে, তার সৈন্যদের মাঝে লড়াই করার যে প্রেরণা ছিল তা স্থিমিত হয়ে গেছে। তিনি এটাও অনুমান করেন যে, তার সৈন্যরা পূর্বের পরাজয়ের কারণেও আতঙ্কগ্রস্ত। তাই সবদিক বিবেচনা করে অযথা রক্তপাত না ঘটাতে তিনি হযরত খালিদ (রা.)-এর সঙ্গে সন্ধি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি দু'জন আমীরকে কেল্লার বাইরে পাঠিয়ে দেন।

পরিখার কাছাকাছি এসে তারা মুসলিম বাহিনীর কাছে জানতে চায়, তাদের সেনাপতি কোথায়? খবরটি হযরত খালিদ (রা.)-এর কর্ণগোচর হলে তিনি এসে উপস্থিত হন।

"আমাদের নেতা শেরযাদ আমাদের পাঠিয়েছেন" শেরযাদ কর্তৃক প্রেরিত দু'জনের একজন হযরত খালিদ (রা.)-কে বলে "আমরা আপনার সঙ্গে সন্ধি করতে চাই। তবে এমন শর্তে যা আমাদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হয়। সন্ধি হয়ে গেলে শেরযাদ স্বীয় বাহিনী নিয়ে আম্বার ছেড়ে চলে যাবেন।"

"শেরযাদকে বলুন, শর্ত আরোপের সময় পার হয়ে গেছে" হযরত খালিদ (রা.) বলেন। "এখন শর্ত আমরা দিব, তোমরা তা অবলীলায় মেনে নিবে।"

দূত হিসেবে আগত দু'জন ফিরে যায় এবং তারা শেরযাদকে হযরত খালিদ (রা.)-এর বার্তা পৌছে দেয়। শেরযাদ তার সালারদের দিকে তাকান।

"আমরা এত তাড়াতাড়ি অস্ত্র সমর্পণ করব না" এক সালার বলে।

"আমাদের সৈন্যের অভাব নেই" আরেক সালার বলে, মুসলমানরা পরিখা পার হয়ে আসতে পারবে না।"

শেরযাদ সালারদের মন্তব্য শুনে মাথা নাড়েন। এই হেলনী ছিল দ্ব্যর্থবোধক। এটা সুস্পষ্ট ছিল না যে, তিনি কেল্লা প্রতিরক্ষার সিদ্ধান্ত নিলেন না কি হযরত খালিদ (রা.)-এর বার্তার উপর চিন্তা করে অন্য কোনো সিদ্ধান্ত নিতে চান। উপস্থিত সালাররা তার মস্তকহেলানীকে যুদ্ধ অব্যাহত রাখার সপক্ষে মনে করে এবং তারা পুনরায় কেল্লার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করতে তৎপর হয়ে পড়ে। ইতোমধ্যে আগত এক হাজার মুসলিম তীরন্দায ইউনিট আম্বারের প্রায় দুই হাজার সিপাহীর চোখ ফুটো করে পিছনে সরে গিয়েছিল।

✪

হযরত খালিদ (রা.) শহরের চারপাশে আরেকবার ঘুরে আসেন। এবার তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল পরিখার প্রতি। তিনি শেষমেষ পরিখা পাড়ি দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। একস্থানে পরিখার আয়তন কম ছিল। তবে এত কম নয় যে, দূর থেকে অশ্ব ছুটিয়ে এসে তা পাড়ি দেয়া যেতে পারে। হযরত খালিদ (রা.)-এর মাথায় এক নতুন পরিকল্পনা আসে। তিনি নির্দেশ দেন যে, যেসব উট দুর্বল হয়ে গেছে, অথবা অসুস্থ হয়ে পড়েছে, সেগুলো সামনে নিয়ে এসো।

বাহিনীর সঙ্গে এমন অনেক উট ছিল যেগুলো যুদ্ধ সরঞ্জাম বহন করতে সমর্থ ছিল না। হযরত খালিদ (রা.)-এর নির্দেশে সেসব উট জবাই করে পরিখার এস্থানে নিক্ষেপ করা হয়, যেখানে পরিখার আয়তন কম ছিল। এত পরিমাণ উট জবাই করে এমনভাবে বিন্যস্ত করে উটগুলো ফেলা হয় যে, তাতে একটি পুল হয়ে যায়।

"আল্লাহ তোমাদের জন্য গোশত ও হাড়ের পুল বানিয়ে দিয়েছেন" হযরত খালিদ (রা.) জোর আওয়াজে বলেন, "এখন পরিখা পার হওয়া কোনো ব্যাপার নয়।"

উটের পুলটি সমতল ছিল না। এ পুল পার হওয়া ছিল সাংঘাতিক ঝুঁকিপূর্ণ। সিপাহীদের বারবার পা পিছলে যাচ্ছিল তথাপিও পারাপারের গতি ছিল দ্রুত। সেনানায়কের নির্দেশ পেয়েই পদাতিক মুজাহিদ বাহিনী ঐ আজব পুল দিয়ে পার হতে থাকে। কিছু সৈন্য পা পিছলে পানিতে পড়ে গেলেও উটের পা, ঘাড় ইত্যাদি ধরে ওপারে পৌঁছতে সক্ষম হয়।

শহর রক্ষা পাঁচিলের উপর থেকে তীরন্দাযরা তীর বর্ষণ শুরু করে। এদিকে চোখ বিদীর্ণকারী মুসলিম তীরন্দাযরা দ্রুতগতিতে তাদের তীর বর্ষণ অব্যাহত রাখে। এ পর্যায়ে তাদের সংখ্যা এক হাজার নয়; বরং অনেক বেশি ছিল। উটের পুলে চড়ে এপার আগত মুসলমানদের কেউ কেউ শত্রুপক্ষের তীরের আঘাতে আহত হচ্ছিল। কিন্তু মুসলিম বাহিনী এতে দমে না। তারা সব বাধা পেরিয়ে তুফানের গতিতে পুল দিয়ে পরিখা হয়ে এপারে আসতে থাকে এবং দ্রুত চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

ঐতিহাসিকগণ লেখেন, মুসলমানদের এই অগ্রাভিযান অস্বাভাবিক বীরত্বব্যক ছিল। স্রোতের মত মুসলমানদের আসার কারণে কিছু মুজাহিদ আহত ও শহীদ হলেও তাদের দৃঢ়তা ও বীরত্বে শত্রুপক্ষের মধ্যে এমন প্রভাব সৃষ্টি করে যে, তা তাদের সৈন্যদের মনোবল সম্পূর্ণ ভেঙ্গে দেয়। মুসলমানদের জযবার কাছে তদের জযবা ফুটো বেলুনের মত চুপসে যায়। তাদের মধ্যে মুসলমান-ত্রাস পূর্ব থেকেই ছিল। এখন চোখের সামনে উট জবাই করে পুল বানানোর বিস্ময়কর বুদ্ধি দেখে তারা হতভম্ব হয়ে যায়। তীর বৃষ্টির মাঝেও যেভাবে মুসলমানরা পুল পার হতে থাকে, তাতে তাদের শেষ শক্তিটুকুও লোপ পেয়ে যায়। এক ধরনের আতঙ্ক ও ভয় তাদের এমনভাবে গ্রাস করে যে, পাঁচিলের উপরের তীরন্দাযদের সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পেতে থাকে। কিছু কম হয় তীরের আঘাতে আহত হওয়ার কারণে আর বেশিরভাগ স্থান খালি হয়ে যায় পলায়নের পথ খোঁজার কারণে। রণে ভঙ্গ দেওয়ার একটি ব্যাপক অবস্থা তাদের মাঝে সৃষ্টি হয়েছিল।

মাত্র একটি ইউনিট পরিখা পাড়ি দিয়েছিল। এই বাহিনীর প্রেরণা জযবা এই কারণে বেশি ছিল যে, খোদ সেনাপতি হযরত খালিদ (রা.) তাদের সঙ্গে ছিলেন। শুধু তাই নয়, মরা উটের পুলে চড়ে যিনি সর্বপ্রথম পরিখা পার হন হন তিনি ছিলেন সেনাপতি নিজেই। তিনি পরিখা পার হয়েছিলেন তীর বৃষ্টির মধ্য দিয়ে। তীর তাঁর ডান বাম দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল এবং কতক তীর তার পায়ের কাছে এসে জমিনে বিদ্ধ হচ্ছিল। কিন্তু হযরত খালিদ (রা.) ছিলেন সম্পূর্ণ নির্ভীক। তিনি তীরবৃষ্টিকে পাত্তা দেন না। তীর বর্ষণ তাঁর কাছে ছিল বৃষ্টিবর্ষণের মত। তিনি সমানতালে এগিয়ে চলেন। থেকে থেকে বিকট আওয়াজে বিঘোষিত হচ্ছিল 'আল্লাহু আকবার'-এর নারাধ্বনি। এই জলদগম্ভীর ধ্বনি মুজাহিদ বাহিনীর রক্ত গরম করে দিচ্ছিল। প্রেরণাকে করছিল শাণিত, হিম্মতকে করছিল গগণচুম্বী। নারাধ্বনির গর্জনে আল্লাহর সাক্ষাত রহমত ও বরকতও ছিল।

এদিকে মুসলমানরা যখন পুল পারাপারে ব্যস্ত, ওদিকে তখন শহরে চলছিল পলায়নের জোর প্রস্তুতি। কে কার আগে পালিয়ে আত্মরক্ষা করবে এই প্রতিযোগিতা চলছিল শহরময়। শহর পাঁচিল হতে আহতদেরকে নামানো হলে দেখা যায় এক একজন সিপাহীর চোখে, মুখে একটি দুইটি তিনটি করে তীর বিদ্ধ হয়ে আছে। আহতদের সংখ্যা যতই বাড়ছিল, শহরে ত্রাস ও আতঙ্ক ততই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। মানুষ চিৎকার করে ফিরছিল "সমঝোতা করে নাও, সন্ধি কর, দরজা খুলে দাও।"

শহর প্রধান শেরযাদের জন্য উদ্ভূত পরিস্থিতি বড়ই জটিল ছিল। তিনি নিজেও ছিলেন বিচক্ষণ। তিনি মানুষের আর্তচিৎকার শুনে এবং নারী-শিশুদের ভীত অবস্থায় আত্মরক্ষার জন্য ছুটোছুটি করতে দেখে অনুমান করে ফেলেন যে, এসব নিষ্পাপ-মাছুম শিশু এবং দুর্বলমতি নারীরা বেঘোরে প্রাণ হারাবে। তাদের ধ্বংসযজ্ঞ হতে বাঁচাবার একটি পন্থাই ছিল; আর তা হলো অস্ত্র সমর্পণ করা। তিনি তৎক্ষণাৎ প্রধান সেনাপতিকে ডেকে বলেন, আমি অযথা রক্তপাত ঠেকাতে চাই।

"না" প্রধান সেনাপাতি আঁৎকে উঠে বলে। "এখনই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিবেন না। আমাকে আরেকবার ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ দিন।"

শেরযাদ প্রধান সেনাপতির কথায় চুপ হয়ে যান। তিনি আন্তরিকভাবে যুদ্ধখেলা বন্ধ করতে চাইলেও প্রধান সেনাপতির কারণে সুপ্ত ইচ্ছার বাস্তবরূপ দিতে পারেন না।

প্রধান সেনাপতি শহর রক্ষা পাঁচিলের উপরে উঠে স্বীয় বাহিনীর অবস্থা স্বচক্ষে অবলোকন করছিল। তার তীরন্দায ফোর্স ক্রমেই কাহিল ও ধরাশায়ী হয়ে পড়ছিল। এ দৃশ্যও তার চোখ এড়ায় না যে, ইতিমধ্যেই মুসলিম বাহিনী পরিখা পার হয়ে এপারে চলে এসেছে। সেনাপতি এক দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সে নির্বাচন করে এক প্লাটুন সৈন্য বাছাই করে এবং কেল্লার দরজা খুলে ঐ বাহিনীকে বাহিরে নিয়ে আসে। বাহিনীটি অতর্কিতে ঐ মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, যারা পরিখা পেরিয়ে এসেছিল। পরিখার ওপারে দাঁড়ানো মুজাহিদ বাহিনী আগত শত্রু বহরের উপর তীর বর্ষণ করতে থাকে।

এই শত্রু বহরের মোকাবেলা মুসলমানদের ঐ বাহিনীর সঙ্গে হয় যাদের সাথে খোদ সেনাপতি হযরত খালিদ (রা.) ছিলেন। মুসলিম বাহিনীর

সুপরিকল্পিত ও কৌশলী তীর বর্ষণে অগ্নিপূজারীদের সারি বিন্যাস ও দৃঢ়তায় ছেদ পড়ে। হযরত খালিদ (রা.) শত্রুবহরকে এভাবে ঘুরিয়ে আনেন যে, নিজের বাহিনীকে কেল্লার ফাঁকের দিকে এগিয়ে নিয়ে তাদেরকে পরীখামুখী করে দেন। যাতে পরীখার ওপারের মুসলমানরা তাদের সামনা-সামনি পেয়ে তীরের টার্গেট করতে পারে এবং সামনে-পিছন উভয় দিক দিয়ে শত্রুবহর তীর বর্ষণের মুখে পড়ে। হযরত খালিদ (রা.) রণকৌশল হিসেবে তাদেরকে ক্রমেই পরীখার দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেন। যাতে তারা সহজেই ওপারের মুসলমানদের তীরের নাগালে চলে আসে।

ঘোরতর লড়াই হয়। যুদ্ধের আগুন জ্বলতে থাকে দাউদাউ করে। মারমার, কাটকাট রবে যুদ্ধ এগিয়ে চলে। কেউ কাউকে এক তিল পরিমাণ ছাড় দিতে নারাজ। লড়াই জমে ওঠে। উভয়পক্ষ প্রাণান্ত কসরত চালায় প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করতে। মুষ্টিমেয় মুসলমানদের বাগে পেয়ে অগ্নিপূজারী বাহিনী ক্ষুধার্ত শার্দুলে পরিণত হয়। অপূর্ব বীরত্বের পরিচয় দিয়ে তারা হার না মানা লড়াই অব্যাহত রাখে। মুসলিম বাহিনীও মুহুর্মূহু নারাধ্বনি দিয়ে ক্ষিপ্ত চিতার মত স্থান পাল্টিয়ে পাল্টিয়ে অপূর্ব রণকৌশলে তাদের সকল আক্রমণ প্রতিহত করে। মোক্ষম সুযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ে বজ্রের মত। গাজর-মূলার মত কেটে কেটে শত্রুবুহ্য ভেদ করে এগিয়ে যায়। দ্বিমুখী আক্রমণের কবলে পড়ে শত্রুবাহিনীর বীরত্বে এক সময় চিঁড় ধরে। সেনাপতির হাত থেকে চেইন অব কমান্ড ছুটে যায়। ঐক্যবদ্ধতার পরিবর্তে ছত্রভঙ্গ অবস্থায় যুদ্ধ চলতে থাকে। দ্বিমুখী আক্রমণে কুলিয়ে উঠতে না পেরে কিছু সৈন্য পরীখার মধ্যে গিয়ে পতিত হয়। এভাবে শত্রুপক্ষ ক্রমেই কোনঠাসা হয়ে পড়ে (এক সময় তাদের মনোবল হারিয়ে যায়। যুদ্ধের গতি প্রতিকূলে দেখে শত্রু সেনাপতি দ্রুত গিয়ে এই ভেবে কেল্লার দরজা বন্ধ করে দেয় যে, যাতে মুসলিম বাহিনী ভেতরে ঢুকতে না পারে। কেল্লার দরজা বন্ধ হতে দেখে অবশিষ্ট সৈন্যরাও রণে ভঙ্গ দিয়ে ভেতরে ঢুকে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করে।

হযরত খালিদ (রা.) শহর রক্ষা প্রাচীর গভীর পর্যবেক্ষণ করেন। সহজসাধ্য না হলেও তিনি মুজাহিদ বাহিনীকে পাঁচিলের উপর উঠাতে চান। তাঁর জানা ছিল না যে, পাঁচিলের এপারে থাকা ইরানী সৈন্য এবং শহরবাসীদের অবস্থা কত করুণ ছিল।

অকস্মাৎ কেল্লার দরজা আরেকবার নড়ে উঠে। দরজার এক পাল্লা খুলে যায়। খোলা পাল্লা দিয়ে আবির্ভাব হয় মাত্র এক ব্যক্তির। লোকটি দরজা পেরোতেই কেল্লা পূর্ববৎ বন্ধ হয়ে যায়। লোকটি দু'হাত উচিয়ে উচ্চস্বরে বলে, সে শহরের দূত, সন্ধি সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য এসেছে। এ সময়ে পাঁচিলের উপর হতে তীর বর্ষণও বন্ধ হয়ে যায়।

"হে অগ্নিপূজারী!" হযরত খালিদ (রা.)-এর সামনে দূতকে নেয়া হলে তিনি তাকে সম্বোধন করে বলেন, "এবার তুমি কী খবর এনেছ? যরথুষ্ট্র কি তোমাদের থেকে নজর ফিরিয়ে নেয়নি? এখনও কি তোমরা আল্লাহকে মেনে নিবে না?"

"হে মদীনাবাসী! আমি অন্য কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি না" দূত বলে। "আমি সাবাত শহর প্রধান শেরযাদের দূত। শেরযাদ বলেছেন, যদি আপনারা তাকে এবং শহরবাসীকে নিরাপদে শহর ছেড়ে চলে যেতে দেন, তাহলে শহর আপনাদের হাতে তুলে দেয়া হবে।"

তবারী এবং ওকীদী লিখেন, হযরত খালিদ (রা.) এ শর্তও মেনে নেয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি পুনরায় শহর-প্রাচীরের উচ্চতা দেখেন এবং চিন্তা করেন, এর উপরে যেভাবেই হোক যদি চড়া যেত। কিন্তু কাজটি এক ধরনের অসম্ভবই ছিল।

"সাবাতের শাসক শেরযাদকে বলবে, খালিদ তার উপর দয়া করছে" হযরত খালিদ (রা.) দূতকে বলেন, তাকে বলবে, তিনি যেন স্বীয় বাহিনী নিয়ে এখান থেকে বেরিয়ে যান। তবে আরোহণের অশ্ব ছাড়া কেউ নিজের সাথে কোনো কিছু নিতে পারবে না। নিজেদের সমস্ত ধন-সম্পদ রেখে যেতে হবে এবং আমাদের সৈন্যদের সামনে দিয়ে যাবে। যদি তার এই শর্ত মনঃপুত না হয়, তাহলে শেষ কথা জানিয়ে দিবে যে, ঐ ধ্বংসযজ্ঞের জন্য যেন প্রস্তুত থাকে, যা তিনি ইতোপূর্বে কোনো দিন দেখেননি।"

দূত বার্তা নিয়ে ফেরত যায়। হযরত খালিদ (রা.) চতুর্দিকে বার্তা পাঠান যে, আপাতত তীরবর্ষণ স্থগিত রাখ।

✪

কিছুক্ষণ পর আরেকবার দরজা নড়েচড়ে ওঠে। দরজা সম্পূর্ণ খুলে যায়। বহু সৈন্য মোটা মোটা এবং খুব লম্বা লম্বা তক্তা নিয়ে বের হয়। তক্তার সাথে রশি বাঁধা ছিল। তারা তক্তাগুলো নিয়ে পরিখার কিনারায় উঁচু করে রেখে রশি ধরে

আস্তে আস্তে তক্তা পরীখার উপর দিয়ে ছেড়ে দেয়। তক্তাগুলো ছিল মাপের। ফলে তক্তার ওপাশ গিয়ে পরীখার ওপর প্রান্তে গিয়ে পড়ে। এটা ছিল অস্থায়ী কাঠের পুল, যা শেরযাদ এবং তার বাহিনী চলে যাওয়ার জন্য পরীখার উপর স্থাপন করা হয়।

ফটক গলে সর্বপ্রথম যে অশ্বটি বেরিয়ে আসে তার ভাব-ভঙ্গিই বলে দেয় যে, সেটি শাহী আস্তাবলের ঘোড়া। ঘোড়ার আরোহী নিঃসন্দেহে সাবাতের শাসক শেরযাদ ছিল। তার পেছন পেছন বিশেষ বাহিনী বের হয়। কিছু ছিল পদাতিক আর কিছু অশ্বারোহী। সৈন্যদের মধ্যে কিছু লোক আহতও ছিল, তারা সঙ্গীদের কাঁধে ভর করে চলছিল। মৃত সৈন্যদের লাশ তারা মৃত্যুর স্থানেই ফেলে রেখে গিয়েছিল। পরাজিত এ বাহিনী শোকাহত অবস্থায় চলছিল আর মুসলমানরা নীরবতার সঙ্গে তাদের বিদায়ের দৃশ্য দেখছিল। একজন মুসলমানও তাদের প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করে না, কাউকে কটাক্ষ করে না, বিজয়ের শ্লোগান দেয় না।

হযরত খালিদ (রা.) পথের এক পাশে ঘোড়ার পিঠে বসে সব কিছু দেখছিলেন। তাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছিল কিন্তু তারপরেও চেহারায় বিজয়ের আনন্দ ও মুখে আল্লাহর কৃতজ্ঞতামূলক শব্দ ছিল। এটি ছিল ৬৩৩ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসের একদিনের ঘটনা।

এক এক করে যখন শেষ সিপাহী বেরিয়ে যায় তখন হযরত খালিদ (রা.) মুজাহিদ বাহিনীর আগে আগে থেকে দরজা দিয়ে শহরে প্রবেশ করেন। সেখানে তাকে স্বাগত জানানোর জন্য শহরের ধনী ও বণিক শ্রেণী দন্ডায়মান ছিল। দূর হতে শহরবাসীর শোরগোল শোনা যাচ্ছিল। এই ধরনের আওয়াজ ভেসে আসছিল "তারা এসে গেছে। ... মুসলমানরা এসে পড়েছে। ... পালাও ... আত্মগোপন কর।"

হযরত খালিদ (রা.) ঘোড়া হতে অবতরণ করেন। আম্বারের বিভিন্ন পেশার ও শ্রেণীর লোকেরা তাকে হাদিয়া পেশ করে।

"শহরবাসী আমাদেরকে কেন ভয় পাচ্ছে?" হযরত খালিদ (রা.) নেতৃস্থানীয় লোকদের প্রতি লক্ষ্য করে বলেন, "তাদের বলুন যে, তাদের ব্যাপারে আমাদের কোনো অভিযোগ নেই। আমরা এ শহর বিজয় করেছি ঠিকই কিন্তু শহরবাসীকে জয় করিনি। তাদেরকে অভয় দিয়ে বলুন যে, আমরা বন্ধুত্বের বার্তা নিয়ে এসেছি। আমরা কর নিলেও অহেতুক কারো প্রাণ নিব না। আমরা কারো

কন্যাকে নিজেদের দাসী বানাব না। কারো অর্থ-সম্পদ স্পর্শ করব না। আমরা শুধু তাদের ধন-সম্পদ নিব, যারা পরাজিত হয়ে চলে গেছে। ... যান, শহরবাসীকে আমাদের পক্ষ হতে নিরাপত্তা ও শান্তির পয়গাম দিন।

হযরত খালিদ (রা.) স্বীয় বাহিনীকে একটি নির্দেশ এই দেন যে, যারা আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে চলে গেছে তাদের ঘর-বাড়ী তল্লাশী চালিয়ে তাদের যাবতীয় মালামাল ক্রোক করে আনা হোক। দ্বিতীয় আরেকটি নির্দেশ দেন যে, সারা শহরে ঘুরে ঘুরে শহরের বাসিন্দাদের মন থেকে মুসলিম-ভীতি দূর করে আশ্বস্ত করবে এবং অভয়বাণী শোনাবে ও এটা জানাবে যে, শহরে কোনো লুটপাট হবে না।

শহর রক্ষা পাঁচিলের উপর শকুন অবতরণ করছিল। সেখানে বহু সংখ্যক অগ্নিপূজক সৈন্যের লাশ পড়েছিল। মারাত্মক আহত সৈন্যরা বেহুঁশ অবস্থায় এদিক-ওদিক পড়েছিল। শহরের আকাশে-বাতাস মৃত্যুর গন্ধে ভারী হয়ে ছিল।

হযরত খালিদ (রা.) ঐ কামরায় যান যেখানে নগর প্রধান শেরযাদ থাকতেন। সেটি ছিল একটি মহল। দুনিয়ার সর্বপ্রকার আয়েশী ও সৌখিন আসবাবপত্র দ্বারা মহলটি সুসজ্জিত ছিল। হযরত খালিদ (রা.) জমিনের উপর রাত যাপনে অভ্যস্থ থাকায় শেরযাদের মহলটি দেখে এই ভেবে হতবাক হয়ে যান যে, একজন মানুষ নিজেকে অন্যের উপর শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করতে কত ধন-দৌলত খরচ করতে পারে।

হযরত খালিদ (রা.) নির্দেশ দেন যে, দামী ও মূল্যবান সামগ্রীগুলোকে গণীমতের মালের অন্তর্ভুক্ত কর। গুপ্ত ধনভাণ্ডার অনুসন্ধান কর। ধনভাণ্ডার খুঁজে পেতে দেরী হয় না। ভাণ্ডারে স্বর্ণ, হীরা-জওহরের স্তূপ ছিল।

আম্বার শহর পদানত হলে আশেপাশের গোত্রসমূহের সর্দাররা আনুগত্য স্বীকার করতে হযরত খালিদ (রা.)-এর সকাশে আসতে থাকে। হযরত খালিদ (রা.) করের টাকা ধার্য করে তা উসূল করার নির্দেশ দেন। এ সময় গুপ্তচরেরা এসে তাকে জানায় যে, পারস্যবাহিনী আয়নুত তামারে এসে সমবেত হয়েছে। এবারের যুদ্ধটি হবে অত্যন্ত ঘোরতর এবং ভয়াবহ।

✪

মাদায়েনে অগ্নিপূজারীদের শীষমহল সেভাবে দাঁড়ানো ছিল, যেভাবে প্রতাপশালী সম্রাটদের জীবদ্দশায় দাঁড়িয়ে ছিল। এটা ছিল কিসরার সেই মহল যাকে প্রতিরক্ষা শক্তির নিদর্শন মনে করা হত। তার মহলের বহির্দরজার ডানে-বামে দু'টি সিংহ বসা ছিল। এটা ছিল কিসরার প্রতাপ ও দাপটের নিদর্শন। তবে সিংহ দু'টি রক্তে-মাংসের ছিল না; বরং পাথরে খোদাই করা প্রতিমূর্তি ছিল মাত্র। সিংহের প্রতিকৃতি ছাড়াও মহলের মাঝখানে একটি স্তম্ভ ছিল, যা উপর হতে গোলাকৃতির ভাবে নেমে এসেছিল। স্তম্ভটি ছিল খুবই লম্বা। স্তম্ভের মাথায় শিখা অনির্বাণ ছিল, যা দিনরাত জ্বলতে থাকত। স্তম্ভটি তৈরী হলে পুরোহিতরা তাতে অগ্নিসংযোজন করেছিল। শিখা অনির্বাণ চালু হওয়ার পর এক এক করে কয়েক প্রজন্ম অতিবাহিত হয়, কিন্তু তা বিরতিহীনভাবে জ্বলতে থাকে। এই অগ্নি হতে বের হওয়া ধোঁয়া মহলের চতুর্দিকে কুণ্ডলী আকারে এভাবে ছড়িয়ে পড়ত, মনে হত যরথুষ্ট্র এই মহলকে নিজের আশ্রয়ে নিয়ে নিয়েছে।

শিখা অনির্বাণ নিজ গতিতেই জ্বলছিল। তার থেকে উত্থিত ধোঁয়া কুণ্ডলী আকারে এখনও শাহী মহলে প্রদক্ষিণ করছিল, কিন্তু ধোঁয়ার মতি-গতি বর্তমানে অনেকটা এমন ছিল যে, সে মহলকে আশ্রয় দেয়ার পরিবর্তে নিজেই আশ্রয় খুঁজে ফিরছিল। শাহী মহল যেটা এককালে অন্যদের জন্য প্রতাপ ও দাপটের ছিল, এখন তা ছিল নিজেই আতংকগ্রস্ত ও ভীতসন্ত্রস্ত। মহলের শান-শওকত পূর্বের মতই ছিল, ধুমধাম আগের মতই ছিল কিন্তু মহলের অধিবাসীরা স্পষ্টভাবে অনুধাবন করতে শুরু করে যে, এই মহলের উপর প্রেতাত্মারা ভর করেছে। শাহী মহল থেকে এখন আগের মত প্রাণকাঁড়া আনন্দ-উচ্ছাস শুনা না যায়; বরং সেখান থেকে দিন-রাত মৃত্যুর আওয়াজ শোনা যেত।

একটি অদৃশ্য হাত কিসরার পতনেতিহাস তার বংশের রক্তের কালি দ্বারা লিখছিল। সিংহাসনে অভিষেক মৃত্যুর পরোয়ানা সমতুল্য হয়ে গিয়েছিল। উরদূশেরের মৃত্যুর পর যে-ই ঐ সিংহাসনে বসত রহস্যময়ভাবে সে গুপ্তহত্যার শিকার হয়ে যেত। পারস্যের কতিপয় সালার টলটলায়মান সাম্রাজ্যের অধঃপতন বিলম্বিত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছিল। যদি এ সব সালার উদ্যোগী না হত, তাহলে রাজ পরিবারে যে অস্থিরতা ও গৃহ বিবাদ চলছিল তার ধাক্কায় পারস্য সাম্রাজ্য ও তার সিংহাসন অনেক আগেই ধ্বসে পড়ত।

ইরানের ভুবনখ্যাত সুন্দরী নারী ও নর্তকীরা এখনও মহলে ছিল কিন্তু তাদের সেই জৌলুস ও নৃত্যগীত পূর্ববৎ ছিল না। সবকিছুতে ভাটা পড়েছিল। প্রাসাদে নৃত্যের ঝংকার ছিল না। মদের গন্ধ থাকলেও তাতে রক্তের ঘ্রাণ মিশ্রিত হয়ে গিয়েছিল। আগে মদের আসর বসত চিত্ত বিনোদন ও ফূর্তির জন্য। আর এখন মদ পান করা হতো নিজেকে প্রবঞ্চিত এবং তিক্ত বাস্তবতাকে ভুলার জন্য।

মাদায়েনের শাহী মহল সিংহাসন-মুকুট দখলের রণাঙ্গনে পরিণত হয়েছিল। মহলের অভ্যন্তরে নাটকের পর নাটক চলছিল। সিংহাসনে আরোহণ এবং অবতরণের হাস্যময় খেলা চলছিল। সিংহাসনে একজন উঠলে সবাই মিলে তাকে নামানো এবং সম্রাট হওয়ার খায়েশ চিরতরে বন্ধ করে দেয়ার বন্দোবস্ত চলত। এই মহল থেকে এক সময় হযরত খালিদ (রা.) এবং তাঁর বাহিনীর প্রতি বিদ্রুপের এই তীর চালানো হত যে, আরবের বুদ্দু এবং লুটেরাদের পারস্য সাম্রাজ্যে পা রাখার দুঃসাহস কীভাবে হল? তারা এসেছে তো আর জান নিয়ে ফেরৎ যাবে না। মৃত্যুর পরোয়ানা তাদের এখানে টেনে নিয়ে এসেছে। কিন্তু অবস্থা এখন ভিন্ন। বর্তমানের চিত্র হলো, নিজ সাম্রাজ্যে থাকলেও তাদের পায়ের নিচে মাটি ছিল না। অন্যদের উপর প্রতাপ সৃষ্টিকারী সিংহাসন ও রাজমুকুট এখন হযরত খালিদ (রা.) এবং মদীনার মুজাহিদ বাহিনীর প্রতাপে ছিল প্রকম্পিত। শুধু সিংহাসন আর রাজমুকুটই নয়, সমগ্র ইরান সাম্রাজ্য মুসলিম বাহিনীর পদানত হয়েছিল চূড়ান্তভাবে।

মাদায়েনের জন্য এখন পরাজয় আর পিছপা হওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। ৬৩৩ খ্রিস্টাব্দের জুলাইয়ের কোনো একদিন মাদায়েনবাসী আরেকটি পরাজয়ের খবর শোনে। সংবাদদাতা কোনো দূত ছিল না; বরং খোদ শাসনকর্তা শেরযাদ ছিল। শেরযাদের পরাজিত বাহিনীর সংখ্যা ছিল অনেক। তাদের স্বাগত জানায় কিসরার নামকরা সালার বাহমান। সৈন্যদের অবস্থা দেখেই সে অনুমান করে ফেলে যে, চরম পরাজয় বরণ করে তারা এসেছে।

"শেরযাদ!" বাহমান বলে "তোমাদের কাছে হাতিয়ারও নেই। আমি তোমাদের কাছে কী জিজ্ঞাসা করব?"

"আপনাদের জিজ্ঞাসা করাও ঠিক নয়" শেরযাদ ক্লান্ত ও ধরাকণ্ঠে বলে। "আপনারাও তো তাদের সঙ্গে লড়েছিলেন, তখন কি পিছু হটেননি?" "তোমরা কেল্লা পরিবেষ্টিত ছিলে না?" বাহমান জিজ্ঞাসা করে "কেল্লার চারপাশে পরীখা ছিল। মুসলমানরা তো আর উড়ে যায় নি। তাহলে বল, সেসব দীর্ঘ পরীখা তারা কীভাবে পার হয়?"

শেরযাদ বিস্তারিতভাবে জানায় যে, মুসলমানরা তাকে কিভাবে পরাস্ত করেছে।

"আমার সেনাপতি অযোগ্য এবং কাপুরুষ প্রমাণিত হয়েছে" শেরযাদ বলে, "আর আমার একটি ভুল হয় যে, আমি ঈসায়ীদের উপর ভরসা করেছিলাম। আমাকে জানানো হয়েছিল যে, ঈসায়ীরা দূর্দান্ত-দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। কিন্তু বাস্তব কথা হলো, ঈসায়ীরা জানেই না যে, যুদ্ধ কাকে বলে?"

"তোমরা হয়ত এ দিকটা ভাবনি যে, তোমরা পিছপা হয়ে মুসলমানদেরকে নিজেদের পেছন পেছন নিয়ে এসেছ" বাহমান চিন্তিত কণ্ঠে বলে। "আর তোমরা জান না যে, মাদায়েনে কোন খেলা চলছে। ... শাহী পরিবারের সদস্যরা সিংহাসনের উত্তরাধিকারের প্রশ্নে আপোষে রক্তে রঞ্জিত হচ্ছে। পারস্যের ইজ্জত রক্ষাকারী হিসেবে আমরা দু'চারজন সালার বেঁচে আছি মাত্র।"

"যখন সিংহাসন সালারদের ভাগ্যে আসবে, তখন তারাও শাহী খান্দানের মত একে অপরের শত্রু হয়ে যাবে।" শেরযাদ বলে এবং জ্যোতিষীর মত এই মন্তব্য করে, আপনারা কী এখনও অনুমান করেননি যে, পারস্য সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়ে গিয়েছে? আমাদের সূর্য কি অস্তগামী নয়?"

"শেরযাদ!" বাহমান কণ্ঠে ঝাঁঝ এনে বলে,"ঐ শপথের কথা ভুলো না, যা আমরা যরথুষ্ট্রের নামে করেছিলাম যে, পারস্য সাম্রাজ্যকে শত্রুমুক্ত করতে আমরা জীবন বাজি রাখব। ... তোমরা শহর ছেড়ে এখানে চলে এসে ভুল করেছ।"

"কোথায় যেতাম তাহলে?"

"আয়নুত তামার!" বাহমান দৃঢ়কণ্ঠে বলে "আয়নুর তামার এখনও নিরাপদ; বরং এটা আমাদের একটি মজবুত ঘাঁটি। কেল্লাদার মাহরান বিন বাহরাম যেমন লড়তে উস্তাদ তেমনি লড়াতেও পারঙ্গম। বিশ্বস্ত সূত্রে জেনেছি যে, সে ইতোমধ্যে আশেপাশের কতিপয় গোত্রের লোকদেরও নিজ পতাকাতলে আনতে সক্ষম হয়েছে। যদি মুসলমানরা ওদিকে যায়, তাহলে বিষয়টা এমন হবে যে, তারা পাহাড়ের সঙ্গে সংঘর্ষে গিয়েছে। একবার সেখানে গেলে তারা আর জান নিয়ে ফিরতে পারবে না। তারা লাগাতার যুদ্ধ করে চলেছে। তারা তো জিন নয়; মানুষই। তাদের মাঝে আর পূর্বের মত জোশ-প্রেরণা নেই।"

"তবে আমি তাদেরকে উজ্জীবিত দেখেছি" শেরযাদ বলে। "আমি তাদের মাঝে ক্লান্তি আর অবসাদের চিহ্ন পাইনি। ... আর বাহমান, আমার মনে হয় তারা এমন কোনো রহস্যময় প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে লড়াই করে চলেছে, যা তাদের কখনো ক্লান্ত কিংবা হতাশ হতে দেয় না। তারা নিশ্চয় এমন নেশায় বুঁদ, যার কারণে তারা জয় ছাড়া পরাজয়ের কল্পনা করতে পারে না। বীরত্বের সঙ্গে এমন দুর্ধর্ষ লড়াই করা অথবা প্রাণ উৎসর্গ করার পেছনে অবশ্যই কোনো অদৃশ্য শক্তি আছে। নতুবা বছরের পর বছর ধরে এভাবে একটানা লড়াই করা কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব না।"

"আমি এ কথা মানতে নারাজ যে, তাদের আকীদা-বিশ্বাস সাঠিক-সত্য" বাহমান বলে। "তবে একথা বলতে পারি যে, ধর্ম-বিশ্বাসের প্রেরণায় তারা উদ্দীপ্ত, আত্মোৎসর্গিত। আমরা আমাদের সেনাদের মাঝে এই মানসিকতা সৃষ্টি করতে পারিনি।"

"আপনি বলছিলেন, আমাদের আয়নুত তামারে যাওয়া উচিত ছিল" শেরযাদ বলে, "তার থেকে এটা কী ভাল হয় না যে, আমরা আপনাদের সঙ্গে থেকে যাই এবং সিপাহীদের মাঝে সুশৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনে একযোগে মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ি?"

"এ মুহূর্তে তোমাদের আয়নুত তামারে যাওয়াও ঠিক না" বাহমান বলে, "আমাদের ভেবে-চিন্তে অগ্রসর হতে হবে।"

✪

আম্বার শহরের দক্ষিণে ফোরাত নদীর পূর্বে উপকূল হতে কয়েক মাইল ভেতরে আম্বারের মত একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্যিক শহর হলো আয়নুত তামার। বর্তমানে সেখানে শহর-বন্দরের নাম নেই; শুধু একটি ঝর্ণা আছে এই যা। তৎকালে আয়নুত তামারের সঙ্গে বহির্বিশ্বের বাণিজ্যিক যোগাযোগও ছিল। শহরটি ছিল কেল্লা পরিবেষ্টিত। যেমনি শানদার তেমনি মজবুত। এ কেল্লার প্রশাসক ছিলেন মাহরান বিন বাহরাম নামীয় এক পারস্য সালার।

মাহরান গভীরভাবে দেখে আসছিল যে, মুসলিম বাহিনী একের পর এক রণাঙ্গণে পারস্য বাহিনীকে পরাস্ত করে চলেছে। তাদের যাত্রাপথে কোনো কেল্লা পড়লে তারা সেটাকে ছাতুতে পরিণত করে। বিভিন্ন ঘটনায় মাহরান এই দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেয় যে, মুসলমানদের পরাজিত করে পারস্য ইতিহাসে নয়া রেকর্ড সৃষ্টি

করবে। সে স্বীয় বিচক্ষণতার আলোকে অনুধাবন করেছিল যে, পারস্য বাহিনী মুসলমানদের প্রতিরোধে কেবল ব্যর্থই হচ্ছিল না; বরং সিপাহীদের মাঝে মুসলমানদের ব্যাপারে এক চরম ভীতিকর মানসিকতা সৃষ্টি হয়েছিল। এহেন দুর্বল মানসিকতা রোধ এবং সৈন্য সংখ্যা বাড়াতে সে ঈসায়ীসহ অত্র অঞ্চলের সমস্ত গোত্রকে আয়নুত তামারে সমবেত করেছিল।

বনূ তাগাল্লুব, নমর এবং আয়াদ গোত্র ছিল সমবেত গোত্রদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এসব গোত্রের লোক ছিল আরব বেদুঈন। তাদের নেতা ছিল আক্কাস বিন আবী আক্কাহ এবং হুজাইল। দু'জনই ছিল তৎকালীন যুগের সেরা যোদ্ধা। এসব গোত্র জাতিতে আরব হলেও এখন কিসরার প্রজা ছিল। মুসলমানদের বিরুদ্ধে সমবেত হতে তাদেরকে তিনটি বিষয় অনুপ্রাণিত করেছিল। যথা-

১। তারা এটাকে তাদের প্রভুদের খুশি করার অপূর্ব সুযোগ মনে করেছিল।

২। মাহ্রান তাদেরকে অনেক অনেক দামী ও মূল্যবান উপহার দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এবং পারস্যের সব ধরনের সহযোগিতা তারা পাবে বলে আশ্বস্ত করেছিল।

৩। এসব গোত্রের পারস্যের পতাকাতলে সমবেত হওয়ার ব্যাপারে সবচেয়ে যে বিষয়টি মুখ্য ছিল তা হলো, তাদের দৃষ্টিতে মুসলমানরা কেবল সাম্রাজ্য জয়কারী ছিল না; বরং তারা মুসলমানদেরকে তাদের লালিত-পালিত আকীদা-বিশ্বাসের প্রতি হুমকিস্বরূপ জানত। ফলে তারা চিন্তা করেছিল যে, মুসলমানরা যদি জিতে যায়, তাহলে তাদের আকীদা-বিশ্বাস ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়ে তৎপরিবর্তে নতুন আকীদা-বিশ্বাস গ্রহণ করতে তাদের বাধ্য করবে।

এক রাতে আয়নুত তামারে বিশাল ভোজানুষ্ঠান হয়। এটা ছিল বিনোদন অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিল নৃত্যগীত। রাতভর চলে সুন্দরী রূপসী নারীদের নৃত্যমহড়া। দলে দলে এবং এককভাবে চলে নাচ-গানের প্রদর্শনী। কে কত ভঙ্গিমায় শ্রোতা ও দর্শক মাত করতে পারে নৃত্যশিল্পীরা তার প্রতিযোগিতা করছিল। নিজেদের রূপ-যৌবন, যোগ্যতা উজাড় করে তারা দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে প্রয়াস চালাচ্ছিল। ফলে জমে ওঠে নাচ-গানের আসর। আরব বেদুঈন গোত্রপতি এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সৌজন্যে ছিল এই বিনোদন ও ভোজানুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে শরাব চলছিল পানির মত। এমন জমকালো অনুষ্ঠান ও বিনোদন পর্ব আরব বুদ্দুরা স্বপ্নেও দেখেনি। অনিন্দ্য সুন্দরী যুবতীরা তাদের মদ পান করাচ্ছিল এবং তাদের সঙ্গে যৌন সুড়সুড়িমূলক অশ্লীল আচরণ করছিল।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, বেদুঈন নেতাবা যখন মদ ও নারীর নেশায় ডুবে ছিল, তখন তাদের এক নেতা আক্কাহ বিন আবী আক্কাহ শহর প্রধান মাহরান বিন বাহরামকে বলে, তিনি তার বাহিনীকে পেছনে রাখবেন এবং বেদুঈন গোত্ররা সামনে অগ্রসর হয়ে মুসলমানদেরকে আয়নুত তামারের অনেক দূরে আটকে দিবে।

"তোমরা এমনটি ভাল মনে করলে আমি আপত্তি করব না।" মাহরান বলেন, তবে আমাব শংকা হয় যে, তোমাদের গোত্রের লোকজন আমার বাহিনী ছাড়া লড়তে পারবে কিনা।"

"আমরা আরব" আক্কাহ উচ্ছসিত কণ্ঠে বলে "আরবদের সাথে যুদ্ধ করার জ্ঞান কেবল আমরাই রাখি। আরব মুসলমানদের সঙ্গে লড়তে আমাদের সুযোগ দিন। পারস্য বাহিনী তাদের মোকাবেলায় বারবার এসে ব্যর্থ হয়েছে।"

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক তবারী মাহরান এবং আক্কাহ-এর আলোচনা তাদের ভাষায় স্বীয় ইতিহাসে উল্লেখ করেছেন।

"আমি মানি" মাহরান বলে, "আক্কাহ! তোমাদের বীরত্বকে আমি স্বীকার করি। যেভাবে আমরা অনারবীদের মোকাবেলা করতে পারঙ্গম, তেমনি তোমরা আরব জাতিকে প্রতিহত করতে সক্ষম। তোমবা ঐ আরব মুসলমানদের কচুকাটা করতে সামনে এগিয়ে যাও। আমার বাহিনী তোমাদেব আশেপাশেই থাকবে। প্রয়োজন দেখা দিলেই আমরা তোমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসব।"

রাত পেরিয়ে সকাল হয়। প্রত্যুষেই দু'জন সালার মাহরানের কাছে আসে।

"আমরা রাতের বেলায় আপনার এবং আক্কাহ-এর কথাবার্তার মাঝে হস্তক্ষেপ করা ভাল মনে করিনি, রাতের সব আলোচনা হয়েছে নেশার ঘোরে।"

"আমি সম্পূর্ণ সচেতন ছিলাম" মাহরান বলে "বল কী বলতে চাও।"

"আপনি বুদ্দুদের যতখানি গুরুত্ব দিয়েছেন তা আমাদের জন্য শুভ নয়" সালার বলে।

"কেন শুভ নয়?"

"কারণ এর থেকে গোত্রগুলো বুঝবে যে, আমরা মুসলমান দ্বারা ভীত" সালার জবাবে বলে "আমরা এটা বুঝবো যে, আমরা দুর্বল। তারা ততখানি গুরুত্ব পাবার যোগ্য না, যতটুকু আপনি দিয়েছেন।"

"যদি বুদ্দু গোত্রগুলো মুসলমানদের পরাস্ত করে ফেলে" অপর সালার বলে, "তাহলে ফলাও করে প্রচার করা হবে যে, এ জয় তাদের একার। আর যদি পরাস্ত করতে না পারে তাহলে তার অর্থ হবে, আমরা আরেকটি পরাজয়ের শিকার হলাম।"

"আমি তাদেরকে যে গুরুত্ব দিয়েছি পরিশেষে তার ফল ভোগ করবে তোমরাই" মাহরান বলে। "তোমবা কি এ সত্য মান না যে, আমাদের প্রতি আক্রমণ করতে সে ব্যক্তি ধেয়ে আসছে, যে আমাদের নামকরা সেনাপতিদেরকে মৃত্যুর গহ্বরে পৌঁছে দিয়েছে এবং সে ব্যক্তি (হযরত খালিদ) পারস্য সাম্রাজ্যের ভিত্তিকে নড়বড় করে দিয়েছে? আমি এ কথা স্বীকার করতে লজ্জাবোধ করব না যে, তোমাদের পক্ষে খালিদের মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। আমি ভেবে-চিন্তেই ঐ বুদ্দু গোত্রদেরকে সামনে আগ্রসর হওয়ার অনুমতি দিয়েছি। যদি তারা মুসলমানদের পরাজিত করতে পাবে, তাহলে এ বিজয় আমাদেরই হবে। কেননা, তারা তো আমাদেরই প্রজা। পক্ষান্তরে যদি তারা মুসলমানদের পরাস্ত করতে না পারে এবং পিছু হটে যায়, তাহলে আমরা মুসলমানদের উপর ঐ সময় ঝাঁপিয়ে পড়ব, যখন তারা এক বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়ে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়বে আর আমরা হব সম্পূর্ণ তাজাদম।"

মাহরানের কথায় সালাবদ্বয় একজন অপরজনের দিকে তাকায়। চিন্তার স্থানে এখন তাদের চেহারায় আনন্দের ঝিলিক ছিল। শাসকের এই চাল তাদের খুব মনঃপুত হয়। তারা এর মাঝে মুসলমানদের পরাজয়ের স্বপ্ন দেখতে পায়।

✪

হযরত খালিদ (রা.) গুপ্তচর মারফৎ আযনুত তামারে সৈন্য সমাবেশের কথা শুনে আম্বারের ব্যবস্থাপনা দ্রুততাব সাথে সম্পন্ন করে পুরো বাহিনী নিয়ে আয়নুত তামার অভিমুখে যাত্রা করেন। তিনি ফোরাত নদী পার হন এবং অগ্রযাত্রা দ্রুততর করেন। তিনি পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য যাদের আগে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, তারা সংগৃহীত তথ্যাদি দূত মারফৎ হযরত খালিদ (রা.)-এর কাছে পাঠাচ্ছিল।

হযরত খালিদ (রা.) আয়নুত তামার অভিমুখে এগিয়ে চলছিলেন। আয়নুত তামার এখনও ১০ মাইল দূরে ছিল। ইতোমধ্যে গুপ্তচর এবং পর্যবেক্ষক দলের সদস্যরা ফিরে এসে হযরত খালিদ (রা.)-কে জানায় যে, কিছুদূর সামনে এক

বিরাট বাহিনী যাত্রা বিরতি করে অপেক্ষমাণ। তবে এ বাহিনী পারস্যের নয়; বুদ্দু গোত্রগুলোর। এ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক আক্কাহ বিন আবী আক্কাহ। আর তার নায়েবের নাম হুজাইল।

হযরত খালিদ (রা.) এ তথ্য পেয়েই যাত্রা বিরতি করেন এবং পরিস্থিতি দেখতে নিজেই চলে যান। তিনি লুকিয়ে সব কিছু দেখেন। পারস্যবাহিনীর ছায়া তার নজরে পড়ে না। সূত্র সত্য খবরই দেয় যে, এবারের বাহিনীটি ছিল আরব বেদুঈন গোত্রদের। হযরত খালিদ (রা.)-এর বাহিনী সফরের ধারায় বিন্যস্ত ছিল। অভীষ্ট লক্ষ্য এখনও দশ মাইল দূরে থাকায় তারা কাফেলার মত চলছিল। যুদ্ধ বিন্যাসে বাহিনী বিন্যস্ত ছিল না। উদ্দেশ্য ছিল, আয়নুত তামার পৌঁছে শহর অবরোধ করে রাখবেন। কিন্তু পথিমধ্যে মানব প্রাচীর পড়ে, যা মুসলিম বাহিনীর জন্য ছিল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। ঐতিহাসিকগণ বুদ্দু বাহিনীর সংখ্যা লেখেননি। তবে এ কথা ঠিক যে, তাদের সংখ্যা মুসলমানদের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। পারস্যের নিয়মিত বাহিনীর সংখ্যা ছিল এ হিসাবের বাইরে। এ হিসেবে বলা যায়, মুসলমানদের এবারের মোকাবেলা হয় তাদের থেকে প্রায় তিন গুণ বেশি শক্তিশালী শত্রুর সঙ্গে।

হযরত খালিদ (রা.) দ্রুত তার সৈন্যদের তিন ভাগে বিভক্ত করেন। পূর্বের মত তিনি নিজে থাকেন মধ্য বাহিনীতে। অভিজ্ঞ দু'সালার হযরত আসেম বিন আমর (রা.) এবং হযরত আদী বিন হাতেম (রা.)-কে ডান-বাম বাহিনীতে রাখেন। হযরত খালিদ (রা.) সকল সালারদের তলব করেন।

"আমাদের বিন্যাস তেমনই হবে, যেমন সম্মুখ যুদ্ধের প্রত্যেক রণাঙ্গনে থাকে" হযরত খালিদ (রা.) উপস্থিত সালারদের বলেন, "তবে লড়াইয়ের চিত্র হবে ভিন্ন। এবার মধ্য বাহিনী হতে হামলা হবে না। আমার ইশারা পেলেই ডান-বাম বাহিনী দু'পার্শ্ব হতে একযোগে আক্রমণ করবে। শত্রুদেরকে স্বস্থান হতে হটিয়ে বিক্ষিপ্ত করার চেষ্টা করবে। যুদ্ধ পুরোদমে লেগে গেলে হঠাৎ তোমরা স্বীয় বাহিনীসহ পিছু হটে আসবে। যতে করে শত্রুরা বোঝে যে, তোমরা পিছুটান দিচ্ছ। এভাবে একটু পিছিয়ে আবার একযোগে ঘুরে দাঁড়াবে। কিছুক্ষণ পর পর এই কৌশলে লড়াই করতে থাকবে। শত্রুপক্ষকে এমনভাবে ব্যতিব্যস্ত রাখবে যে, তাদের চিন্তা থেকে যেন মধ্যম বাহিনীর কথা হারিয়ে যায়। আমি সরাসরি শত্রুর মধ্য বাহিনীর উপর চড়াও হব, তবে কিছু সময় পরে। তোমরা এই চেষ্টা চালিয়ে যাবে যে, যখন আমি মধ্য বাহিনীতে হামলা চালাব তখন পার্শ্ব বাহিনী এসে যেন তাদের মদদ যোগাতে না পারে।"

"ওলীদের পুত্র!" শত্রুপক্ষ হতে আওয়াজ ভেসে আসে" চোখ খোল ... ভাল করে চেয়ে দেখ, তোর মৃত্যু তোকে কার কাছে টেনে এনেছে। ... আমি আক্কাহ বলছি ... আক্কাহ বিন আবী আক্কাহ।"

"ওলীদের পুত্র আগেই দেখেছে" হযরত খালিদ (রা.) ঘোড়ায় আরোহণ করে এবং রেকাবীতে পা রেখে উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে জবাবে বলেন, "তোর ঘৃণ্য কণ্ঠ শোনা ছাড়াই তোকে দেখেছি। ... তবে কি কিসরার সালারেরা মহলে নাচ-গানে লিপ্ত রয়েছে আর তাদের লড়াই তোরা লড়তে এসেছিস?"

"ইবনে ওলীদ!" আক্কাহ-এর কণ্ঠ আরো জোরালো হয় "তুই কী জিন্দা ফিরে যেতে চাস না?"

"আমি অবশ্যই জীবিত ফিরে যাব" হযরত খালিদ (রা.) গলার সবটুকু জোর একত্র করে বলেন, "আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, তোর দেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করে তবেই যাব।"

হযরত খালিদ (রা.) কথা শেষ করে সালারদের দিকে মুখ ফিরান।

"আল্লাহর কসম!" হযরত খালিদ (রা.) বলেন। "আমি আক্কাহকে জিন্দা ধরব। এরপর তাকে জীবিত রাখব না। ... তোমরা নিজ নিজ বাহিনীর কাছে চলে যাও এবং তাদের বলো যে, আজ তাদের মোকাবেলা দু'টি বাহিনীর সঙ্গে হবে। এক হলো এই বাহিনী যারা তোমাদের সামনে কালো পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে আছে। আর অপরটি হল ইরান বাহিনী, যারা শহরের মধ্যে অথবা অন্য কোথাও আত্মগোপন করে আছে এবং জানা নাই যে, কোন্ দিক থেকে তারা হামলা চালিয়ে বসবে। সবাইকে জানিয়ে দাও যে, আজ যারা পিঠ দেখাবে, তারা আল্লাহকে মুখ দেখানোর উপযুক্ত হবে না।"

ঐতিহাসিকগণ লেখেন, মদীনার বাহিনী উপর্যুপরি লড়ছিল এবং এগিয়ে যাচ্ছিল। তাদের সংখ্যাও ছিল কম। আয়নুত তামারে শত্রুদের যুদ্ধ আহ্বান জানিয়ে তিনি বাহ্যিকভাবে ভুল করেছিলেন। কিন্তু হযরত খালিদ (রা.)-এর চেহারায় স্থিরতা পূর্ববৎ ছিল। সেখানে উদ্বেগের লেশমাত্র ছিল না। শত্রুরা তাকে বারবার যুদ্ধের জন্য আহ্বান জানাচ্ছিল।

হযরত খালিদ (রা.) যুদ্ধ শুরু করার ইঙ্গিত প্রদান করেন। তাঁর ইঙ্গিত পেয়ে এক পার্শ্বের সালার হযরত আসেম বিন আমর (রা.) এবং অপর পার্শ্ব বাহিনীর আমীর হযরত আদী বিন হাতেম (রা.) বুদ্দু গোত্রীয় সৈন্যদের উপর

একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়েন। আক্কাহ বিন আবী আক্কাহ স্বীয় বাহিনীব মধ্য ভাগে ছিল। তার দৃষ্টি ছিল মুসলমানদের মধ্য বাহিনীর প্রতি, যেখানে হযরত খালিদ (রা.) ছিলেন। তার আশা ছিল, রণরীতি মোতাবেক প্রথমে মধ্য বাহিনী হতে হামলা আসবে। কিন্তু হযরত খালিদ (রা.) এ যুদ্ধে উক্ত রীতি পরিহার করে কৌশল পাল্টে নতুন রীতিতে যুদ্ধের সূচনা করেন।

উভয় পক্ষের পার্শ্ব বাহিনীর সৈন্যরা যখন ঘোবতর লড়াইয়ে লিপ্ত হয়ে পড়ে তখন অল্প সময়ের মধ্যেই নিজেদের উড়ন্ত ধুলায় হারিয়ে যায়। ঐ ধূলিঝড়ের মধ্য হতে থেকে থেকে ঘোড়ার আওয়াজ, ঢাল-তলোয়ারের আঘাত পাল্টা আঘাতের ধ্বনি এবং আহতদের গগণভেদী আর্তচিৎকার শোনা যাচ্ছিল। ধূলিঝড়ের মধ্যে কেয়ামত অনুষ্ঠিত হচ্ছিল।

হযরত খালিদ (রা.)-এর নির্দেশনা অনুযায়ী মুসলিম পার্শ্ব বাহিনী যখন নিজেদের একটু পিছিয়ে আনে, তখন বুদ্দু গোত্রগুলো এই ভেবে আত্মতৃপ্ত হয় যে, মুসলমানরা পিছু হটে যাচ্ছে। তারা এটাকে বিজয়ের সূচনা মনে করে জোশ ও খুশিতে নারাধ্বনি দিচ্ছিল। কিন্তু মুসলিম বাহিনী কিছুদূর পিছিয়ে গিয়ে থেমে যায় এবং হঠাৎ এমন তীব্র বেগে আক্রমণ করে যে, শত্রু সৈন্য পিছু হটতে বাধ্য হয়।

মুসলিম বাহিনী আরেকবার পিছু হটে। বুদ্দুরা তাদের তাড়িয়ে দিতে এগিয়ে আসে। এভাবে বারবার করে মুসলমানরা শত্রুপক্ষকে এমনভাবে যুদ্ধে জড়িয়ে দেয় যে, মধ্যবাহিনীর কথা পার্শ্ব বাহিনী বেমালুম ভুলে যায়। ধুলিঝড় এত বেশি ওঠে যে, বুঝা যাচ্ছিল না যে, ভেতরে কি হচ্ছে। হযবত খালিদ (রা.) গভীর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। তাঁর দৃষ্টি আক্কাহর উপর নিবদ্ধ ছিল। সে এই ভেবে অবাক হচ্ছিল যে, মুসলমানদের মধ্য বাহিনী কেন এগিয়ে আসছে না। মুসলমানদের মধ্য বাহিনীর সৈন্যদের ভাব–ভঙ্গি এমন ঢিলেঢালা ছিল, যেন তারা হামলা করতে ইচ্ছুক না।

আক্কাহ বিন আবী আক্কাহ মুসলমানদের মধ্য বাহিনীর এই বেপরোযাভাব দেখে পার্শ্ব বাহিনীব মুসলমানদের কচুকাটা করতে মধ্য বাহিনীর এক বিবাট অংশ পার্শ্ব বাহিনীর সাহায্যে পাঠিয়ে দেয়। হযরত খালিদ (রা.) তাকে এই ধোঁকাই দিতে চান, যে ধোঁকায় সে পা দিয়েছে। সৈন্যদের তিনি বলে রেখেছিলেন যে, আক্কাহকে জিন্দা ধরতে হবে। শত্রুবাহিনীর মধ্য ভাগের সৈন্যসংখ্যা হ্রাস পেলে হযরত খালিদ (রা.) রিজার্ভে রাখা তার মধ্য বাহিনীকে ঝাঁপিয়ে পড়াব নির্দেশ দেন।

আক্কাহর জন্য এই হামলা ছিল অকস্মাৎ এবং অপ্রত্যাশিত। হযরত খালিদ (রা.) বডিগার্ড বাহিনী নিয়ে আক্কাহ এবং তার বডিগার্ডদের ঘিরে ফেলেন। আক্কাহর বডিগার্ডরা প্রাণপণ লড়ছিল। মুসলমানদের কাছে ঘেঁষতে দিচ্ছিল না। আক্কাহ ছিল তাদের মাঝখানে। মুসলিম বাহিনী বুদ্দু গোত্রদের পা উপড়ে দেয়। আক্কাহ পরিস্থিতি আঁচ করে পালানোর পথ খোঁজে।

"আক্কাহ সামনে আয়!" হযরত খালিদ (রা.) তাকে যুদ্ধে নামার আহ্বান জানিয়ে বলেন, "তুই না আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিলি?"

কতিপয় ঐতিহাসিক লিখেছেন, হযরত খালিদ (রা.) আক্কাহকে ধরে ফেলেন। কিন্তু বেশির ভাগ ঐতিহাসিকের লেখা দ্বারা অনুমিত হয় যে, আক্কাহ হযরত খালিদ (রা.)-এর আহ্বানে যুদ্ধ করতে সামনে এগিয়ে আসে। উভয়ে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহী ছিল। ইতিহাস আক্কাহকে প্রখ্যাত যোদ্ধা এবং ঢাল-তলোয়ারের রাজা আখ্যা দিয়েছে। নির্ভরযোগ্য সূত্রের তথ্য হলো, হযরত খালিদ (রা.) এবং আক্কাহর মাঝে কঠিন লড়াই হয়। হযরত খালিদ (রা.)-কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর তরবারী উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। আক্কাহ আক্রমণের সূচনা করে এবং একের পর এক আক্রমণ করে হযরত খালিদ (রা.)-কে বিপদগ্রস্ত করতে চায়। হযরত খালিদ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তার প্রত্যেকটি আক্রমণ প্রতিহত করেন এবং মোক্ষম সুযোগের অপেক্ষায় থাকেন। তিনি সুযোগ পেয়েই আক্কাহকে ঘোড়া হতে ফেলে দেন। তিনি লাফিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে আসেন। আক্কাহ মাটিতে পড়ে নিজেকে সামলে নেয়ার আগেই হযরত খালিদ (রা.)-এর তলোয়ারের অগ্রভাগ আক্কাহর পার্শ্বদেশে গিয়ে ছুঁয়েছিল। পাশাপাশি হযরত খালিদ (রা.)-এর তিন-চারজন বডিগার্ডও বর্শার ফলা আক্কাহর দেহে স্থাপন করেছিল।

আক্কাহ উপায় না দেখে অস্ত্র সমর্পণ করে।

ইতোমধ্যে তার কয়েকজন বডিগার্ড নিহত ও আহত হয়েছিল। যারা প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল তারা পালিয়েছে। ঝড়ের গতিতে এই খবর গোত্রসমূহের সকল সৈন্যের কানে কানে পৌঁছে যায় যে, তাদের প্রধান সেনাপতি অস্ত্র সমর্পণ করেছে। এ গুজবও রটে যায় যে, আক্কাহ মারা গেছে। এদিকে দু'পার্শ্ব বাহিনীর সালারগণও শত্রুপক্ষের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করেছিল। একেতো কোনঠাসা অবস্থা, দ্বিতীয়ত প্রধান সেনাপতি আক্কাহ ধৃত বা নিহত হওয়ার সংবাদ শুনে পার্শ্ব বাহিনীর সৈন্যরাও রণে ভঙ্গ দেয়।

কিছুক্ষণের মধ্যে যুদ্ধের মোড় ঘুড়ে যায়। ঘোরতর যুদ্ধ রূপান্তরিত হয় পলায়ন প্রচেষ্টায়। হীনবল, হতাশ ও নিরাশ হয়ে বুদ্দুরা এক দুইজন করে আয়নুত তামারের দিকে পালিয়ে যায়।

✪

আক্কাহ হযরত খালিদ (রা.)-এর হাতে ধৃত হলেও উদ্বিগ্ন ছিল না। তার আশা ছিল, আয়নুত তামারের ইরান বাহিনী তার সাহায্যে ছুটে আসবে এমনকি হয়ত ইতোমধ্যে এসে পড়েছে। সে মুসলমানদের এই অবস্থা দেখে খুশি হয় যে, তারা পরিশ্রান্ত, ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। হযরত খালিদ (রা.) তাঁর দূতদের ডেকে পাঠান।

"সকল সালার এবং কমান্ডারদের কাছে এই বার্তা পাঠাও যে, বুদ্দু বাহিনীর পিছুটানকে যেন এখনই চূড়ান্ত বিজয় মনে না করে" হযরত খালিদ (রা.) দূতদের উদ্দেশে বলেন, "এখন যেন গনীমতের মালের দিকে না তাকায়। আরেকটি ফৌজ আসছে। তারা সম্পূর্ণ সতেজ এবং তাজাদম। তাদের মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত হও।"

এটা কারো জানা ছিল না যে, মাহরানের সৈন্যরা ময়দানে নেমে আসবে নাকি আয়নুত তামারে কেল্লাবৃত অবস্থায় লড়বে। এ বাহিনীর গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য মুসান্না বিন হারেছা তার গেরিলা বহরের সঙ্গে আয়নুত তামার পর্যন্ত প্রত্যন্ত এলাকায় তৎপর ছিলেন। তিনি সেখান থেকে হযরত খালিদ (রা.)-কে বারবার একই বার্তা পাঠান যে, ইরানীদের কোনো সৈন্য নজরে পড়ছে না। অবশেষে হযরত খালিদ (রা.)-এর কাছে তার এই বার্তা পৌঁছে যে, আক্কাহর গোত্রীয় সৈন্যরা ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় পালিয়ে আয়নুত তামারে আশ্রয় নিচ্ছে।

মুসান্না বিন হারেছার গেরিলা দলটি পলায়নপর বুদ্দু গোত্রদের পশ্চাদ্ধাবন করে তাদের হত্যা করতে থাকে।

আক্কাহের পূর্বে কয়েকজন পরাজিত সৈন্য আয়নুত তামারে পৌঁছলে তাদেরকে মাহরানের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়।

"তোমরা মৃত্যুর ভয়ে পালিয়ে এসেছ" মাহরান তাদের বলে "তোমরা কি জান না যে, এখানেও তোমাদের জন্য মৃত্যু অপেক্ষমান?" এরপর তিনি নির্দেশ দেয় যে, "যাও এদের নিয়ে হত্যা করে ফেল।"

"কতজনকে হত্যা করবেন?" এক বৃদ্দু জিজ্ঞাসা করে।

প্রথমে আক্কাহকে হত্যা করুন। সে-ই প্রথমে অস্ত্র সমর্পণ করে পুরো বাহিনীর মাঝে কাপুরুষতা ছড়িয়ে দিয়েছে।" আরেক বৃদ্দু বলে। "মুসলমানরা যে কৌশলে যুদ্ধ করে, তা আমাদের সর্দার ধরতেই পরেনি" আরেকজন বলে।

এরপর তারা পুরো যুদ্ধের বিবরণ এমনভাবে বর্ণনা করে যে, মাহরান তা শুনে ঘাবড়ে যায়। মুসলমানদের জোশ-প্রেরণা, কৌশল, বীরত্বগাঁথা তারা অনেক অনেক বাড়িয়ে বলে এবং এই তথ্য জানায় যে, যেসব সৈন্য প্রাণে বেঁচে গেছে তারা আত্মরক্ষার জন্য শহর পানে ছুটে আসছে।

"তবে কী আমাদের জন্য এটাই ভাল হবে না যে, আমরা মুসলমানদের সেখানে নিয়ে গিয়ে হত্যা করব যেখানে তাদের দম ফুরিয়ে গেছে?" মাহরান তার সালারদের বলেন, "এরপর তারা পিছু হটারও অবকাশ পাবে না?"

"আপনি চিন্তা করে একথা বলছেন?" এক সালার জানতে চেয়ে বলে "এত বড় শহর ছেড়ে চলে গেলে সেটা পিছুটানই হবে। এর চেয়ে এ কথা বলুন যে, মুসলমানদের ভয়ে আপনি ভীত হয়ে পড়েছেন এবং আপনি এখান থেকে পালিয়ে যেতে চান।"

"আমি যা ভাবি তা তোমাদের ভাবনায় আসার কথা নয়" মাহরান শাসক সুলভ কণ্ঠে বলেন, "আমি এখানকার শাসক। যাও, আমার পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষা কর।"

সালাররা নীরবে চলে যায় শহরের প্রতিরক্ষা ছিল সালারদের দায়িত্ব। তারা শহরকে মুসলমানদের হাতে তুলে দেয়ার পরিবর্তে লড়াই করে মৃত্যুবরণ করাকে শ্রেয় জ্ঞান করত। তারা নিজেরা মিলে সিদ্ধান্ত নেয় যে, তারা মাহরানের এই নির্দেশ মানবে না।

রণাঙ্গন হতে পালিয়ে আসা বনু তাগাল্লুব, নমর এবং আয়াদের লোকজন টলতে টলতে শহরের দরজা দিয়ে প্রবেশ করছিল। তারা দশ মাইল দূর থেকে সফর করে এসেছিল। পুরো সফর হয় এক ধরনের ভীতি ও আতঙ্কের মধ্য দিয়ে। তাদের কেউ কেউ আহতও ছিল।

"কচুকাটা কেটেছে ... সবাইকে গাজর-মূলার মত কেটেছে।" পালিয়ে আসা সৈন্যরা ঘাবড়ানো অবস্থায় বলছিল "তাদের সামনে দাঁড়াবার শক্তি কারো নেই। বড়ই দুর্ধর্ষ এবং দূর্দান্ত।"

"আক্কাহ বিন আবী আক্কাহ মারা গেছে" এভাবে বলে বলে তারা শহরময় ভীতি ছড়াচ্ছিল "হুজাইলের কোনো হদিস নেই।"

"দরজা বন্ধ করে দাও" অনেকে চিল্লাতে থাকে "তারা আসছে।"

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, পূর্ব হতেই অগ্নিপূজারীদের মাঝে মুসলমানভীতি সক্রিয় ছিল। মুসলমানরা তাদের নামকরা বীর যোদ্ধাদের হত্যা করেছিল। এখন আয়নুত তামারের লোকজন চাক্ষুষভাবে দেখছিল যে, যুদ্ধবাজ গোত্রগুলো কেমন করুণ অবস্থায় ফিরে আসছে। ফলে ঝড়ের বেগে শহরবাসীরদের মাঝে মুসলিম ভীতি কয়েকগুণ বৃদ্ধি পায়। তারা কাঁপতে শুরু করে। শহরে শাহী সৈন্যের কোনো কমতি ছিল না। কিন্তু তাদের মানসিক অবস্থা ঐ দুর্বল ও ভীত কুকুরের মত হয়ে যায়, যে দাপুটে কুকুরের ভয়ে লেজ দু'পায়ের মাঝে চালান দেয়।

শহরের সালাররা যখন স্বীয় বাহিনীর এই হতাশ মানসিকতা দেখেন তখন তাদের আর শহর প্রধান মাহরানের পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষা করার প্রয়োজন পড়ে না। তারা এটাও জানতে পারেন যে, মাহরান ধনভান্ডার মাদায়েন পাঠিয়ে দিচ্ছেন। শহরের লোকজনও নিজেদের ধন-সম্পদ লুকাচ্ছে অথবা সঙ্গে নিয়ে শহর ছেড়ে যাচ্ছে।

হযরত খালিদ (রা.)-এর সমরনীতির একটি বড় বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, তিনি রণাঙ্গনে শত্রুকে পরাভূত করার পাশাপাশি তাদের মানসিকতায় আঘাত করে এত দুর্বল করে দিতেন যে, তাদের মধ্যে লড়ার প্রেরণা নিস্তেজ হয়ে যেত। অগ্নিপূজারীদের মানসিক অবস্থা এত দুর্বল হয়ে গিয়েছিল যে, হযরত খালিদ (রা.), মুসলমান অথবা মদীনার নাম শুনলেই ভয়ে তারা পেছনে ফিরে দেখত, না জানি কোনো মুসলমান তাদের পেছনে আছে কিনা!

✪

ঐ সময় জলদি এসে যায় যখন রণাঙ্গনে অগণিত লাশ এবং আহত বেহুঁশ সৈন্যরা পড়ে ছিল এবং তাদের দলিত-মথিত করার জন্য ঐ ঘোড়া রয়ে গিয়েছিল, যা সওয়ারী ছাড়া নিয়ন্ত্রণহীণভাবে ছুটে বেড়াচ্ছিল। বুদ্দু গোত্রীয় লোকেরা নেতাদের ফেলে রেখে আয়নুত তামারে চলে যায় এবং শহরে ঢুকে শহরের ফটক বন্ধ করে দেয়। তারা শহরে পৌঁছে মাতম করে বলতে থাকে যে, প্রতিশ্রুতি মোতাবেক মাহরানের সৈন্যরা তাদের সাহায্য করেনি। কিন্তু সেখানে তাদের মাতম শোনার কেউ ছিল না। ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় শুধু সেসব শহরবাসী

ছিল, যাদের পলায়ন করার সামর্থ ছিল না। মাহরান ইতিপূর্বেই সৈন্য-সামন্তসহ শহর ছেড়ে চলে গিয়েছিল। সে সৈন্যদের মাদায়েন নিয়ে যাচ্ছিল এবং আক্কাহ, হুজাইলসহ গোত্রীয় অন্যান্য নেতাদের অভিশাপ দিচ্ছিল।

"শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন কর" হযরত খালিদ (রা.) সিপাহীদের নির্দেশ দেন "আহতদের দেখা-শুনা করার জন্য কিছু লোক এখানে থাক আর বাকীরা দ্রুত এগিয়ে গিয়ে আয়নুত তামার অবরোধ কর।"

ঠিক তখনি মুসান্না বিন হারেছা ঘোড়া ছুটিয়ে হযরত খালিদ (রা.)-এর কাছে আসেন এবং তাঁর সামনে এসে ঘোড়া থেকে নেমে তাঁর সাথে সিনা মিলান।

"ওলীদের পুত্র!" মুসান্না বলেন, "আল্লাহ পাকের কসম দিয়ে বলছি, আয়নুত তামার ছেড়ে শত্রুরা পালিয়েছে।"

"তোমার মাথা ঠিক আছে তো?" হযরত খালিদ (রা.) জিজ্ঞাসা করেন "এ কী বলছ যে, শত্রুরা ময়দান ছেড়ে পালিয়ে গেছে।"

মুসান্না বিন হারেছা হযরত খালিদ (রা.)-কে অবহিত করেন যে, তিনি গুপ্তচরদের আয়নুত তামার পর্যন্ত ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তারাই জানিয়েছে যে, শহরে থাকা পারস্য বাহিনী শহর ছেড়ে চলে গেছে।

"তুমি কি বুঝ না যে, এই বাহিনী আমাদের পশ্চাৎ হতে তখন আক্রমণ করবে, যখন আমরা আয়নুত তামার অবরোধ করে রাখব?" হযরত খালিদ (রা.) বলেন।

"ইবনে ওলীদ!" মুসান্না বলেন, "মাহরানও সৈন্যদের সঙ্গে চলে গেছে। যদি এ বাহিনী আশেপাশে কোথাও লুকিয়ে থাকত, তাহলে আমার গেরিলা বাহিনী তাদের সুস্থির থাকতে দিত না ... সামনে চলুন এবং নিজের চোখে গিয়ে দেখুন। আয়নুত তামার আপনার পদতলে এখন।"

"সৈন্যরা শহর ছেড়ে পালিয়েছে" এই খবর মুজাহিদ বাহিনীর কানে পৌঁছলে তাদের ক্লান্ত-অবসন্ন দেহ চাঙ্গা হয়ে যায়। তারা বিজয়ের খুশিতে নারাধ্বনি দিতে দিতে ১০ মাইল পথ পাড়ি দিয়ে আইনুত তামারে গিয়ে পৌঁছে। মুসান্নার যেসব লোক সেখানে পূর্ব হতে ছিল তারা জানায় যে, শহরের সমস্ত দরজা বন্ধ।

হযরত খালিদ (রা.)-এর নির্দেশে অবরোধ সম্পন্ন হয়। বুদ্দু, ঈসায়ী এবং যারা শহরে আত্মরক্ষার্থে আশ্রয় নিয়েছিল তারা প্রতিরোধে এগিয়ে আসে। তারা শহররক্ষা পাঁচিলের উপরে উঠে তীর বর্ষণ করা শুরু করে।

"আক্কাহ বিন আবী আক্কাহসহ অন্যান্য যুদ্ধবন্দীদের সামনে আন" হযরত খালিদ (রা.) নির্দেশ দেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে সমস্ত যুদ্ধকয়েদীদের সামনে আনা হয়। হযরত খালিদ (রা.) আক্কাহ এর হাত ধরেন এবং তাকে এতখানি আগে নিয়ে যান, পাঁচিলের উপর থেকে আসা তীর যেখানে গিয়ে বিদ্ধ হতে পারত।"

"এই তোমাদের নেতা!" হযরত খালিদ (রা.) অত্যন্ত জোর গলায় বলেন, "তোমরা তাকে বড় বীর-বাহাদুর মনে করতে। সে পারস্যবাসীদের সঙ্গে তোমাদের মিত্রতা সৃষ্টি করেছে। এখন তোমদের সেসব বন্ধুরা কোথায়?" হযরত খালিদ (রা.) আক্কাহকে সামনে এগিয়ে দিয়ে বলেন, "তার কাছে জিজ্ঞাসা কর যে, মাহরান তার সৈন্যদের বাঁচিয়ে কোথায় নিয়ে গেছে।"

এরপর অনেক কয়েদীকে সামনে আনা হয়।

"এরা তোমাদের ভাই!" হযরত খালিদ (রা.) বলেন, "চালাও তীর; সবগুলোই তাদের বক্ষে বিদ্ধ হবে।"

এ খবর কিভাবে যেন সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ে যে, কেল্লার বাইরে মুসলমানরা বনূ তাগাল্লুবসহ অন্যান্য গোত্রের কয়েদীদের এনেছে। ঐ কয়েদীদের মধ্য হতে অনেকের স্ত্রী, সন্তান এবং আত্মীয়-স্বজন শহরে ছিল। যদিও তাদের বসতি শহরে ছিল না, কিন্তু তাদের নিরাপত্তার জন্য শহরে এনে রাখা হয়েছিল। যুদ্ধ চলাকালীন সময় নিজস্ব বসতিতে থাকা তাদের জন্য নিরাপদ মনে করা হয়েছিল না। সেসব মহিলা এবং বাচ্চারা যখন জানতে পারে যে, তাদের গোত্রের কয়েদীরা বাইরে এসেছে, তখন মায়েরা সন্তানদের কোলে নিয়ে শহরের প্রাচীরে চলে আসে। রণাঙ্গনে গমনকারীদের মধ্য হতে যারা ফিরে আসেনি, তাদের স্ত্রী, বোন, মা এবং কন্যারা এই আশায় পাঁচিলের উপর এসেছিল যে, হয়ত তাদের আপনজন কয়েদীদের মধ্যে থাকবে।

এসব নারীরা পাঁচিলের উপর হাঙ্গামা শুরু করেছিল। তারা নিজেদের লোকদের খুঁজছিল। যারা তাদের লোককে কয়েদীদের মধ্যে দেখতে পায় না, তারা আহাজারি করছিল। তীরন্দাযরা তাদের সরিয়ে দিতে চাচ্ছিল কিন্তু তারা সরতে চাচ্ছিল না।

"আমরা তোমাদেরকে বেশি সময় দিব না" হযরত খালিদ (রা.)-এর নির্দেশে তার এক মুজাহিদ উচ্চকণ্ঠে বলে। "অস্ত্র সমর্পণ কর এবং দরজা খুলে দাও। যদি প্রতিরোধে গিয়ে তোমরা পরাজিত হও এবং জোরপূর্বক আমাদের ঢুকতে হয় তাহলে তোমাদের পরিণাম হবে খুবই ভয়াবহ।"

"দুই-তিন শর্তে আমরা দরজা খুলতে প্রস্তুত" পাঁচিলের উপর হতে আওয়াজ আসে। "তোমাদের কোনো শর্ত মানা হবে না।" হযরত খালিদ (রা.)-এর পক্ষ হতে জবাব যায় "অস্ত্র সমর্পণ কর, দরজা খুলে দাও– এর মধ্যেই তোমাদের নিরাপত্তা।"

বনূ তাগাল্লুব এবং তাদের সমমানের গোত্রগুলোও জানে, তাদের জন্য এটাই ভাল যে, অস্ত্র সমর্পণ করা হবে এবং দরজা খুলে দেয়া হবে। ফলে তারা সামান্য মতবিনিময় করে দরজা খুলে দেয় আর মুসলমানরা শহরে প্রবেশ করে। তৎযুগের লিখনী হতে জানা যায় যে, মুসলমানরা তাদের কথা রাখে। তারা একজনকেও পেরেশান করে না। অবশ্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে যেসব বুদ্দুরা যুদ্ধ করেছিল, তাদেরকে যুদ্ধবন্দী বানানো হয়। তবে তাদের আত্মীয়দের এই সুযোগ দেয়া হয় যে, উপযুক্ত মুক্তিপণ দিয়ে তাদের মুক্ত করে নিয়ে যাবে।

সারা শহরে তল্লাশী চালানো হয়। শহরে একটি ইবাদাতখানা বা দীক্ষালয় ছিল, যেখানে পাদ্রী হওয়ার দীক্ষা দান করা হত। সে সময় চল্লিশজন নবযুবক শিক্ষার্থী ছিল। তাদের সবাইকে বন্দী করা হয়। পরে তাদের বেশির ভাগই ইসলাম কবুল করেছিল। তাদের মধ্য হতে একজন ইসলামী ইতিহাসের এক মহান ব্যক্তিত্বের পিতা হওয়ার সৌভাগ্য লাভ হয়েছিল। সে যুবকটির নাম ছিল নাসীর। সে ইসলাম কবুল করে এবং মুসলিম রমণীকে বিবাহ করে। যাদের ঔরসে জন্ম হয় মূসা বিন নাসীর এর। এই মূসা বিন নাসীর পরবর্তীতে উত্তর আফ্রিকার শাসক নিযুক্ত হন। তিনিই তারিক বিন যিয়াদকে স্পেন বিজয় করার জন্য প্রেরণ করেছিলেন।

কিছু গোঁড়া ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, হযরত খালিদ (রা.) বনূ তাগাল্লুব, নমর এবং আয়াদের ঐ সমস্ত লোকদের হত্যা করে ফেলেন, যারা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। এটা একটা বিভ্রান্তিকর তথ্য, যা হযরত খালিদ (রা.)-এর সুনামকে দুর্নামে পরিণত করার জন্য মনগড়াভাবে লেখা হয়। বেশিরভাগ ঐতিহাসিক এমন ব্যাপক হত্যাযজ্ঞের কিঞ্চিত ইশারাও দেননি। মুহাম্মদ হুসাইন

হায়কাল একাধিক ঐতিহাসিকের বরাত দিয়ে লিখেছেন যে, শুধু আব্দাহ বিন আবী আব্দাহকে খোলা ময়দানে নিয়ে এসে হযরত খালিদ (রা.) নিজের ওয়াদা রক্ষার করার জন্য তার মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেন।

হযরত খালিদ (রা.) ঘোষণা করেছিলেন যে, বুদ্দুরা যদি নিঃশর্তে অস্ত্র সমর্পণ করে তাহলে তারা ভয়াবহ পরিণতি থেকে নিরাপদ থাকবে। শত্রুপক্ষ মুসলমানদের কথায় অস্ত্র ত্যাগ করেছিল। ফলে তাদের গণহত্যার প্রশ্নই আসে না।

✪

আইনুত তামার বিজয়ের পর হযরত খালিদ (রা.) সর্বাগ্রে এই কাজটি করেন যে, আম্বার এবং আয়নুত তামারের মালে গণীমত একত্রিত করে মুজাহিদদের মাঝে বন্টন করে দেন। খেলাফতের অংশ আলাদা করে ওলীদ বিন উকবাকে দায়িত্ব দেয়া হয় সেগুলো মদীনায় নিয়ে গিয়ে আমীরুল মুমিনীনের কাছে পেশ করার জন্য। হযরত খালিদ (রা.) আমীরুল মুমিনীনের নামে একটি পত্রও প্রেরণ করেন।

ওলীদ বিন উকবা মদীনায় পৌঁছে আমীরুল মুমিনীন হযরত আবু বকর (রা.)-কে আম্বার এবং আয়নুত তামারের যুদ্ধ ও বিজয়ের পূর্ণ বিবরণ শোনান। গণীমতের মাল পেশ করেন এবং হযরত খালিদ (রা.)-এর পত্রটি তার হাতে তুলে দেন।

পাঠককে ইতোপূর্বেই জানানো হয়েছে যে, খলীফাতুল মুসলিমীন আবু বকর (রা.) হযরত খালিদ (রা.)-এর প্রতি এই নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন যে, তিনি যেন আয়াজ বিন গনামের অপেক্ষায় হীরায় অবস্থান করেন। তখন আয়াজ দাওমাতুল যান্দালে লড়ছিলেন। তবে লড়াইয়ের অবস্থা সালার আয়াজের অনুকূলে ছিল না। উদ্ভূত পরিস্থিতি বিবেচনা করে হযরত খালিদ (রা.) খলীফার নির্দেশ উপেক্ষা করে হীরা থেকে যাত্রা করে প্রথমে আম্বার অবরোধ করে বিজয় অর্জন করেন। অতঃপর আয়নুত তামারে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে অবশেষে বিজয় লাভ করেন।

হযরত খালিদ (রা.) পত্রে জানান যে, তিনি যদি হীরায় বসে থাকতেন তাহলে ইরান বাহিনী পরাজয় কাটিয়ে উঠা এবং জবাবী হামলা করার জন্য

সুযোগ পেয়ে যেত। হযরত খালিদ (রা.)-এর চেষ্টা এই ছিল যে, দুশমনেরা যেন কোথাও সুস্থির হয়ে বসার এবং জবাবী হামলা পরিচালনা করার সুযোগ না পায়। তারা ইরান বাহিনীকে মানসিকভাবে আক্রমণ করে দুর্বল ও পর্যুদস্ত করে দেয়। হযরত খালিদ (রা.) খলীফার নির্দেশ অমান্য করলেও বাস্তবতা দেখিয়ে প্রমাণ করে দেন যে, এই উপেক্ষার ভীষণ প্রয়োজন ছিল। হযরত খালিদ (রা.) পরপর বিশাল দু'টি বাহিনীর মোকাবেলা করে তাদের পরাজিত করে বিজিত এলাকায় ইসলামী শাসন কায়েম করলেও তখন পর্যন্ত সালার আয়াজ বিন গনাম দাওমাতুল যান্দাল রণাঙ্গণে আটকা পড়েছিলেন। তার বিজয়ের সম্ভাবনা ছিল খুবই কম।

"খালিদ যা ভাল বুঝেছে তাই করেছে" খলীফা হযরত আবু বকর (রা.) পত্রবাহক ওলীদ বিন উকবাকে বলেন "তার চিন্তা এবং অবস্থানই সঠিক ছিল। আয়াজের পক্ষ থেকে যে তথ্য আসছে তা আশাব্যঞ্জক নয়। দাওমাতুল যান্দাল জয় করা আমাদের জন্য জরুরী ছিল। কিন্তু এখন আয়াজের ব্যাপারে আমি উদ্বিগ্ন। ... ইবনে উকবা, তুমি আয়নুত তামারে না গিয়ে দাওমাতুল যান্দালে যাও এবং সেখানকার বাস্তব অবস্থা জেনে খালিদের কাছে যাবে। তাঁকে বলবে, সে যেন আয়াজের সাহায্যে দ্রুত পৌঁছে যায়।

ওলীদ বিন উক্‌বা রওনা হয়। ওদিকে বাস্তবিকই হযরত আয়াজ (রা.) পেরেশান ছিলেন। তাঁর সঙ্গে থাকা সালাররা তাকে বলছিল, উদ্ভূত পরিস্থিতি উত্তরণের জন্য অবিলম্বে সাহায্যের প্রয়োজন। অন্যথায় পরাজয়ের আশংকা সুস্পষ্ট। সালারদের সঙ্গে পরামর্শের পর হযরত আয়াজ বিন গনাম (রা.) হযরত খালিদ (রা.) বরাবর একটি পত্র পাঠান। পত্রে তিনি যুদ্ধের অবস্থা তুলে ধরেন এবং সাহায্যের প্রয়োজনীয়তার কথা লিখেন।

ওদিকে ওলীদ বিন উকবাও হযরত আয়াজ (রা.)-এর কাছে পৌঁছে যান। তার সেখানে পৌঁছানো সহজ ছিল না। মদীনা হতে দাওমাতুল যান্দালের দূরত্ব ৩০০ মাইলের কিছু কম ছিল। বেশির ভাগ এলাকা ছিল মরুভূমি। তার পরও তিনি স্বাভাবিকের চেয়ে কম সময়ে পৌঁছান। ৩০০ মাইল পাড়ি দিয়ে ওলীদ যখন আয়াজ (রা.)-এর কাছে পৌঁছান তখন তার অবস্থা ছিল বেগতিক। তারপরও তিনি আরামের চিন্তা না করে আয়াজ (রা.)-এর পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন।

"আমি সাহায্যের জন্য গতকালই খালিদ বরাবর পত্র পাঠিয়েছি" আয়াজ (রা.) ওলীদ বিন উকবাকে বলেন, "জানি না সে নিজে কোন্ অবস্থায় আছে। কিন্তু আমার জন্য এ ছাড়া কোন উপায় নেই। তুমিও অবস্থা স্বচক্ষে দেখছ।"

"আলহামদুলিল্লাহ!" ওলীদ বলে "হযরত খালিদ (রা.) অগ্নিপূজারীদের সাম্রাজ্য এবং তাদের সমর শক্তির মূলোৎপাটন করে দিয়েছেন। আমীরুল মু'মিনীন আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন আপনার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে তাঁকে জানানোর জন্য। কিন্তু এখন দেখছি আপনার আশু মদদ দরকার। আমি মদীনায় যাওয়া মুলতবী করে আয়নুত তামারে যাচ্ছি। হযরত খালিদ (রা.) আপনার সাহায্যে ছুটে আসবেন।"

ওলীদ বিন উকবা হযরত আয়াজ (রা.)-কে আশ্বস্ত করেই ঘোড়া ছুটিয়ে দেন। রণাঙ্গণের অবস্থা আশঙ্কাজনক থাকায় তিনি মুহূর্তকাল দেরী করেননি। ৩০০ মাইল পথ পাড়ি দিয়ে এসে বিশ্রাম না করেই আবার রওনা হয়ে যান। তিনি চাইলে দিব্যি আরাম করতে পারতেন। বিশ্রামাগারে নিজেকে ছুঁড়ে দিতে পারতেন। আবার ৩০০ মাইলের মরুভূমির সফরের পথ না ধরে ধীরে-সুস্থে মদীনায় গিয়ে খলীফা আবু বকর (রা.)-এর সাথে দেখা করতে পারতেন। কিন্তু না; কর্তব্যবোধ তাকে নতুন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করে। পরাজয়ের চিন্তা তাকে দেউলিয়া বানিয়ে দেয়। নিজের ফিকির, ঘোড়ার আরাম, মুহাফিজদের ক্লান্তি ইত্যাদির প্রতি নজর দেয়ার সুযোগ তার হয় না। গ্রীষ্ম মৌসুম হওয়া সত্ত্বেও মরুভূমির বন্ধুর পথে তিনি অশ্ব ছুটিয়ে দেন। ঘোড়ার মুখ এখন আয়নুত তামারের দিকে। এটা ছিল ৬৩৩ খ্রিস্টাব্দের আগষ্ট মাসের ঘটনা।

✪

দাওমাতুল যান্দাল প্রখ্যাত বাণিজ্যিক নগরী ছিল। দূর-দূরান্তের বণিকরা এখানে আসা-যাওয়া করত। বাণিজ্যিক কারণ অথবা অন্যান্য কারণে শহরটি ধন-সম্পদ, হীরা-জওহারে ভরপুর ছিল। রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই শহর এবং আশে-পাশের শহরগুলোর ভৌগোলিক অবস্থান দেখে এটা জয় করতে একবার সৈন্য পাঠিয়েছিলেন। সে গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধটি ইতিহাসে তাঁবুক নামে খ্যাত। তখন দাওমাতুল যান্দালের শাসক এবং কেল্লাপতি ছিলেন উকাইদার বিন আব্দুল মালিক। তিনি বীরত্বের সঙ্গে মুসলমানদের মোকাবেলা করেছিলেন। হযরত খালিদ (রা.)-ও সে যুদ্ধে শরীক ছিলেন। তিনি অসাধারণ বীরত্ব দেখিয়ে

শাসক উকাইদারকে জীবিত গ্রেফতার করেছিলেন। তাকে গ্রেফতারের পর তার বাহিনী অস্ত্র সমর্পণ করেছিল। উকাইদার বিন আব্দুল মালিক বন্দী হয়ে নবীজীর আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছিলেন এবং আমৃত্যু অনুগত থাকার শপথ করেছিলেন। তিনি এক পর্যায়ে ইসলামও গ্রহণ করেছিলেন। এমনিভাবে প্রখ্যাত বাণিজ্যিক নগরীটি সেদিন মুসলমানদের অধীনে চলে এসেছিল।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর ধর্মান্তরের ফেৎনা তুফানের গতিতে প্রবাহিত হয়। সেই স্রোতে উকাইদারও ভেসে যায়। সে মুরতাদ হয়ে যায় এবং মদীনার অধীনতা অস্বীকার করে নিজেকে স্বাধীন শাসক ঘোষণা করে। তিনি দাওমাতুল যান্দালকে স্বতন্ত্র রাজ্য বানিয়ে নিজেকে তার স্বাধীন রাজা হিসেবে প্রতিপন্ন করেছিলেন। দাওমাতুল যান্দালের কিছু বাসিন্দা ঈসায়ীও ছিল। মূর্তিপূজকও ছিল। ঈসায়ীদের শক্তিধর ও প্রভাবশালী গোত্রের নাম ছিল কালব।

আমীরুল মু'মিনীন হযরত আবু বকর (রা.) উকাইদার বিন মালিককে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে এবং তাকে পুনরায় মদীনার অনুগত ও অধীন বানাতে সালার হযরত আয়াজ বিন গনাম (রা.)-এর নেতৃত্বে একদল সৈন্য পাঠিয়েছিলেন। দাওমাতুল যান্দালে পৌঁছে হযরত আয়াজ (রা.) নিজের বাহিনীকে অত্যন্ত স্বল্পসংখ্যক পান এর বিপরীতে প্রতিপক্ষ ছিল যেমনি সংখ্যায় দুই-তিন গুণ বেশি, তেমনি সবাই অস্ত্র সজ্জিত এবং দুর্ধর্ষ। কিন্তু মদীনা হতে তিনশত মাইল দূরে এসে শুধু সংখ্যার স্বল্পতার কারণে ফেরৎ যাওয়া ভাল ছিল না। এদিকে দাওমাতুল যান্দাল শহরটি ছিল উঁচু ও মজবুত প্রাচীর পরিবেষ্টিত।

আয়াজ (রা.) শহর অবরোধ করেন। কিন্তু অবরোধ পূর্ণাঙ্গ ছিল না। এক দিকের রাস্তা উন্মুক্ত ছিল। রাস্তা খালি পেয়ে উকাইদারের সৈন্যরা বাইরে বের হয়ে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করত। কিছুক্ষণ লড়াই চলত। অবস্থা বেগতিক হয়ে এলে সৈন্যরা পালিয়ে কেল্লার মধ্যে চলে যেত। এ হামলা ছাড়াও প্রাচীরের উপর থেকে মুসলিম বাহিনীর উদ্দেশ্যে তীর বর্ষণ অব্যাহত ছিল। মুসলমানরাও তীর বর্ষণ করে পাল্টা জবাব দিত। তারা কেল্লার দরজা ভাঙ্গতেও কয়েকবার চেষ্টা করে, কিন্তু ফটক ছিল ধারণাতীত মজবুত।

খণ্ডকালীন ও বিক্ষিপ্ত যুদ্ধে মুসলমানদের পাল্লাই ভারী ছিল। কিন্তু এক সময় পাশা পাল্টে যায়। যুদ্ধের নিয়ন্ত্রণ মুসলমানদের হাত থেকে খসে যায়। যুদ্ধ চলে

যায় প্রতিপক্ষের হাতে। এর বড় কারণ ছিল পশ্চাৎ আক্রমণ। কালব গোত্রের ঈসায়ীরা অতর্কিতে পেছন দিক থেকে এসে মুসলমানদের ঘিরে ফেললে যুদ্ধের চিত্র পাল্টে যায়। তারা প্রবল বেগে অগ্রসর হয়ে জোরদার হামলা চালায় আর মুসলমানরা জীবন বাজি রেখে হামলা প্রতিহত করে এবং তাদের পিছু হটিয়ে দিতে থাকে। মুসলমানদের তুফানের গতি এবং দূর্বার বীরত্ব দেখে ঈসায়ীদের হামলা হ্রাস পেলেও তারা মুসলমানদের ঘেরাও করে রেখেছিল। যাতে তারা পিছু হটতে না পারে এবং রসদ ইত্যাদি কমে গিয়ে পেরেশান হয়ে অস্ত্র সমর্পণ করে। হযরত আয়াজ (রা.) এই ব্যবস্থা নিয়ে রেখেছিলেন যে, একটি স্থানে চলাচলের রাস্তা উন্মুক্ত রেখেছিলেন এবং সে স্থানটি দেখাশুনার জন্য লোক নিযুক্ত করেছিলেন।

কালব গোত্র কর্তৃক মুসলমানদের ঘেরাও করে রাখা– মুসলিম বাহিনীর জন্য খুবই বিপদজনক ছিল। ইতোমধ্যেই তাদের সৈন্যদের প্রাণহানির সংখ্যাও অনেক হয়ে গিয়েছিল। প্রতিদিন আহত ও শহীদদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ফাঁদে আটকে গিয়ে জয়ের পরিবর্তে এখন মুসলমানরা আত্মরক্ষার জন্য লড়ছিল। মুসলমানদের পরাজয় ছিল সুস্পষ্ট। তারা প্রতিদিন পরাজয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। যতই দিন যাচ্ছিল পরাজয়ের শংকা ততই বাড়ছিল। মুসলিম সেনাপতিসহ সালারদের কাছেও পরাজয়ের বিষয়টি ছিল সময়ের ব্যাপার মাত্র।

✪

হযরত খালিদ (রা.) আয়নুত তামার বিজয় করেই সেখানে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হয়েছিলেন। তিনি কয়েকদিনের মধ্যেই প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা সুসম্পন্ন করেন। প্রশাসক নিয়োগ ও তাদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেন। কয়েকদিনের মধ্যে শহরবাসীদের বিশ্বাস হয়ে যায় যে, মুসলমানরা ধর্মের ব্যাপারে তাদের উপর চাপ প্রয়োগ করছে না। তাদের অধিকার হরণ করছে না। তাদের মেয়েদের প্রতি কুনজর করছে না। তাদের জান-মাল-ইজ্জত সম্পূর্ণ অক্ষত এবং পুরোপুরি নিরাপদ। ফলে তারা আন্তরিকভাবে ইসলামী হুকুমতের অনুগত হয়ে যায়।

হযরত খালিদ (রা.)-এর সকাশে হযরত আয়াজ বিন গনাম (রা.)-এর দূত এসে পৌছে। দূত সালাম পর্ব শেষে আয়াজের পত্র হস্তান্তর করে। হযরত আয়াজ (রা.) যে ফাঁদে আটকা পড়েছেন পত্রে তার কথা লেখা ছিল। বিস্তারিত বর্ণনা

করে শোনায় দূত। এর পরের দিনই ওলীদ বিন উকবাও এসে পৌঁছেন। তিনি হযরত খালিদ (রা.)-কে বলেন, প্রতিটি ক্ষণ আয়াজ ও তার মুজাহিদ বাহিনীকে পরাজয় ও মৃত্যুর গহ্বরের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে।

"পরাজয়?" হযরত খালিদ (রা.) কণ্ঠে আবেগ ঢেলে বলেন, "আল্লাহর কসম! ইসলামের ইতিহাসে 'পরাজয়' শব্দটি সংযুক্ত না হওয়াই কাম্য। ... উকাইদার বিন আব্দুল মালিক কি আমার কথা ভুলে গিয়েছে? সে কি আমাদের নবীজীকে ভুলে গিয়েছে, তিনি তাকে আনুগত্য স্বীকার বাধ্য করেছিলেন? সে কি আমাদের আল্লাহর কথা ভুলে গিয়েছে, যিনি আমাদেরকে তার বিরুদ্ধে বিজয় দান করেছিলেন?"

ইতিহাস সাক্ষী যে, মানুষ নিজেই বদলে যায়; আল্লাহ বদলান না। আল্লাহ তায়ালা বিজয়কে পরাজয়ে তখন বদলে দেন, যখন মুসলমানরা বদলে যায় এবং বান্দারা হয়ে যায় 'খোদা'।

হযরত খালিদ (রা.) আয়াজ বিন গনাম (রা.)-কে তার পত্রের লিখিত জবাব দেন। তৎযুগে আরবদের লেখার ধরন হত কাব্যিক। ঐতিহাসিকগণ লিখেন, হযরত খালিদ (রা.)-এর জবাব ছিল কাব্যাকারে। তাঁর পত্রের মর্ম ছিল এরূপ–

"খালিদ বিন ওলীদের পক্ষ হতে আয়াজ বিন গনামের নামে। আমি আপনার কাছে দ্রুতগতিতে আসছি। আপনার কাছে বহু উটনী আসছে, যাদের পিঠে কালো-সোনালী বিষধর সর্প উপবিষ্ট। ফৌজ আসছে, যাদের পশ্চাতে এবং সামনে রয়েছে আরও ফৌজ। একটু সবর করুন। অশ্ব বাতাসের গতিতে ছুটে আসছে। তার পিঠে নাঙ্গা তলোয়ার হাতে সিংহ আসীন। একের পর এক ফৌজ আসছে আর আসছে।"

জবাবী পত্র দূতের হাতে তুলে দিয়ে হযরত খালিদ (রা.) তাকে বলেন, যত দ্রুত এসেছ তার চেয়ে আরও অধিক দ্রুততার সাথে দাওমাতুল যান্দালে গিয়ে পৌঁছবে এবং সালার আয়াজকে সান্ত্বনা দিবে। যাও, রওনা হয়ে যাও। এরপর তিনি তার এক নায়েব সালার উয়াইম বিন কাহেল আসলামীকে ডেকে পাঠান।

"ইবনে কাহেল আসলামী" হযরত খালিদ (রা.) বলেন, "তুমি কী জান তোমাকে কত বড় দায়িত্ব দিতে যাচ্ছি?"

"আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে ঐ জিম্মাদারী যথাযথ পালনের হিম্মত ও যোগ্যতা দান করেন, যা আমার কাঁধে সোপর্দ করা হচ্ছে।" উয়াইম বলে "আমার সে জিম্মাদারী কী ইবনে ওলীদ?"

"আয়নুত তামার" হযরত খালিদ (রা.) বলেন, "তার রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিরাপত্তার দায়িত্ব তোমার। অভ্যন্তর হতে বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে। বাহির থেকেও হামলা আসতে পারে। আমি তোমাকে আমার স্থলবর্তী বানিয়ে দাওমাতুল যান্দাল যাচ্ছি। আয়াজ বিন গনাম সমস্যার মধ্যে আছে।

"আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন" উয়াইম বলে "আয়নুত তামারকে আল্লাহর নিরাপত্তায় মনে করুন।"

হযরত খালিদ (রা.)-এর সঙ্গে প্রথম দিকে যত পরিমাণ সৈন্য ছিল এখন তা ছিল না। শহীদ হয়ে যাওয়ার কারণে কিছু কমে গিয়েছিল আর বেশি কম হওয়ার কারণ ছিল, প্রত্যেক বিজিত এলাকায় বেশ কিছু সংখ্যক সৈন্য তাকে রেখে আসতে হয়েছিল। এ ধারাবাহিকতায় আয়নুত তামার পর্যন্ত এসে তার সৈন্য সংখ্যা অর্ধেকে নেমে এসেছিল। আয়নুত তামারের মুসলিম বাসিন্দাদের দ্বারা সৈন্য বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু এর সংখ্যাও বেশি ছিল না। কিছু নবমুসলিমও ফৌজে ভিড়েছিল। কিন্তু তখন পর্যন্ত তাদের উপর নির্ভর করার মত অবস্থা সৃষ্টি হয়নি।

হযরত খালিদ (রা.) আয়নুত তামারের জন্যও কিছু সৈন্য রাখেন। অবশিষ্ট ছয় হাজার অশ্বারোহী সাথে নিয়ে দাওমাতুল যান্দাল অভিমুখে রওনা হয়ে যান। দূরত্ব ছিল ৩০০ মাইল।

✪

হযরত খালিদ (রা.) উড়ে উড়ে চলতে থাকেন। তাঁর অশ্বারোহী বাহিনীও পাল্লা দিয়ে চলছিল। ফলে ৩০০ মাইলের পথ মাত্র দশ দিনে তারা অতিক্রম করেন। তিনি পথিমধ্যে থাকতেই উকাইদারের লোকেরা তাদের দেখে ফেলে।

হযরত খালিদ (রা.) পৌছানোর পূর্বেই তারা উকাইদারকে জানিয়ে দেয় যে, এক মুসলিম বাহিনী ঝড়োগতিতে ছুটে আসছে। কোনো কোনো ঐতিহাসিক এ তথ্যও লিখেছেন যে, দাওমাতুল যান্দালবাসী এটাও জানতে পেরেছিল যে, আগত বাহিনীর সেনাপাতি হলেন হযরত খালিদ (রা.)।

পূর্বে হতেই ঈসায়ীদের তিনটি বড় গোত্র বনূ কালব, বনূ বাহরা এবং বনূ গাসমান–উকাইদারের নেতৃত্বে যুদ্ধে শরীক হয়েছিল। খালিদ বাহিনী আসার সংবাদ শুনে সে দ্রুততার সাথে ঈসায়ী ও মূর্তিপূজকদের ছোট ছোট গোত্রদেরও যুদ্ধে শরীক হওয়ার জন্য দাওয়াত দিয়েছিল। হযরত খালিদ (রা.) পৌঁছানোর পূর্বেই এসব ক্ষুদ্র গোত্রগুলো তাদের সৈন্য পাঠাতে শুরু করে।

হযরত খালিদ (রা.) তুফানের মত এসে হাজির হন। তার নির্দেশে মুজাহিদ বাহিনী উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে জোরে জোরে নারাধ্বনি দিতে শুরু করে। হযরত আয়াজ বিন গনাম (রা.)-এর বাহিনী এই নারাধ্বনি শুনে তারাও নারাধ্বনি দেয়। এই নারাধ্বনিতে তাদের ঝিমিয়ে পড়া মনোবল চাঙ্গা হয়ে যায়। হযরত খালিদ (রা.) দাওমাতুল যান্দালে পা দিয়েই রণাঙ্গণ পর্যবেক্ষণ করেন এবং ঘোড়ায় চড়ে কেল্লার চতুর্দিক প্রদক্ষিণ করেন। কেল্লার পাঁচিলের উপর দাঁড়ানো সৈন্য তাঁর দৃষ্টিতে পড়ে।

শত্রু বাহিনী দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। একাংশের সেনাপতি ছিল উকাইদার নিজে আর অপর অংশের সেনাপতি ছিল যুদী বিন রবীয়া। উকাইদার ছিল কেল্লার মধ্যে আর যুদী ছিল কেল্লার বাইরে। বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোত্র হতে আসা সৈন্যরাও যুদীর বাহিনীতে এসে জমা হয়। এরা ছিল সম্পূর্ণ চাঙ্গা ও তাজাদম।

✪

হযরত খালিদ (রা.) গযব ও ভয়ঙ্করের অপর নাম ছিলেন। তাকে শত্রুপক্ষ সাক্ষাত যমদূত মনে করত। তিনি প্রথমেই শত্রুদের মানসিকতায় জোর আঘাত হেনে মনোবল গুঁড়িয়ে দিতেন। শত্রুরা তাঁর কাছ থেকে দৈহিক আঘাতের চেয়ে মানসিক চোট পেত বেশি। ফলে দৈহিক ক্ষত শুকালেও হৃদয়ক্ষরণ কখনো বন্ধ হত না। 'খালিদ-ত্রাস' তাদের কুরে কুরে খেত।

হযরত খালিদ (রা.) ইতোপূর্বে উকাইদারকে একবার উচিৎ শিক্ষা দিয়েছিলেন, যার কথা এতদিন পর উকাইদার ভোলেনি। খালিদ আসছেন এই খবরে তার পিলে চমকে গিয়েছিল। সে যুদ্ধের চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে মুছে আত্মরক্ষার ফিকিরে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। হযরত খালিদ (রা.) যখন রণাঙ্গনে ঘুরছিলেন আর কেল্লার অভ্যন্তরে প্রবেশ করার পরিকল্পনা সাজাচ্ছিলেন তখন কেল্লার অভ্যন্তরে চলছিল আরেক খেলা। উকাইদার ঈসায়ী নেতাদের ডেকে এনে তাদের সামনে প্রস্তাব পেশ করছিল যে, খালিদের সঙ্গে লড়াই করার দরকার নেই, সন্ধি করা হোক। কিন্তু ঈসায়ী নেতৃবৃন্দ তার কথা সমর্থন করছিল না।

"আমার বন্ধুগণ!" প্রায় সকল ঐতিহাসিক উকাইদারের এই ভাষ্য লিখেছেন, "খালিদকে আমি যতটুকু চিনি আপনারা তা চেনেন না। আমি বলতে পারব না যে, তার এই শক্তির উৎস কী। তবে এটা সত্য যে, সমস্ত রণাঙ্গনে ভাগ্য তার পক্ষেই থাকে। রণজয় এবং কেল্লা কব্জা করার যে গুণ তার মধ্যে আছে তা আর কারো মাঝে নেই। খালিদের মোকাবেলায় তার সামনে যে-ই আসে– চাই সবল হোক বা দুর্বল– সে তাঁরই হাতে কচুকাটা হয়ে যায়। আপনারা আমার পরামর্শ মেনে নিন এবং তাঁর সঙ্গে সন্ধি করুন।"

ঈসায়ীরা বিভিন্ন ময়দানে হযরত খালিদ (রা.)-এর হাতে চরম নাকানি-চুবানি খেয়েছিল। তাই তারা তাকে ছেড়ে দিতে চায় না। প্রতিশোধ নিতে চায়।

"আপনারা তার সঙ্গে লড়তে গেলে হেরে যাবেন" উকাইদার বলে, "তখন সে আপনাদের উপর বিন্দুমাত্র দয়া করবে না। পক্ষান্তরে যুদ্ধ বাদ দিয়ে সন্ধি করা হলে সে আপনাদের জান-মাল ও নারীদের ইজ্জতের নিরাপত্তা দান করবে। আপনারা তার সঙ্গে মোকাবেলায় নেমে টিকতেই পারবেন না। কেননা, আপনারা তার চাল বুঝতেই পারবেন না।"

"আমরা বিনা লড়াইয়ে পরাজয় মেনে নিব না" ঈসায়ী নেতৃবৃন্দ সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়।

"তাহলে আমাকে বাদ দিয়েই আপনাদের লড়তে হবে" উকাইদার বলে, "আমি এত বড় শহর ধ্বংস হতে দিব না।"

বৈঠক শেষ হয়। ঈসায়ী নেতারা যুদ্ধের নিয়তে স্থান ত্যাগ করে। উকাইদারের ব্যাপারে তাদের এর থেকে বেশি জানা ছিল না যে, সে লড়তে ইচ্ছুক নয়।

রাতের প্রথম প্রহর। হযরত খালিদ (রা.)-এর সালার আসেম বিন আমর কেল্লার উন্মুক্ত এলাকা দিয়ে পায়চারি করছিলেন। তিনি রাতের আঁধারে কেল্লা হতে চার-পাঁচজন লোককে বের হতে দেখতে পান। অন্ধকারে তাদেরকে ছায়ার মত মনে হচ্ছিল। আসেম বিন আমরের সঙ্গে কয়েকজন মুহাফিজ ছিল। আসেম তাদেরকে বলে, এদের ঘেরাও করে ফেল।

কিভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ঘেরাও সম্পন্ন করতে হয়, তা মুহাফিজদের ভালভাবে জানা ছিল। তারা ফাঁদ পেতে চিড়িয়া ধরার আগেই নিজেরাই এসে ধরা দেয়। সালার আসেম তাদের দিকে এগিয়ে যান।

"আমি দাওমাতুল যান্দালের শাসক উকাইদার বিন মালিক" তাদের মধ্য হতে একজন বলে।

"নিজের ও সঙ্গীদের হাতিয়ার আমার লোকদের হাতে তুলে দাও" আসেম নির্দেশের সুরে বলেন।

"আমাকে খালিদের কাছে নিয়ে চল" উকাইদার তার তলোয়ার এক মুহাফিজের হাতে উঠিয়ে দিতে দিতে বলে "আমি লড়াই করব না। খালিদের সঙ্গে সন্ধির ব্যাপারে কথা বলব।"

✪

"আমি তোমাকে ক্ষমা করতে পারি না ইবনে আব্দুল মালিক।" হযরত খালিদ (রা.) স্বীয় তাঁবুতে উকাইদারের কথা শুনে বলেন "তুমি শুধু আমার কাছেই দোষী নও; মহাপাপী আমার রাসূলের নিকট। তুমি আল্লাহর রাসূলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছ। তুমি ইসলাম গ্রহণ করে পুনরায় মুরতাদদের নেতাদের সাথে গিয়ে মিলিত হয়েছ।"

উকাইদার আত্মপক্ষ সমর্থন করতে অনেক কিছু বলে। জীবন বাঁচাতে বহু হাদিয়া -উপহার পেশ করে। ঈসায়ী গোত্রদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার অঙ্গীকার করে।

"যদি এই লড়াই আমার আর তোমার মধ্যকার বিষয় হতো, যদি এই শত্রুতা ব্যক্তিগত হতো, তাহলে তোমাকে ক্ষমা করতে আমার কোনো বাধা ছিল না" হযরত খালিদ (রা.) বলেন "কিন্তু তুমি আমার রসূল, আমার ধর্মের দুশমন। আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে মাফ করতে পারিনা। তোমাকে বেঁচে থাকার অধিকার দিতে পারি না।"

এরপর হযরত খালিদ (রা.) নির্দেশ দেন যে, "একে নিয়ে যাও। আগামীকালের সূর্য যেন তার চেহারা না দেখে।"

রাতেই উকাইদারের কল্লা উড়িয়ে দেয়া হয়।

সকাল হতেই হযরত খালিদ (রা.) হযরত আয়াজ বিন গনাম (রা.) কে ডেকে পাঠান। তিনি এলে তাকে বলেন, এখন থেকে আপনি স্বীয় বাহিনীর সেনাপতি নন। তিনি আয়াজ (রা.)-এর বাহিনীকে নিজের কমাণ্ডে নিয়ে নেন।

"এখন যুদ্ধ হবে কেল্লার বাইরে" হযরত খালিদ (রা.) তাঁর সালারদের বলেন।

"এত মজবুত কেল্লার উপর সময় ও শক্তি ব্যয় করা অনর্থক হবে। প্রথমে সে সব শত্রু খতম করতে হবে, যারা বাইরে আছে।"

হযরত খালিদ (রা.) পুরো বাহিনীকে বিন্যস্ত করেন। হযরত আয়াজ (রা.)-এর মুজাহিদদের মধ্যে যারা নওজোয়ান ছিল তাদের পৃথক করে ঐ দিকে পাঠিয়ে দেয়া হয়, যেদিকে একটি রাস্তা আরবমুখী ছিল। হযরত খালিদ (রা.) নওজোয়ান দলকে বলে দেন যে, এদিক দিয়ে শত্রুরা পালাবার চেষ্টা করবে। একজনকেও জিন্দা বের হতে দিবে না।

হযরত খালিদ (রা.) একটি দল নিজের কমাণ্ডে নিয়ে এক ঈসায়ী নেতা যুদী বিন রবীয়ার মোকাবেলায় রাখেন। হযরত আয়াজ (রা.)-কে কিছু সৈন্য দিয়ে অপর দুই শত্রুনেতা ইবনে হাদারযান এবং আল আয়হাম বাহিনীর সামনে দাঁড় করিয়ে দেন। স্বীয় দুই সালার আসেম বিন আমর এবং আদী বিন হাতেমকে সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী দুই পার্শ্ব বাহিনী হিসেবে রাখেন।

ঈসায়ী ও মূর্তিপূজক সালাররা কেল্লার ভেতর থেকে প্রচুর পরিমাণ সৈন্য বাইরে নিয়ে আসে। এভাবে শত্রু বাহিনীর সংখ্যা মুসলমানদের কয়েক গুণ বেশি হয়ে যায়।

যুদ্ধ শুরু হয়। হযরত খালিদ (রা.) ছিলেন সমরকুশলী। তিনি চাল পরিবর্তন করে করে লড়তেন। রণাঙ্গন হিসেবে তার রণনীতি ভিন্ন হত। তাঁর কৌশলী রণনীতির কাছে বেশিরভাগ প্রতিপক্ষ ধরাশায়ী হত। এ যুদ্ধেও হযরত খালিদ (রা.) এমন চাল চালেন, যে চালে দুশমন পেরেশান হয়ে যায়। এবার তিনি এই চাল চালেন যে, যুদ্ধের ময়দানে নিরব-নিস্তব্ধ হয়ে যান। নীরবে ঠাঁই দাঁড়িয়ে থাকেন। শত্রুরা এই অপেক্ষায় থাকে যে, মুসলমানরা প্রথমে আক্রমণের সূচনা করবে। কিন্তু মুসলমান মূর্তির মত অনড় হয়ে থাকে। ঈসায়ী সেনাপতি যুদ্ধের জন্য অস্থির হয়ে পড়ছিল। যখন সময় অনেক চলে যাওয়া সত্ত্বেও এবং তাদেরকে যুদ্ধের প্রতি আহবান জানালেও তারা সাড়া দেয় না, তখন শত্রুরা আর দেরী সহ্য করতে না পেরে হযরত আয়াজ (রা.)-এর বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এ দৃশ্য দেখে যুদীও হযরত খালিদ (রা.)-এর বাহিনীর উপর আক্রমণ করে।

হযরত খালিদ (রা.) তাঁর সালারদের দেয়া নির্দেশনা অনুযায়ী মুজাহিদ বাহিনীর প্রতি শত্রুরা তেড়ে এলেও তাদের মাঝে কোনো ভাবান্তর হয় না। মুসলমানদের এই মূর্তিবৎ অবস্থা দেখে শত্রুপক্ষ আরও জ্বলে ওঠে। শত্রুসৈন্যরা মুসলমানদের কাতারে ঢুকে পড়লে তারা তাদের গতিরোধ না করে রাস্তা দিয়ে দেয়। ব্যাপারটি অনেকটা এমন ছিল, আঘাত কর আর সামনে এগিয়ে যাও।

মুসলিম বাহিনীর নির্লিপ্ততার রহস্য প্রথমদিকে ঈসায়ীরা বুঝে উঠতে পারে না। তারা নেচে নেচে মুসলিম বাহিনীর কাতারে ঢুকতে থাকে। হঠাৎ তাদের চোখ খুলে যায়। তারা বুঝে ফেলে যে, তারা মুসলমানদের পাতা ফাঁদে আটকে গেছে। ইতিমধ্যে হযরত খালিদ তার মুহাফিজদের নিয়ে (রা.) শত্রু বাহিনীর সর্বাধিনায়ক যুদী বিন রবীয়াকে ঘিরে ফেলে। যুদীর সঙ্গে তার গোত্রের কতিপয় যুবক ছিল। যুদ্ধে তারা মারা যায় আর যুদী জ্যান্ত গ্রেফতার হয়।

হযরত খালিদ (রা.) পুরো বাহিনীকে যেভাবে বিন্যস্ত করেছিলেন সেটাই ছিল দুশমনদের জন্য একটি বড় ফাঁদ। শত্রুসেনারা যে দিক দিয়েই পালাত সেদিক দিয়েই মুসলমানদের তলোয়ার ও বর্শা তাদের গতিরোধ করছিল। পরিশেষে তারা কেল্লার দিকে ছোটে কিন্তু কেল্লা ছিল বন্ধ। মুসলমানরাও তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে কেল্লার দিকে আসে এবং তাদের সেখানে পেয়ে মূলা-গাজরের মত কাটতে থাকে। এভাবে দেখতে দেখতে দরজার সামনে ঈসায়ী ও মূর্তিপূজকদের লাশের স্তূপ হয়ে যায়।

কেল্লার আরেকটি দরজা ছিল। নিজের লোকদের আশ্রয় দিতে কেল্লাবাসী তা খুলে দেয়। দরজা খোলা পেয়ে ঈসায়ী ও মূর্তিপূজকরা প্রবেশ করতে থাকে। কিন্তু বেরসিক মুসলমানরা তাদের পিছু ছাড়ে না। তারাও তাদের সাথে কেল্লার মধ্যে ঢুকতে থাকে। ফলে এই অবস্থা হয়ে যায় যে, শত্রুদের একজন ভেতরে ঢুকলে তার সঙ্গে দুইজন মুসলমান ভেতরে চলে যেত।

ঈসায়ী ও মূর্তিপূজকদের কমান্ড ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। ওদিকে মুসলমানরাও কেল্লার মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। ফলে এখন কেল্লার মধ্যে যা হচ্ছিল তাকে লড়াই বলা যায় না; বরং তা ছিল এক ধরনের গণহত্যা ও ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ। হযরত খালিদ (রা.) চান যে, গণহত্যার ধারা অব্যাহত থাকুক।

এটা ছিল ৬৩৩ খ্রিস্টাব্দের আগষ্ট মাসের শেষের দিকের ঘটনা। হযরত খালিদ (রা.) যুদ্ধ শেষে যুদী বিন রবীয়াসহ শত্রুপক্ষের সমস্ত সালারদের একে একে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। দাওমাতুল যান্দাল মুসলমানদের অধিকারে চলে আসে। হযরত খালিদ (রা.)-এর হাতে দ্বিতীয়বারের মত দাওমাতুল যান্দাল বিজিত হয়।

✪

ইসলামের সমর নীতির উদ্দেশ্য ছিল দেশে দেশে আল্লাহর রাজ কায়েম করা, জমিনের বুকে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা। শত্রু নিধন কিংবা তাদের শক্তি খতম করার লক্ষ্যে ইসলামে 'জিহাদের পর্ব' সূচিত হয়নি। কেউ আনুগত্য স্বীকার করে নিলে কিংবা নির্ধারিত হারে কর প্রদান করলে ইসলাম তার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেনি।

ইরানের অগ্নিপূজারীরা মুসলিম ঝাণ্ডাবাহীদের হাতে যেভাবে একের পর এক পরাজিত হয়েছে এবং যেভাবে রণাঙ্গনে নাকানি-চুবানি খেয়েছে, তা অন্য কোনো জাতি হলে বরদাশত করতে পারত না। কিন্তু ইরানে মুসলমানদের মোকাবেলায় শুধু অগ্নিপূজারীরা ছিল না; বরং সমস্ত অমুসলিমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল, যাদের সিংহভাগ ছিল আরব বংশোদ্ভূত ঈসায়ীরা। বিভিন্ন রণাঙ্গনে হেরে ইরানীরা এবার কৌশলী ভূমিকা গ্রহণ করে। তারা নিজেরা সামনের সারিতে না থেকে বিভিন্ন গোত্রীয় সৈন্যদের সামনে রাখা শুরু করে। যেমন মাহরান আয়নুত তামার ময়দানে করেছিল। অগ্নিপূজারীদের সালাররা পালিয়ে পালিয়ে মাদায়েন গিয়ে জড় হতে থাকে।

ইরানী নামকরা সালার বাহমান যখন মাহরানকে স্বসৈন্যে ফিরে আসতে দেখে তখন তার অন্তরে এত আঘাত লাগে যে, তিনি কথা বলতে ভুলে যান। তার মুখ বন্ধ হয়ে যায়।

"বাহমান! ঘাবড়ে যেও না" মাহরান প্রথমে মুখ খুলে বলে "অন্তর সংকুচিত করো না। পরিশেষে বিজয় আমাদেরই হবে। আমি পরাজিত হয়ে আসিনি; পরাজয় হয়েছে বুদ্দু গোত্রগুলোর।"

"আর তুমি লড়াই না করেই ফিরে এসেছ" সালার বাহমান উত্তেজিত কণ্ঠে বলে। "তুমি এত বড় শহরকে শত্রুদের ঝুলিতে ফেলে দিয়ে এসেছ? তোমার ভাগ্য ভাল যে, এখানে তোমাকে শাস্তি দেয়ার মত এখন কেউ নেই। শাস্তি যারা দিবে, তারা নিজেরাই গৃহযুদ্ধে লিপ্ত। তারা কোনো সম্রাটকে বাঁচতে দিচ্ছে না। কেউ সিংহাসনের অধিকারী হলেই সবাই মিলে তাকে গুম-হত্যা করে ফেলছে। রক্তের হোলিখেলা চলছে এখন রাজপুরীতে।

"বাহমান!" মাহরান ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলে "তুমি আমাকে ধমক দিচ্ছ? তুমি কি মুসলমানদের হাতে পরাজিতদের একজন নও? তুমি যদি দৃঢ় হয়ে ময়দানে থাকতে, তবে মদীনাবাসীরা এভাবে আমাদের মাথায় চেপে বসার সাহস ও সুযোগ পেত না। পরাজয়ের সূচনা তোমার থেকেই হয়েছে। কটাক্ষ না করে বরং আমার প্রশংসা কর এ কারণে যে, আমি সৈন্যদের বাঁচিয়ে নিয়ে এসেছি। আমি এই সৈন্য নিয়ে একদিন মুসলমানদের পরাজিত করব। মাদায়েনে বর্তমানে যত সৈন্য জমা হয়েছে তাদের নিয়ে আমরা একটি চূড়ান্ত লড়াইয়ে অবতীর্ণ হব।"

মাদায়েনে বর্তমানে যেসব সালার ছিল প্রত্যেকেই কোনো না কোনো রণাঙ্গনে হযরত খালিদ (রা.)-এর হাতে পরাজিত হয়েছিল। বর্তমানে তারা যুদ্ধ করাকে জাতিগত বিষয়ে রূপ দিয়েছিল। নতুবা সেখানে নির্দেশ দেয়ার মত কেউ

ছিল না। হুকুমদাতা শাহী পরিবারের লোকেরা সিংহাসনের উত্তরাধিকারের প্রশ্নে মুখোমুখি ছিল। কেউ কাউকে ছাড় দিতে চাচ্ছিল না। সকল যুবরাজ রাজমুকুটের নেশায় পাগল ছিল। প্রতিযোগিতায় কেউ এগিয়ে গিয়ে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলে দু'দিন বাদেই তাকে লাশে পরিণত হতে হত। অনেক যুবরাজ মতলব হাসিলে সালারদের ব্যবহার করতে চেষ্টা করছিল। কিন্তু সালাররা সাম্রাজ্য হেফাজতের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেয়। কয়েকজন সালার মিলে ইরান সাম্রাজ্যকে পতনের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। তারাই মূলত পতোন্মুখ সাম্রাজ্য ধরে রেখেছিলেন। নতুবা কিসরার রাজপ্রাসাদ হেলে পড়েছিল এবং তা এখন ভূপতিত হওয়ার উপক্রম।

হযরত খালিদ (রা.) মাদায়েন হতে ৪০০ মাইল দূরে দাওমাতুল যান্দালে অবস্থান করছিলেন। অগ্নিপূজারী ও ঈসায়ীদের এই খবর ছিলনা যে, তিনি বর্তমানে আয়নুত তামারে নেই। হযরত খালিদ (রা.) হীরায় ফিরে যেতে চাচ্ছিলেন। কেননা বিজিত এলাকা হীরার ব্যবস্থাপনা উন্নত করার প্রয়োজন ছিল। দ্বিতীয়ত মুজাহিদ বাহিনীর বিশ্রামেরও দরকার ছিল। তৃতীয়ত সৈন্যদের নতুন করে ঢেলে সাজাবারও প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। একের পর এক যুদ্ধে ব্যস্ত থাকার কারণে এ সব দিকে মন দেয়ার সুযোগ তাঁর হয়ে ওঠেনি।

✪

মুজাহিদদের দু'টি দল সক্রিয় ছিল। একদল প্রত্যক্ষভাবে বিভিন্ন ময়দানে হযরত খালিদ (রা.)-এর নেতৃত্বে বীরবিক্রমে যুদ্ধ করছিল। আরেক দল ছদ্মবেশে শত্রুদের বিভিন্ন শহরে গোপনীয়ভাবে তৎপর ছিল। এরা ছিল গুপ্তচর বাহিনী। তারা সর্বক্ষণ জীবনের ঝুঁকিতে থাকত। যে কোন মুহূর্তে ধরা পড়ে প্রাণ হারাবার সম্ভাবনা ছিল তাদের। তারপরও তারা জীবন হাতে নিয়ে নিজেদের দায়িত্ব পালন করত। তাদের কাজ ছিল শত্রুদের গতিবিধি দেখা এবং ইচ্ছা-পরিকল্পনা জেনে কখনো লোক মারফৎ, কখনো নিজেরা ঝুঁকি নিয়ে এসে প্রাপ্ত তথ্য জানাত। ইতিহাসে এই গুপ্তচরদের কারো নাম লেখা হয়নি। তাদের মধ্য হতে অনেকে ধৃত হয়ে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। এই বাহিনীর প্রেরিত খবরে হযরত খালিদ (রা.) কয়েকবার দুশমনের অতর্কিত হামলা এবং পরাজয় থেকে রক্ষা পান।

হযরত খালিদ (রা.) দাওমাতুল যান্দালে এলে বিজিত এলাকায় আশংকাজনক অবস্থা সৃষ্টি হয়। মাদায়েনে কিসরার পরাস্ত ও বিপর্যস্ত বাহিনী

পর্যুদস্ত হয়ে ছিল। লোকজন ছিল ভীত-সন্ত্রস্ত। কিসরার সেসব তলোয়ারে জং পড়ে গিয়েছিল যাদের ঝলক ইতিপূর্বে দূর-দূরান্তে পৌঁছে গিয়েছিল। তবে দু'-চারজন সালার তখনও ডুবন্ত তরীকে তুফানের কবল থেকে রক্ষা করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করে যাচ্ছিল।

চলমান এ অবস্থায় এক অশ্বারোহী মাদায়েনে প্রবেশ করে এবং সোজা বাহমানের কাছে চলে যায়।

"আর কোন দুঃসংবাদ বাকী আছে যা তুমি এনেছ?" বাহমান তাকে জিজ্ঞাসা করে "তুমি কোথা হতে এসেছ? মুসলিম বাহিনী কী মাদায়েন অভিমুখে রওনা দিয়েছে?"

"না" আগন্তুক বলে "মুসলিম বাহিনী চলে গেছে।"

"চলে গেছে?" বাহমান ঝাঁঝালো কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে "মনে হচ্ছে তুমি সে সৈন্যদের একজন মুসলমানভীতি যাদের পাগল বানিয়ে দিয়েছে। তুমি কী জান না যে, তোমার এই বিভ্রান্তিকর খবরের শাস্তি একমাত্র মৃত্যুদণ্ড?"

আগন্তুক ঘোড়া থেকে নেমে পড়েছিল। তার আসার খবরে বাহমান বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। সে লোকটিকে নিয়ে গিয়ে ভেতরে বসতে দেয়ার মত যোগ্য মনে করছিল না। মৃত্যুদণ্ডের কথা শুনেই লোকটি হাতে ধরা ঘোড়ার লাগাম ছেড়ে দেয় এবং দ্রুত গিয়ে বাহমানের পায়ের উপর বসে পড়ে।

"আমি আয়নুত তামার হতে এসেছি" আগন্তুক ভয়ার্ত কণ্ঠে বলে "নিশ্চয় আমি পরাজিতদের একজন কিন্তু আমি তাদেরও একজন যারা পরাজয়কে জয়ে রূপান্তর করার স্বপ্ন দেখে। আমার কথা আগে শুনুন এরপর না হয় হত্যা করবেন। কিন্তু যদি আমার কথা এড়িয়ে যান তবে মনে রাখবেন, আপনাদের কারো মাথা মুসলমানদের হাত থেকে নিরাপদ থাকবে না।"

"বল তাড়াতাড়ি বল!" বাহমান বলে "কী সে কথা যা তুমি আমাকে শোনাতে এত দূর থেকে এসেছ?"

অন্দর মহল থেকে বাহমানের যুবতী কন্যা এক সিপাহীকে তার পিতার পায়ে পড়ে থাকতে দেখে সামনে এগিয়ে আসে। মেয়েটি দেখে আসছিল যে, তার পিতা পরাজিত হয়ে ফিরে আসার পর থেকে সর্বক্ষণ রুক্ষ থাকে। মৃত্যুদণ্ড ব্যতীত কোনো কথাই বলে না। এবারও মেয়েটি এই মনে করে সামনে আসে যে, তার পিতা আজ আরেকজনকে জল্লাদের হাতে অর্পণ করতে যাচ্ছে।

"খালিদ ইরাক ছেড়ে চলে গেছেন" আয়নুত তামার হতে আগত লোকটি বলে।

"আমি নিজে আসিনি; শামশের বিন কায়েস আমাকে পাঠিয়েছে। আপনি অবশ্যই তাকে চিনেন। মুসলিম সেনাপতি খালিদ আয়নুত তামার অধিকার করে সেখানকার নেতৃস্থানীয় লোকদের হাতে রাজ্য পরিচালনার ভার অর্পণ করেছেন। খালিদসহ তাঁর সৈন্যদের স্থানীয় জনগণের সাথে সম্পর্ক এত ভাল যে, সবাই তাদের অনুগত হয়ে গেছে। কিন্তু কিছু লোক আছে সুযোগের অপেক্ষায়। তারা সুযোগ পেলেই মুসলমানদের ক্ষতি করে ছাড়বে। আমি নিজ চোখে মুসলিম সেনাদের আয়নুত তামার ছেড়ে যেতে দেখেছি।

"যরথুষ্ট্রের শপথ!" বাহমান বলে "খালিদ এই জাতীয় শিকারী নয়, যারা শিকার পাঞ্জার ভেতর আসার পর তা রেখে চলে যায়। ... তাঁর সমস্ত সৈন্য আমাদের এলাকা ছেড়ে চলে গেছে?"

"আমি সব তথ্য নিয়ে এসেছি সম্মানিত সেনাপতি!" আগন্তুক বলে "আয়নুত তামার, হীরা এবং অন্যান্য যেসব শহর মুসলমানরা দখল করে নিয়েছে সেখানে এক এক সালারের নেতৃত্বে সামান্য কিছু সৈন্য রয়ে গেছে। জানা গেছে যে, মুসলিম ফৌজের বড় অংশটি দাওমাতুল যান্দাল চলে গেছে। শুনেছি, সেখানে নাকি কার সাথে তাদের লড়াই হচ্ছে। শামশের বিন কায়েস আমাকে আপনার কাছে এই বার্তা দিয়ে পাঠিয়েছে যে, বর্তমান সময় একবার চলে গেলে আর ফিরে আসবে না। খালিদ ও তার বড় বাহিনীর অনুপস্থিতিতে আমরা আমাদের শহরগুলো সহজেই পুনরুদ্ধার করতে পারি।"

আরও কিছু প্রশ্নোত্তরের পর বাহমানের বিশ্বাস হয়ে যায় যে, লোকটি ভুল তথ্য আনেনি। বাহমানের জানা ছিল যে, দাওমাতুল যান্দাল কত দূরে। সেখানে যেতে এবং গিয়ে ফিরে আসতে অনেক সময়ের প্রয়োজন। তাই সে মনে মনে হিসাব কষে লড়াইয়ের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে ফেলে।

"তুমি ফিরে যাও" বাহমান লোকটিকে বলে "আর শামশের বিন কায়েসকে বলবে, এত বিশাল পুরস্কার তোমার নামে বরাদ্দ করা হয়েছে, যার কল্পনাও তুমি করতে পারবে না। এক ব্যক্তি তোমার কাছে সওদাগরের ছদ্মবেশে আসবে। তার সাথে তোমার বিস্তারিত কথা হবে। আমরা হামলা করার জন্য দ্রুত আসছি। ভেতর থেকে দরজা খোলা তোমাদের দায়িত্ব থাকবে।"

"কী হয়েছে আব্বুজী?" আয়নুত তামারের লোকটি ফিরে গেলে বাহ্মানের কন্যা পিতাকে জিজ্ঞাসা করে "মুসলমানরা কোথায় চলে গেছে?"

"আমার আদরের দুলালী শোনো!" বাহ্মান আনন্দের অতিশয্যে মেয়েকে জড়িয়ে ধরে এবং উৎফুল্ল হয়ে বলে "মুসলমানরা যেখান থেকে এসেছিল সেখানে চলে গেছে? আমি পূর্বেই বলেছিলাম, তারা মাদায়েনে আসার দুঃসাহস করবে না। বিজয় যা করার তারা তা করে ফেলেছে। এবার আমাদের পালা। এবার আমি আমার কন্যাকে মুসলমানদের লাশ দেখাব।"

"কবে?" মেয়েটি ছোট বাচ্চার মত আবেগের সুরে বলে "আমাকে কিন্তু খালিদের লাশ দেখাতে হবে আব্বু! এখানকার লোকেরা বলাবলি করে, সে নাকি মানুষরূপী জিন।"

মেয়েটির বাচ্চাসুলভ কথা শুনে বাহ্মান হো হো করে হেসে ওঠে।

✪

বাহ্মানের এই বিজয়ী অট্টহাসির ধাক্কা প্রথমে কিসরার শাহী মহলে গিয়ে পৌঁছে। সেখান থেকে সালারদের কানে কানে। এরপর মাদায়েনের পরাজিত সৈন্যরা শোনে। পরে এটি নির্দেশ ও নির্দেশনায় বদলে যায়। বাহ্মানের কন্যা তার সব সখী এবং শাহী মহলের মহিলারা ছাড়া আরও যাদের যাদের সাথে দেখা হয় তাদের বলে "আমি আপনাদের খালিদের লাশ দেখাব।"

"খালিদের লাশ?" প্রায় সকল নারী ও সখীর পাল্টা মন্তব্য ছিল যে, "সবাই বলে, খালিদকে কেউ মারতে পারবে না। সে মানুষ নয়। তাঁকে দেখলে সৈন্যরাও পালিয়ে যায়।"

রাজ পরিবার এবং সালারদের ঘোড়া যে আস্তাবলে থাকত সেখানে তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। সহিসদের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, কোনো ঘোড়ায় সামান্য খুঁত দেখা গেলে সংশোধন যোগ্য হলে সংশোধন করে দিবে নতুবা আস্তাবল থেকে আলাদা করে ফেলবে।

বাহ্মানের কন্যা হযরত খালিদ (রা.)-এর কথা এমন নেচে-গেয়ে সর্বত্র বলতে থাকে, যেমন ঈদের চাঁদ দেখা গেলে নতুন পোশাক পরে ছোট ছেলে-মেয়েরা নেচে-গেয়ে আনন্দ করে। মেয়েটি একবার আস্তাবলে যায়। সেখানে তার পিতার ঘোড়ার সাথে নিজের ঘোড়াও ছিল। পিতা তাকে ঘোড়াটি উপহার স্বরূপ দিয়েছিল।

"আমার ঘোড়ার প্রতি খুব যত্ন নিবে" মেয়েটি তার পারিবারিক সহিসকে বলে।

তিন-চার মাস পূর্বে নিয়োগ পাওয়া এক আধা বয়সী সহিস মেয়েটির কথায় দৌড়ে আসে এবং তার কাছে জানতে চায় যে, সৈন্যরা কোথাও যাচ্ছে নাকি মদীনার সৈন্য কর্তৃক আক্রমণের আশংকা করা হচ্ছে?

"এবার তোমরা মদীনাওয়ালাদের লাশ দেখবে" মেয়েটি আনন্দের সাথে বলে। অন্যান্য সহিসও মেয়েটির চারপাশে এসে জড় হয়। তারাও তাজা খবর শোনার জন্য উদগ্রীব ছিল। মেয়েটি ভক্তকুলের আগ্রহ দেখে সব কথা জানিয়ে বলে যে, খালিদ অল্প কিছু সৈন্য রেখে বাকী সব সৈন্য নিয়ে চলে গেছে। ইরাক ছেড়ে সে অনেক দূর চলে গেছে। (বিজিত এলাকাগুলোর সবই তৎকালীন ইরাকের অন্তর্গত ছিল।) মেয়েটি সহিসদের আরো জানায় যে, এখন আমাদের সৈন্য প্রথম আয়নুত তামার এরপর পর্যায়ক্রমে অন্যান্য শহর আক্রমণ করে হৃত শহরগুলো পুনরুদ্ধার করবে। যদি খালিদ আবার আসেও তবে তাঁর জন্য পরাজয় এবং মৃত্যু ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না।

"তাঁকে জীবিত ধরা হবে?" এক আধা বয়স্ক সহিস প্রফুল্লকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে।

"জীবিত বা মৃত" বাহমানের কন্যা জবাবে বলে "তাঁকে মাদায়েনে আনা হবে। জীবিত থাকলে তোমরা তার শিরচ্ছেদের দৃশ্য দেখতে পাবে।"

এর তিন-চার দিন পর হঠাৎ করে আধা বয়স্ক সহিস লাপাত্তা হয়ে যায়। সবাই তাকে আরব মনে করত। হাসি-খুশি এবং সদালাপী ছিল। এক সহিস তাঁর সম্পর্কে জানায় যে, সে প্রায় বলত, সে নিজ গোত্রে ফিরে যেতে চায়। সেখানে গিয়ে নিজ গোত্রের সৈন্যদের শামিল হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়বে। সে তার গোত্রের সেসব লোকদের হত্যার প্রতিশোধ নিতে চায়, যারা যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে মারা গিয়েছিল।

✪

যখন শাহী আস্তাবলে ঐ সহিসের লাপাত্তা হওয়া সম্পর্কে আলোচনা চলছে, তখন সে মাদায়েন থেকে বহু দূরে চলে গিয়েছে। মাদায়েন থেকে সে বিকালে বের হয়েছিল। তখন কেল্লার দরজা ছিল খোলা। তার কাছে নিজের ঘোড়া ছিল। কেউ জানত না যে, সে ঈসায়ী ছিল না; বরং মুসলমান ছিল। সে ঐ এলাকার

বাসিন্দা ছিল, যে এলাকা ইরানীদের অধিকারে ছিল। সে ছিল মুসান্না বিন হারেছার গুপ্তচর বাহিনীর একজন। সে লুকিয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য মাদায়েনে গিয়ে শাহী আস্তাবলে চাকুরী যুগিয়ে নিয়েছিল।

বাহমানের কন্যা থেকে লোকটি হযরত খালিদ (রা.) এবং তার সৈন্যদের ইরান থেকে রওনা ও মাদায়েনের ইরানী সালারদের পরিকল্পনা বিস্তারিতভাবে শুনে সেদিন বিকালেই মাদায়েন থেকে বেরিয়ে আসে। এই তথ্য বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সূর্য অস্তমিত হয়ে যখন তার মাঝে এবং মাদায়েন শহররক্ষা পাঁচিলের মাঝে রাতের কালো পর্দা টানিয়ে দেয়, তখন মুসলিম গুপ্তচর ঘোড়া ছুটিয়ে দেয়। তার লক্ষ্য ছিল আম্বার। সে সেখানে উড়ে উড়ে পৌঁছানোর চেষ্টা করছিল। ঘোড়ার ক্লান্তি অনুভব করলেই কেবল গতি কমিয়ে দিত। পথের মাত্র এক স্থানে সে ঘোড়াকে পানি খাওয়ায়।

পরের দিনের সূর্য উঠতে না উঠতে সে আম্বারে পৌঁছে যায়। কিছুক্ষণ পর সালার যাবারকন বিন বদরের কাছে বসা ছিল। সে রীতিমত হাঁপাচ্ছিল। সে হাঁপাতে হাঁপাতে মাদায়েনের অবস্থা তুলে ধরে।

"আমি সেদিনই আসতে পারতাম যেদিন আমি বাহমানের মেয়ের থেকে সংবাদটি পেয়েছিলাম" লোকটি সালার যাবারকনকে বলে। "কিন্তু আমি সেখানে তিনদিন এই দেখার জন্য দেরি করি যে, দুশমনেরা কী কী প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং তারা প্রথমে কোথায় আক্রমণ করবে।"

গুপ্তচরটির পরিচয়ে ইতিহাস "জনৈক গুপ্তচর" লিখেছে। আর কোনো পরিচয় দেয়নি। মদীনা বাহিনীর এক সালার যাবারকন বিন বদরকে সে যে বিস্তারিত তথ্য সরবরাহ করে তা ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে রয়েছে। প্রায় সকল ঐতিহাসিক এ কথা লিখেছেন যে, হযরত খালিদ (রা.) যখন সালার আয়াজ বিন গনামকে সাহায্য করতে আয়নুত তামার রওনা হন, তখন আয়নুত তামার হতে এক ঈসায়ী আরব মাদায়েনে এই তথ্য পাঠিয়ে দেয় যে, খালিদ ইরাক থেকে চলে গেছে। শোনা যায় তার গন্তব্য দাওমাতুল যান্দাল। এ তথ্য হতে মাদায়েনের অভিজ্ঞ সালার এই অভিমত পোষণ করে যে, মুসলমানরা সিংহাসন, রাজমুকুট আর লুটতরাজ করার জন্য এসেছিল। বিজিত এলাকার অধিকার ধরে রাখতে তারা নামমাত্র সৈন্য রেখে গেছে। ক্ষুদ্র এ বাহিনীকে সামান্য একটু ধাওয়া দিলেই তারা পালিয়ে যাবে।

সে যুগে বেশিরভাগ এমন হত যে, কোনো বাদশা বিরাট বাহিনী তৈরি করে তুফানের মত একের পর এক রাজ্যে আক্রমণ করত এবং গণহত্যা ও লুটপাট চালিয়ে শহরকে বিরানভূমি ও লাশের স্তূপ তৈরি করে চলে যেত। কোনো রাজ্য পুরোপুরি কব্জা করত না। মাদায়েনের শাহী মহলে হযরত খালিদ (রা.)-এর ব্যাপারেও একই ধারণা করা হয়। কিন্তু হযরত খালিদ (রা.) ইরাকে পারস্যের যেসব শহর ও এলাকা বিজিত হয়েছিল সেখানে একজন করে সালার ও কিছু সৈন্য তিনি রেখে গিয়েছিলেন। এ বিষয়টি কিসরার সালারদের জন্য উদ্বেগের কারণ হয়ে দেখা দিয়েছিল।

"সেনাদের মাদায়েন থেকে বের কর এবং একের পর এক হামলা কর" কিসরার দরবার হতে এই নির্দেশ আসে।

"আমরা প্রস্তুত" শেরযাদ বলেন, যিনি সাবাতের শাসক ছিলেন এবং আম্বারে মুসলমানদের হাতে পরাজিত হয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন।

"আমরা পূর্ণ প্রস্তুত" মাহরান বিন বাহরাম বলেন, যিনি আয়নুত তামার হতে পলাতক হয়েছিলেন।

"কিন্তু সৈন্যরা প্রস্তুত নয়" অভিজ্ঞ সালার বাহমান বলেন। তিনি যুদ্ধে পরাজিত হলেও কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন।

"কি বলছেন জনাব বাহমান?" কিসরার তৎকালীন উত্তরাধিকারী বলেন "আমরা কি সৈন্য ও কমান্ডারদের ষাঁড়ের মত এজন্য প্রতিপালন করছি যে, তারা ময়দান হতে পালিয়ে আসবে ?"

"যদি এসব সৈন্য এবং কমাণ্ডারদের শাস্তি দিতে হয়, তবে আজই পাঠিয়ে দিন" বাহমান বলেন "স্বীয় বাহিনীর অবস্থা আমার মুখে শুনুন।"

তিনি নিজ বাহিনীর মানসিক অবস্থা যা বর্ণনা করেন, তা তৎকালীন ঐতিহাসিক এবং সমর বিশেষজ্ঞদের ভাষায় এমন যে, পারস্য সেনাবাহিনীর পুরানো এবং অভিজ্ঞ সদস্যরা বিপুল পরিমাণে বিভিন্ন যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে নিহত হয়েছে। অনেকে শারীরিকভাবে অক্ষম এবং প্রতিবন্ধী হয়ে গেছে। বিপুল পরিমাণ সৈন্য যুদ্ধবন্দী। যেসব সৈন্য এবং কমণ্ডার সুস্থ ও জীবিত আছেন তারাও মানসিক দিক দিয়ে ভঙ্গুর। মদীনা, খালিদ বিন ওলীদ এবং মুসলমান- এই তিন শব্দ তাদের জন্য ত্রাসের কারণ হয়ে গেছে। তারা এখনও সে ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। সরাসরি রণাঙ্গনে গিয়ে যুদ্ধের মুখোমুখী হওয়ার মত মানসিকতা এখনও তাদের তৈরি হয়নি। তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনায় চরম ভাটা পড়েছে। ঘোড়ার সংখ্যাও হ্রাস পেয়েছে।

বাহ্‌মান দরবারে আরও জানান যেসব ঈসায়ী গোত্র তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে লড়েছিল, তাদের অবস্থাও অভিন্ন। মাহরান বিন বাহ্‌রাম তাদের আয়নুত তামারে যে ধোঁকা দিয়েছে, তাতে তারা পারসিকদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হতে অস্বীকার করতে পারে।

"তারপরও তাদেরকে মিলানোর চেষ্টা করতে হবে" বাহ্‌মান বলেন। "কিন্তু ইরান বাহিনীতে হাজার হাজার সৈন্য ভর্তি করতে হবে। আমাদের বাহিনীতে নতুন রক্তের দরকার। আমরা নয়া সেনাদের বলব, মুসলমানরা তাদের সাম্রাজ্য, তাদের আত্মমর্যাদাবোধ এবং তাদের মাজহাবকে যুদ্ধের আহ্বান জানাচ্ছে। যদি তারা মুসলমানদের পৃথিবী হতে বিলুপ্ত করতে না পারে তাহলে তাদের উপর যরথ্রুষ্টের গজব নাযিল হবে। তাদের যুবতী ও কুমারী নারীদের মুসলমানরা বাদী বানাবে।"

"এত বেশি সৈন্যের প্রয়োজন কী?" মাহ্‌রান বিন বাহ্‌রাম জিজ্ঞাসা করে" জানা তো গেছে যে, প্রত্যেক স্থানে মুসলমান রয়েছে নামমাত্র।"

"প্রতি শহর এবং কেল্লায় আমাদের লোক বিদ্যমান" শেরযাদ বলেন "বর্তমানে তারা মুসলমানদের কর্মচারী। কিন্তু যখন তারা জানতে পারবে যে, ইরান বাহিনী শহর অবরোধ করেছে তখন ...।"

তারা ভেতর থেকে কেল্লার দরজা খুলে দিবে" বাহমান শেরযাদের কথা পূর্ণ করে বলেন "তোমরা মিথ্যা আশার উপর ভর করে যুদ্ধ করতে চাও? আমি বিশ্বস্ত সূত্রে জেনেছি, মুসলমানরা বিজিত এলাকার লোকদের সঙ্গে এত ভাল ব্যবহার করে যে, তাদের সঙ্গে কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করে না। যদি বিজয়ীরা বিজিত এলাকার যুবতী সুন্দরী নারীদের প্রতি চোখ তুলে না তাকায় এবং তাদের জান-মাল-ইজ্জতের নিরাপত্তা দেয়, তাহলে লোকজন এমন বিজয়ীদের সঙ্গে কখনও বেঈমানী করবে না।

"তারপরও এত বেশি সৈন্য প্রয়োজন নেই" শাহী পরিবারের এক সদস্য বলে।"

এটা সে সব সালারদের জিজ্ঞাসা করুন, যারা মুসলমানদের হাতে পরাজিত হয়ে এসেছে" বাহ্‌মান বলেন "আমি তো একথা বলি যে, মুসলমানরা যত বেশি সংখ্যায় কম হয়, তত বেশি শক্তিশালী হয়ে ওঠে। আমি কোনো ঝুঁকি নিতে চাই না। আমাদের এটাও খেয়াল রাখা দরকার, মুসলমানরা প্রত্যেক স্থানে কেল্লার

মধ্যে থাকবে। তাদের পরাস্ত করতে আমাদের পাঁচ-দশগুণ বেশি সৈন্য চাই। আমি জবাবী হামলাকে চূড়ান্ত যুদ্ধের রূপ দিতে চাই। এটাও মনে রাখতে হবে, আমরা এক দিনেই মুসলমানদের হাত থেকে শহর পুনরুদ্ধার করতে পারব না। মুসলমানরা একবার মোকাবেলায় জমে গেলে আমাদের একমাস পর্যন্ত অবরোধ চালিয়ে যেতে হবে। এ সময়ে খালিদ স্বীয় বাহিনীসহ ফিরে আসতে পারে। সে ফিরে আসলে যুদ্ধের পুরো চিত্র বদলে যাবে। আমাদের সৈন্য বেশি হলে যুদ্ধে আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। আমরা সৈন্য প্রস্তুত করে তাদেরকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করব এবং একই মুহূর্তে সবখানে আক্রমণ করব।

"খালিদকে ঠেকানোর কোনো ব্যবস্থা নেয়া যায় না?" ইরানের বর্তমান সম্রাট জিজ্ঞাসা করে।

"এ ব্যবস্থাও আমার মাথায় আছে" বাহমান বলেন। "নজর রাখার জন্য চতুর্দিকে দ্রুতগামী অশ্বারোহীদের ছড়িয়ে দিব। খালিদ কোনো দিক থেকে আসলেই আমি জেনে যাব। তখন আমি ইরাক হতে দূরে গিয়ে তার পথ আটকে দিব।

✪

বাহমানকে ব্যাপক ক্ষমতা দেয়া হয়। তিনি স্বীয় বাহিনীর সেসব সৈন্যদের বেশি গুরুত্ব দেন যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ময়দানে লড়েছিল। এর পাশাপাশি সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করতে নতুন সৈন্য ভর্তির ব্যবস্থা নেয়া হয়। যুবকদের এমনভাবে উত্তেজিত করা হয় যে, তারা নিজ নিজ হাতিয়ার ও ঘোড়াসহ সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে থাকে। ঈসায়ীদের বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ফৌজে শামিল করা হয়।

ঈসায়ী গোত্রনেতাদের মাদায়েনে তলব করে বলা হয়, খালিদ নিজ বাহিনী নিয়ে ইরাক থেকে চলে গেছে। মুষ্টিমেয় যেসব মুসলমান রয়ে গেছে তাদের এখনই খতম করতে হবে। যারা জান নিয়ে পালিয়ে যাবে তাদের দশাও এত করুণ করে দিতে হবে, যেন মরুভূমিতে ধুঁকে ধুঁকে মরে।

"বনূ তাগাল্লুব হতে এবার এ আশা নেই যে, তারা আপনাদের হয়ে লড়বে" বনূতাগাল্লুব গোত্রের এক সালার ইরানী সালারদের বলে "আমরা আরেকবার ঐ ধোঁকা খেতে চাই না, যা একবার খেয়েছি। আয়নুত তামার হতে মাহরান বিন বাহরাম সমস্ত সৈন্য নিয়ে যদি পালিয়ে না আসত, তাহলে মুসলমানরা ঐ

ময়দানেই শেষ হয়ে যেত। আমরা আমাদের মত লড়ব। আমরা মুসলমানদের থেকে আমাদের নেতা আক্কাহ বিন আবী আক্কাহ-এর হত্যার প্রতিশোধ নিব। আমরা আপনাদের সাহায্য এবং সঙ্গ ব্যতিরেকেই মুসলমানদের পরাস্ত করতে পারি।"

"তোমরা তোমাদের মত আলাদা লড়বে?" বাহমান ভ্রূকুঞ্চিত করে জিজ্ঞাসা করে।

"এর ফল কি এই হবে না যে, মুসলমানরা আমাদের উভয় দলকে পৃথক পৃথকভাবে পরাজিত করবে?"

"লড়ব অপনাদের সাথেই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে" বনূ তাগাল্লুবের নেতা বলে। "বিবেক আমার নিয়ন্ত্রণেই আছে। মুসলমানরা আমাদের উভয়েরই দুশমন। আমরা আপনাদের সঙ্গে থাকব ঠিকই কিন্তু আপনাদের উপর ভরসা করব না। খালিদের শির আমাদের চাই-ই।"

"খালিদ এখানে নেই" মাহরান বিন বাহরাম বলে। "সে চলে গেছে।"

"যেখানেই থাকুক না কেন" ঈসায়ী নেতা বলে। "জীবিত তো আছে। আমরা প্রথমে তার ঐ বাহিনী খতম করব যারা এখানে আছে। এরপর খালিদ বিন ওলীদের পশ্চাদ্ধাবন করব।... সে নিজেই চলে আসবে। নিজ বাহিনীর সাহায্যার্থে সে অবশ্যই আসবে। কিন্তু এখানে মৃত্যু তাঁর অপেক্ষায় থাকবে।"

মুসলমান গুপ্তচরটি মাদায়েনে ঈসায়ী বেশে শাহী আস্তাবলে চাকরি করছিল। ফলে সে ঈসায়ীদের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিল। সে সালার যাবারকন বিন বদরকে জানায়, ইরানীদের তুলনায় ঈসায়ী গোত্রগুলো হযরত খালিদ (রা.)-এর বেশি দুশমনে পরিণত হয়েছে। এমনকি তারা ইরানী সালারদের এটাও বলে দেয় যে, ইরানী বাহিনী পেছনে থাকবে। ঈসায়ী গোত্রগুলো সামনে থেকে মুসলমানদের উপর প্রথম আক্রমণ করবে।

✪

সালার যাবারকন বিন বদর মাদায়েনের এই রিপোর্ট শোনেন এবং তখনই দুইজন দূত তলব করেন। তিনি তাদের বলেন যে, উৎকৃষ্ট জাতের দু'টি ঘোড়া নিবে এবং উড়ে উড়ে দাওমাতুল যান্দাল যাবে। যাবারকন তাদের হযরত খালিদ (রা.)-এর জন্য জবানী পয়গাম প্রদান করেন।

... আর সেনাপতি ইবনে ওলীদকে এ কথাও বলবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আম্বারে শেষ মুসলমানের শ্বাস-প্রশ্বাস চলবে, দুশমন শহরের মধ্যে পা দিতে পারবে না" যাবারকন দূতদের বলে। "আপনি আসতে পারলে আমাদের জন্য সমস্যা হাল্কা হয়ে যাবে। আর না আসতে পারলে ঐ আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে আছেন, যার রসূলের বাণী আমরা বক্ষে ধারণ করে এ পর্যন্ত এসেছি। ...

ইবনে ওলীদকে আরও বলবে, দাওমাতুল যান্দালের অবস্থা আপনাকে আসার অনুমতি দিলে আপনি আসবেন। পক্ষান্তরে আপনি যদি সেখানে সমস্যায় জর্জরিত থাকেন তাহলে আমাদের আল্লাহ্র নামে সোপর্দ করবেন। আমরা সেভাবেই লড়ব যেভাবে আপনার তলোয়ারের অধীনে লড়ে থাকি।"

দূতদের বিদায় করে যাবারকন আরও কয়েকজন দূত তলব করেন। প্রত্যেককে তার গন্তব্য বলে দেন। দূতদের নির্দিষ্ট শহরে যাওয়া এবং সেখানের সালারকে বলা দরকার ছিল যে, হযরত খালিদ (রা.)-এর অনুপস্থিতিতে দুশমনেরা কী ফন্দি এটেছে। তারা হামলার পরিকল্পনা করেছে। বার্তায় যাবারকন এ কথাও বলেন যে, তিনি দাওমাতুল যান্দালে দূত পাঠিয়ে দিয়েছেন। যদি সেখান থেকে সাহায্য না আসে, তাহলে আমরা একে অপরকে সাহায্য করার চেষ্টা করব।

মুসলমানদের জন্য বড়ই মারাত্মক অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল। শত্রুর মোকাবেলায় সৈন্য আগে থেকেই কম ছিল। যারা ছিল তারাও বিক্ষিপ্ত ছিল। এ অবস্থায় শত্রুরা একই সময়ে মুসলমানদের অধিকারভুক্ত শহরগুলোতে একযোগে অবরোধ করলে তাদের পক্ষে একে অপরের সাহায্যে যাওয়া সম্ভব হত না।

উভয় পক্ষে জোর তৎপরতা শুরু হয়ে যায়। ঈসায়ী গোত্রনেতারা প্রত্যেক বসতিতে গিয়ে গিয়ে যুবকদের একত্রিত করতে শুরু করে। তারা সেসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোত্রের লোকদের নিজেদের দলভুক্ত করে নেয়, যারা ঈসায়ী ছিল না; মূর্তিপূজক ছিল। ঈসায়ী যুবতী নারীরাও বিভিন্ন বসতিতে যায় এবং নারীদের মুসলমানদের বিরুদ্ধে এই বলে বলে উত্তেজিত করতে থাকে যে, তারা যেন যুবক স্বামী, ভাই এবং পুত্রদের যুদ্ধে পাঠিয়ে দেয়। নতুবা বসতির সমস্ত যুবতী নারীদের মুসলমানরা ধরে নিয়ে গিয়ে বাঁদী বানাবে। এমন কথাও মেয়েগুলো বলে যে, "আমরা মুসলমানদের বাঁদী হতে চলেছি"। দ্বিতীয়ত শ্লোগান এই তুলে যে, "নিহতদের প্রতিশোধ নেওয়ার সময় এসে গেছে। ... ঘর ছেড়ে বের হও; প্রতিশোধ নাও।"

এ দিকে মাদায়েনে ইরান বাহিনীর সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছিল। এবার ফৌজে আগত সৈন্যদের বেশিরভাগই ছিল যুবক। তারা যুদ্ধের উত্তেজনায় ফেটে পড়ছিল। রণাঙ্গনে যুদ্ধ করার পলিসি তাদের শেখানো হচ্ছিল। অশ্ব চালনা, তীর বর্ষণ, খঞ্জর গাঁথা, বর্শা নিক্ষেপ ইত্যাদিতে তারা পটু ছিল। তারপরও তাদের যোগ্যতা শাণিত করা হচ্ছিল। বাহমান ব্যস্ততায় প্রায় পাগলের মত হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি নিজে উপস্থিত থেকে সৈন্যদের প্রশিক্ষণে দেখভাল করতেন। তার সঙ্গী সালারগণ তাকে জলদি আক্রমণের জন্য অনুরোধ জানাতে থাকে। কিন্তু তিনি সমর্থন করেন না। তিনি বলতেন, খালিদ আর ফিরে আসবে না। আর আসলেও সৈন্যসহ এমন সময় পৌঁছবে, যখন ইরাকে দাঁড়াতে তার এক বিঘত জমিনও মিলবে না। সব এলাকা চলে যাবে ইরানীদের দখলে।

মুসলমানরা যেসব শহর দখল করে রেখেছিল সেখানে তৎপরতা ভিন্ন ধরনের ছিল। প্রত্যেক শহরে মুসলমানদের সংখ্যা স্বল্প ছিল। তারা কম সৈন্য নিয়েই কেল্লা রক্ষার তৎপরতা শুরু করেছিল। লাখ-লাখ তীর, বর্শা তৈরি করা হচ্ছিল। সালাররা মুজাহিদ বাহিনী হতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গেরিলা দল তৈরি করেছিল। তাদের অবস্থান ছিল কেল্লার বাইরে এবং সাধারণ রাস্তা হতে দূরে। তাদের কাজ ছিল, শত্রুরা অবরোধ করলে পেছন দিক হতে অতর্কিত আক্রমণ করে তাদের পর্যুদস্ত করা। রাতের আঁধারে, দিনের সুযোগে গেরিলা আক্রমণ করে অতিষ্ট করে তোলা।

হযরত খালিদ (রা.)-এর অনুপস্থিতিতে সালার আসেম বিন আমরের ভাই কা'কা' বিন আমর বিজিত এলাকার বিভিন্ন শহরে অবস্থানরত সৈন্যদের সালার ছিলেন। তার প্রধান কার্যালয় ছিল হীরা। তার দায়িত্ব শুধু হীরা রক্ষা করা ছিল না; বরং ইরাকের বিজিত সমস্ত এলাকা ও শহর রক্ষা করার জিম্মাদারীও তার ছিল। তিনি সমস্ত শহরের বিক্ষিপ্ত সালারদের প্রতি জরুরী দিক-নির্দেশনা দান করতেন। সবাইকে জোর দিয়ে বলে দিয়েছিলেন যে, দাওমাতুল যান্দাল থেকে হযরত খালিদ (রা.)-এর আগমনের অপেক্ষায় যেন কেউ বসে না থাকে। আল্লাহর উপর ভরসা রাখবে এবং এটা মাথায় রেখে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিবে যে, তাদের সাহায্যে কেউ আসবে না।

কা'কা' আরেকটি কাজ এই করেছিলেন, হযরত খালিদ (রা.) যে দলটিকে ফোরাতের ওপার দেখাশুনা করার জন্য রেখেছিলেন, তাদের অধিকাংশ সৈন্যকে

হীরায় ফিরিয়ে আনেন। যাতে হীরার প্রতিরোধ শক্তিশালী ও মজবুত হয়। কা'কা'-এর নিজস্ব গুপ্তচর ছিল। তাদের মাধ্যমে কা'কা' জানতে পারেন যে, পারস্য বাহিনী কোথায় কোথায় জমা হবে। দু'টি স্থানের নাম আসে। একটি বাহিনী হুসাইদ আর দ্বিতীয়টি খনাফিসে থাকবে। এ দু'টি স্থান আম্বার ও আয়নুত তামারের মধ্যবর্তী ছিল। কা'কা' তাঁর এক বাহিনীকে হুসাইদ আর অপর বাহিনীকে খনাফিস এই কথা বলে পাঠান যে, পারস্য বাহিনী সেখানে এলে তাদের উপর নজর রাখবে এবং ফৌজ সামনে অগ্রসর হলে তাদের উপর গেরিলা আক্রমণ করবে। উপর্যুপরি আক্রমণ চালিয়ে তাদের অগ্রযাত্রা রোধ করার চেষ্টা করবে।

এ দুই বাহিনী নির্দিষ্ট স্থানে এসে দেখে, শত্রুদলের অগ্রগামী বাহিনী আগেই এসে শিবির স্থাপন করেছে। তারা যে হারে তাঁবু স্থাপন করছিল তাতে বুঝা যাচ্ছিল, বিরাট বাহিনী এখানে এসে অবস্থান করবে। মুসলিম বাহিনীও তাদের সামনে এমনভাবে তাঁবু স্থাপন করে, তারাও মূল বাহিনীর অগ্রগামী বাহিনী; তাদের পেছনে বিরাট বাহিনী আসবে।

✪

এদিকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষের বিরাট তৎপরতা ও তোড়জোড় শুরু হয়েছিল। মুজাহিদ বাহিনীকে খড়-কুটার মত উড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রলয়ঙ্করী ঝড় উঠেছিল। ওদিকে সালার যাবারকন বিন বদরের প্রেরিত দুই দূত দাওমাতুল যান্দালে হযরত খালিদ (রা.)-এর নিকট পৌঁছে যায়। তারা সাড়ে ৩০০ মাইল দূরত্ব মাত্র ৫ দিনে অতিক্রম করেছিল। ইতিপূর্বে হযরত খালিদ (রা.) দাওমাতুল যান্দালের ৩০০ মাইল দশ দিনে অতিক্রম করেছিলেন। দূতদ্বয় ১০ দিনের স্থলে অর্ধেক সময়ে ৫ দিনে দীর্ঘ মরুভূমির পথ পাড়ি দিয়ে দাওমাতুল যান্দালে গিয়ে পৌঁছান। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় তাদের জিহ্বা বের হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল। তাদের মুখমণ্ডলে মিহি ধূলার আবরণ জমে গিয়েছিল। তাদের কণ্ঠ শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। তারপরও তারা কথা বলার চেষ্টা করে।

"তোমাদের উপর আল্লাহর রহমত হোক" হযরত খালিদ (রা.) বলেন। "শুষ্ক কণ্ঠ হতে কথা বের হওয়া কীভাবে সম্ভব?"

তাদের পানাহার করানো হলে তারা কথা বলার যোগ্য হয়।

“মহান সেনাপতিকে আম্বারের সালার যাবারকনের পক্ষ হতে সালাম” এক দূত বলে।

“ওআলাইকুমুচ্ছালাম!” হযরত খালিদ (রা.) জিজ্ঞাসা করেন “যে বার্তা নিয়ে এসেছ তা কী?”

“মাদায়েনে বিরাট বাহিনী প্রস্তুত হচ্ছে” দূত বলে “আরেক বাহিনী তৈরি হচ্ছে ঈসায়ী গোত্রদের মধ্য হতে। তারা বলে, ইবনে ওলীদ তাদের এলাকা ছেড়ে চলে গেছে। পেছনে যে যৎসামান্য রয়ে গেছে তাদের এক থাবায় কুপোকাত করে আমাদের অঞ্চল পুনরুদ্ধার করব।”

উভয় দূত হযরত খালিদ (রা.)-কে বিস্তারিত রিপোর্ট জানিয়ে বলে, যাবারকন বলেছেন, দাওমাতুল যান্দালের অবস্থা যদি খালিদকে আসতে না দেয়, তাহলে আসবে না। তখন ক্ষুদ্র দল নিয়ে আমরা ইরান বাহিনীর বিরুদ্ধে সেভাবেই লড়ে যাব যেভাবে খালিদের নেতৃত্বে লড়েছি।

দাওমাতুল যান্দালের উপর হযরত খালিদ (রা.)-এর নিয়ন্ত্রণ পরিপূর্ণ হয়েছিল। তিনি সেখানকার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব একজন নায়েব সালারের হাতে অর্পণ করেন এবং তৎক্ষণাৎ সৈন্য মার্চ করার নির্দেশ দেন।

“খোদার কসম!” ঐতিহাসিকদের তথ্য মোতাবেক হযরত খালিদ (রা.) এই বাক্যে শপথ করেন যে, “বনূ তাগাল্লুবের উপর এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ব, তারা আর কখনো ইসলামের বিরুদ্ধে মাথা তোলার যোগ্য থাকবে না।”

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, হযরত খালিদ (রা.) মুজাহিদদের বলেন, এত দ্রুত গতিতে চল যে, মরুঝড় পেছনে রয়ে যায়, পদাতিক বাহিনী অশ্বারোহীদের আগে চল। এটা একটা কঠিন পরীক্ষা। অগ্নিপূজারী ও সত্যপূজারীদের মাঝে এটা ছিল একটা তীব্র প্রতিযোগিতা। ইরান বাহিনীর জন্য তাদের এলাকায় পৌঁছানো কষ্টকর ছিল না। দূরত্বও ছিল না তেমন। কিন্তু মুসলমানরা ছিল অনেক অনেক দূরে। তাদের সামনে ৩০০ মাইলের শুধু ব্যবধানই ছিল না; বড় রুক্ষ মরুপ্রান্তর ছিল। টিলায় ভরা ছিল সারা পথ। বালুর সমুদ্র ছিল তাদের চলার পথে। পানির সঙ্কট ছিল তীব্র। বড় সমস্যা হল তাদের হাতে সময় কম হওয়ায় চলার গতি শ্লথ করতে পারছিল না। অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করা ছিল তাদের জন্য প্রধান চ্যালেঞ্জ।

আকাশের চাঁদ-তারকা তাদের চলতে দেখে। সূর্যও চলতে দেখে। মরুঝড় তাদের গতি রুখতে পারে না। ঝড়, পিপাসা এবং ক্ষুধা শরীরকে অকেজো করে দেয়। মরুভূমির প্রচণ্ড গরমে দেহ মরে যাবার কথা ছিল। কিন্তু হযরত খালিদ (রা.)-এর বাহিনী শরীর ও দেহের কথা ভুলে গিয়েছিল। তাদের ঈমানী শক্তির কারিশমা এই ছিল যে, তারা শরীরের দাবী ও প্রয়োজনীয়তার কথা ভুলে নিজেদের মধ্যে ঈমানী শক্তি সৃষ্টি করে নিয়েছিল। তাদের জবানে আল্লাহ তা'আলার নাম ছিল। অন্তরে ঈমান ও বিশ্বাস ছিল পর্বতসম। নিজেদের আওয়াজ তাদের মধ্যে এক অপার্থিব শক্তি তৈরি করছিল। যে শক্তির বলে তারা সকল চড়াই-উৎরাই নিমিষে পার হচ্ছিল।

রণসঙ্গীত পাঠকারীরা সৈন্যদের মধ্যখানে উটের উপর আরোহী ছিল। মাঝখানে থাকার কারণে তাদের সুরধ্বনি সামনে- পেছনে সব স্থানে শোনা যাচ্ছিল। রণসঙ্গীতের তালে তালে সৈন্যদের পা উঠছিল আর নামছিল। তবে এই তাল ছিল বড়ই দ্রুত গতির। কিছু দূর চলার পর রণসঙ্গীতের মূর্ছনা থেমে যেত। সুনসান নীরবতা নেমে আসত পুরো বাহিনীর মধ্যে। এ সময়ে সৈন্যরা কালেমা তৈয়্যেবা উচ্চস্বরে পড়ত। হাজারো সৈন্যের কর্ণের সমস্বর আওয়াজ এক আওয়াজে পরিণত হত। পরে এই ধ্বনি গুঞ্জরণে পরিণত হত। অবস্থাদৃষ্টে মনে হত মরুভূমি এবং মরুটিলার উপর এক অপার্থিব অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে।

ইসলামের প্রেমিকগণ নিজেরা নিজেদের আওয়াজে বিমোহিত হয়ে ছুটে চলছিল। তাদের লক্ষ্য ছিল ইরান, যেখানে ঈসায়ী গোত্রীয় সেনা এবং অগ্নিপূজক বাহিনী তাদের জন্য খোলা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিল। যে চ্যালেঞ্জের জবাব দেয়া ছিল তাদের জন্য অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্ন।

✪

বাহমান নিজের হাতে গড়া বাহিনীকে শেষ বারের মত দেখে এবং সৈন্যদেরকে দু'ভাগে বিভক্ত করে। এক অংশকে হুসাইদ আর অপর অংশকে খনাফিসের দিকে প্রেরণ করে। এবার কমান্ডের দায়িত্ব দেয়া হয় নতুন সালারদের। হুসাইদ বাহিনীর সালার ছিল রোযবাহ আর খনাফিসের বাহিনীর সালার ছিল যারমোহর। তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল, নিজ নিজ স্থানে গিয়ে শিবির স্থাপন কর এবং বনূ তাগাল্লুবসহ অন্যান্য গোত্রীয় সৈন্যদের আসার অপেক্ষা কর। কা'কা'-এর গুপ্তচররা এই তথ্য দিয়েছিল যে, মাদায়েনের বাহিনী হুসাইদ এবং খনাফিসকে সমবেতস্থল বানাবে এবং সেখানে থেকেই পরবর্তী কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

ঈসায়ী সৈন্যরা তখন পর্যন্ত পুরোপুরি প্রস্তুত হতে পারেনি। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, ইরানীদের মত ঈসায়ীরাও দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এক দলের নেতা ছিল হুজাইল বিন ইমরান আর অপর দলের নেতৃত্বে ছিল রবীয়া বিন বুহাইয়ার। এই দু'দলের সৈন্যরা হুসাইদ এবং খনাফিসের একটু দূরে সানা এবং জুহাইল নামক দু'স্থানে জমা হচ্ছিল।

মাদায়েনের সৈন্যদের দু'দল এবং ঈসায়ীদের দু'দলের একত্রিত হওয়ার পরিকল্পনা ছিল। এটা ছিল মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিরাট সমরশক্তি। এই চারদল একত্রিত হতে পারলে তা অবশ্যই মুসলমানদের জন্য মাথাব্যথার কারণ হত। কারণ মুসলমানদের সংখ্যা আগে থেকেই কম ছিল। কিন্তু এবার যেভাবে শত্রুপক্ষ কোমর বেঁধে মাঠে নামে এবং সম্মিলিত বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা এত বেশি হয় যে, তার মধ্যে মুসলমানরা ছিল আটার মধ্যে লবনের মত। ইসলামী বাহিনীর সামনে এত বিরাট বাহিনী ইতোপূর্বে কখনও দাঁড়ায়নি।

শত্রুদের চার সেনাক্যাম্পে রাতে সৈন্যরা এমনভাবে নাচত আর গাইত, যেন তারা মুসলমানদের ইতোমধ্যেই চরমভাবে পরাজিত করে ফেলেছে। তাদের দৃষ্টিতে বিজয় ছিল সুস্পষ্ট। পরিস্থিতি ছিল তাদের অনুকূলে। সৈন্য ছিল তাদের প্রচুর। অস্ত্র-শস্ত্র ছিল উন্নত। ঘোড়ার সংখ্যাও ছিল অগণিত। যে সম্মান ও পুরস্কার তাদের দেয়া হয় তা ইতোপূর্বে কখনও দেয়া হয়নি। মালে গণীমত সম্পর্কে তাদের বলা হয়েছিল, সবই তাদের প্রাপ্য হবে। তাদের থেকে কিছুই নেয়া হবে না।

তবে সব ঠিকঠাক থাকলেও ঐসব পুরাতন সৈন্যরা ছিল অনেকটা গম্ভীর ও চিন্তিত, যারা ইতোপূর্বে মুসলমানদের হাতে ধোলাই খেয়েছিল। যখন তারা কোন ভারী কথা বলত, তখন নতুন সৈন্যরা তাদের উপহাস করত।

✪

প্রতিদিনের মত এক রাতে ইরান বাহিনী নাচতে-গাইতে এবং মদপান করতে করতে অতিবাহিত করে। সূর্য তখনও উদিত হয়নি। হুসাইদ বাহিনীর একটি অংশ তখনও বেঘোরে ঘুমুচ্ছিল। তাদের জাগ্রত হওয়ার কোনো তাড়া ছিল না। তাদের জানা ছিল, মুসলমানরা কেল্লার মধ্যে। তাদের সংখ্যা এত কম যে, তারা বাইরে আসার দুঃসাহস করবে না। তারা দেখেছিল, তাদের অদূরে মুসলমানরা যে শিবির স্থাপন করেছিল, তা তুলে নিয়ে মুসলমানরাও চলে গেছে। মুসলমানরা একদিন পূর্বে সেখান থেকে চলে এসেছিল।

অগ্নিপূজারীদের সান্ত্রীরা এবং কয়েকজন জেগে ছিল। যারা অশ্বের দানা-পানি দিচ্ছিল। প্রথম সান্ত্রীরা চিৎকার দেয় এরপর অশ্বের খাদ্য দানকারীরা একযোগে শোরগোল করে উঠে ... "হুঁশিয়ার ... সাবধান! ... মদীনার ফৌজ এসে গেছে"। সারা শিবিরে হট্টগোল শুরু হয়ে যায়। সিপাহীরা অস্ত্র হাতে তুলে নিতে তৎপর হয়। অশ্বারোহী সৈনিকরা ঘোড়ার পানে ছোটে। কিন্তু মুসলমানরা মরুভূমির মরুঝড়ের মত আসছিল। তাদের সংখ্যা অগ্নিপূজারীদের তুলনায় নগণ্য ছিল। কিন্তু এ হামলা ছিল অপ্রত্যাশিত। কিছু বুঝে ওঠার আগেই তারা চরমভাবে ধরাশায়ী হতে থাকে।

মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ৫ হাজার। তাদের সালার ছিল কা'কা বিন আমর। পূর্বের দিন হযরত খালিদ (রা.) স্বসৈন্যে এসে পৌঁছেছিলেন। তিনি এসে বিশ্রাম না নিয়েই উদ্ভূত পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি বিকালে ক্ষুদ্র বাহিনীকে হুসাইদ এবং খনাফিস থেকে প্রত্যাহার করে নেন। এতে অগ্নিপূজারীদের মনোবল আরও বেড়ে যায়। তারা মনে করে যে, মুসলমানরা তাদের বিরাট বাহিনী দেখে ভয়ে পালিয়ে গেছে।

হযরত খালিদ (রা.) দ্বিতীয় এই পদক্ষেপ নেন যে, ৫ হাজার সৈন্য আরেক সালার আবু লায়লাকে প্রদান করেন। তিনি তাকে মাদায়েনের ঐ বাহিনীর উপর হামলা করার জন্য প্রেরণ করেন, যারা খনাফিসে তাঁবু গেড়ে অবস্থান করছিল।

"তোমাদের প্রতি আল্লাহর রহমত হোক বন্ধুগণ!" হযরত খালিদ (রা.) এই দুই সালারকে লক্ষ্য করে বলেন। "তোমরা উভয়েই আগামী প্রভাত হতেই এক সময়ে নিজ নিজ প্রতিপক্ষের উপর আক্রমণ চালাবে। খনাফিস হুসাইদের তুলনায় দূরে। আবু লায়লা! তোমাদের দ্রুতগতিতে যেতে হবে। তোমরা বুঝেছ কেন একই সময়ে দুই দলের উপর আক্রমণ করতে হবে?"

"যাতে তারা একে অপরের সাহায্যে না আসতে পারে" কা'কা বিন আমর জবাবে বলে। "ইবনে ওলীদ! আপনার এই চাল আমরা ব্যর্থ হতে দিব না।"

"জয় পরাজয় আল্লাহর হাতে" হযরত খালিদ (রা.) বলেন। "তোমাদের সঙ্গে মাত্র ৫ হাজার করে অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য রয়েছে। সৈন্য সংখ্যার দিকে তাকালে এটাই বলতে হয় যে, এবার লড়াই হবে না। গেরিলা ধরনের আক্রমণ হবে। বিশাল এক বাহিনীর বিরুদ্ধে মুষ্টিমেয় কিছু সৈন্যের হামলা গেরিলাই হয়ে থাকে।... সময় খুব কম। বন্ধুরা! রওনা দাও। আমি তোমাদের আল্লাহর হাতে সোপর্দ করছি।"

হযরত খালিদ (রা.) নিজে আয়নুত তামারে এই চিন্তায় প্রস্তুতি নিতে থাকেন যে, ছানা এবং বুহাইলে ঈসায়ীদের যে সব গোত্র সমবেত হয়ে আছে, তারা ইরান বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হতে চাইলে পথেই তাদের ঠেকিয়ে দেয়া হবে। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, এটা হযরত খালিদ (রা.) এর রণনৈপুণ্য ছিল, তখন পর্যন্ত শক্রবাহিনী মিলিত না হয়ে যে চার দল চারস্থানে বিক্ষিপ্ত হয়ে ছিল, তিনি এটাকে সুযোগ মনে করে একে কাজে লাগাতে চেষ্টা করেন। শক্রদের লক্ষ্য ছিল চার দল মিলিত হওয়া। সমবেত হয়ে তারপর পরিকল্পনা মাফিক এক যোগে মুসলমান অধিকৃত চার শহরে আক্রমণ করা।

বর্ষীয়ান ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, হযরত খালিদের "শক্রকে ধ্বংস করে দাও" এই মর্মে যে নির্দেশ ছিল, তার মর্ম হল যুদ্ধবন্দী বেশি না বানিয়ে রণাঙ্গনেই তাদের শেষ করে দাও। হযরত খালিদ (রা.) বিশাল শক্তিশালী দুশমনের সংখ্যা যথাসম্ভব হ্রাস করতে চান। কিন্তু চিন্তার বিষয় হল, হযরত খালিদ (রা.)-এর যৎসামান্য ও ক্লান্ত-শ্রান্ত সৈন্য দ্বারা বিশাল শক্তিধর শক্রর মোকাবেলা করা আদৌ সম্ভবপর ছিল কিনা!

✪

সালার কা'কা বিন আমর ঠিক সময়ে আক্রমণস্থলে পৌঁছে যান। শক্রদের জন্য তাঁর হামলা অপ্রত্যাশিত ছিল। হুসাইদের সেনাক্যাম্পে হট্টগোল শুরু হয়ে যায়। মুসলমানরা অবরোধ ভেঙ্গে সয়লাবের মত ধেয়ে আসছিল। ৫ হাজার সৈন্যের আগমণকে সয়লাব বলা চলে না। কিন্তু তাদের ৫ হাজারের গতি ও দ্রুততা সয়লাবের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না।

অগ্নিপূজারীদের সালার রোযবাহা অপ্রত্যাশিত এ অবস্থায় ঘাবড়ে যায়। সে দ্রুত এক দূতকে এই বার্তা দিয়ে খনাফিসে অবস্থানরত সালার যরমোহরের কাছে পাঠায় যে, মুসলমানেরা আচমকা আক্রমণ করে বসেছে এবং পরিস্থিতি খুব করুণ। পত্র পাওয়া মাত্রই যেন সাহায্যের জন্য ছুটে আসে।

দূত খনাফিসে গিয়ে পৌঁছে। দূরত্ব বেশি ছিল না। যরমোহর সালার রোযবাহা-এর পত্র হাসি দিয়ে উড়িয়ে দিয়ে বলে, রোযবাহ এর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। মুসলমানের এই দুঃসাহস কিভাবে হবে যে, কেল্লার বাইরে এসে আক্রমণ করবে! দূত তাকে দেখা অবস্থার বিবরণ দেয়। যরমোহর তার সৈন্যদের সেখান থেকে অন্যত্র নিয়ে যেতে পারে না। কেননা তার প্রতি প্রধান সেনাপতি বাহমানের

এই নির্দেশ ছিল যে, অন্যখানে যাই হোক না কেন তার বিনা অনুমতিতে সৈন্যদের হস্তান্তর করা যাবে না। কিন্তু দূতের পত্র যরমোহরকে বিচলিত করে তোলে। সে চিন্তা করে ভাল মনে করে যে, সৈন্য পাঠানোর পরিবর্তে সে নিজে গিয়ে পরিস্থিতি দেখে আসবে।

সে যখন হুসাইদে পৌঁছে তখন সালার রোযবাহাকে বিপদ কবলিত পায়। কা'কা'-এর হামলা ছিল বড়ই জোরদার ও মারাত্মক। তিনি শত্রুদের অজান্তেই তাদের উপর পতিত হয়েছিলেন। দুশমনের জন্য প্লাস পয়েন্ট এই ছিল যে, তাদের সৈন্যসংখ্যা অনেক বেশি ছিল। প্রথমদিকে অপ্রস্তুত সৈন্যদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেও পরে অর্ধেকের মত সৈন্য প্রস্তুতি নিয়ে হামলা মোকাবেলা করার জন্য দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

খনাফিসের সালার যরমোহরও চলে এসেছিল। সে যুদ্ধের অবস্থা দেখে নিজেও সালার রোযবাহার সাথে যুদ্ধে নেমে পড়ে। আশা ছিল ধাক্কা কাটিয়ে উঠে অগ্নিপূজারীরা অবশেষে মুসলমানদের উপর বিজয়ী হবে। কা'কা' হযরত খালিদ (রা.)-এর মত বীরত্ব প্রদর্শন করতে চাচ্ছিলেন। তিনি সালার রোযবাহাকে তলোয়ার হাতে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছিলেন। রোযবাহা সামনের বাহিনীতে ছিল। বারবার আহ্বানে সে সামনে চলে আসে। কা'কা'ও তার মুহাফিজদের পেছনে রেখে একাই এগিয়ে আসে।

উভয়ে একে অপরের উপর আক্রমণ করে। আক্রমণ প্রতিহত করে। প্রান্ত ও চাল পরিবর্তন করে করে তারা লড়ছিল। কিছুক্ষণ পরেই কা'কা'র তলোয়ার রোযবাহার বগলের একটু নিচে আমূল বসে যায়। কা'কা' তালায়ার বের করে আনে এবং ঘোড়া থামিয়ে পেছনে ফেরে। রোযবাহা আঘাত খেয়ে অশ্বপৃষ্ঠে থেকেই নিজেকে সামলে নিচ্ছিল। কা'কা' পেছন দিক থেকে এসে তলোয়ার তার পিঠে খঞ্জরের মত বসিয়ে দেয়, যা রোযবাহার দেহে কয়েক ইঞ্চি গেঁথে যায়।

রোযবাহা ঘোড়া হতে এভাবে পড়ে যায় যে, তার এক পা ঘোড়ার পাদানিতে আটকে যায়। কা'কা' নিজের ঘোড়া রোযবাহার ঘোড়ার কাছে এনে ঘোড়ার পিঠে তলোয়ারের অগ্রভাগ চেপে ধরে। ঘোড়া আহত হয়ে দৌড়াতে শুরু করে এবং রোযবাহাকে মাটির উপর দিয়ে টেনে নিয়ে যায়।

যরমোহর কাছেই ছিল। কোনো ঐতিহাসিক ঐ মুসলমান কমান্ডারের নাম লিখেননি, যিনি যরমোহরকে দেখে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন।

যরমোহর মোকাবেলা করার জন্য সামনে আসে। কিছুক্ষণ লড়াই হয় এরপর যরমোহরের ঐ অবস্থা হয়, যা রোযবাহার হয়েছিল। পার্থক্য শুধু এই ছিল যে, যরমোহর আঘাত খেয়ে রক্তে রঞ্জিত হয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে মারা গিয়েছিল।

মাদায়েনের বাহিনীতে ঐসব কমান্ডার এবং সিপাহীরা ছিল, যারা পূর্বেও মুসলমানদের হাতে মার খেয়েছিল এবং তাদের বীরবিক্রমে যুদ্ধ করতে দেখেছিল। নিজেদের পরাজয় সমন্ধে তাদের পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। তাদের মনোবল এবং প্রেরণায় বিন্দুমাত্র প্রাণ ছিল না। তারা তলোয়ারে কাটা পড়ছিল অথবা ময়দান হতে পলায়নের চেষ্টা করছিল। বাহমান যেসব যুবকদের নতুন ভর্তি করেছিল, তারা তরবারী চালানো, তীর নিক্ষেপ ইত্যাদি যুদ্ধাস্ত্রে পারদর্শী ছিল এবং উৎসাহ-উদ্দীপনাও ছিল। কিন্তু তারা রণাঙ্গনের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত ছিল না। এই প্রথমবারের মত রণাঙ্গনে এসেছিল। মুসলমানদের লড়তেও প্রথমবারের মত দেখে। তারা জবাই করা মুরগির মত লাফানো এবং পিপাসায় ছাতি ফেটে মরে যাবার মত দৃশ্য ইতোপূর্বে দেখেনি। আহত ঘোড়ার পাগলা ছুট এবং আহত সৈন্যদের দলিত-মথিত করাও তারা আগে কোনো দিন দেখেনি।

রণাঙ্গনে তারা এত হতাহত ও এত বেশি রক্ত দেখে যে, সারা ময়দানের মাটি লাল হয়ে গিয়েছিল, তখন তাদের স্মরণ হয় সেসব সিপাহীদের কথা, যারা ইতোপূর্বে মুসলমানদের সাথে লড়াই করে পালিয়ে এসেছিল। হাজার হাজার সিপাহীকে চোখের সামনে আহত ও আর্তনাদ করতে দেখে এবং তাদের পলায়ন করতে দেখে যুবকদের মনোবলে ধ্বস নামে। তলোয়ার ও বর্শধারী হাত শিথিল হয়ে যায়।

অগ্নিপূজারী বাহিনীর মনোবল আগেই ভেঙ্গে গিয়েছিল। তারা যখন গগণবিদারী দু'টি নারাধ্বনি শোনে তখন তাদের পিলে চমকে যায়। তারা যুদ্ধ বাদ দিয়ে পলায়নের পথ খোঁজা আরম্ভ করে।

"খোদার কসম!" এটা কোনো মুসলমানের আওয়াজ ছিল "যুরথ্রুষ্ট্র পূজারীদের উভয় সালার মারা গেছে।" এই ঘোষণা চতুর্দিকে হতে থাকে।

ইরান বাহিনীর লোকেরাও চিৎকার দিয়ে বলতে থাকে "রোযবাহা এবং যরমোহর মারা গেছে।"

এরপর পুরো রণাঙ্গন জুড়ে এই আওয়াজ ওঠে "খালিদ বিন ওলীদ এসে গেছে ... খালিদ বিন ওলীদের সৈন্যরা এসে গেছে।"

এই আওয়াজ মাদায়েনের সৈন্যদের শেষ শক্তিটুকু নিশ্চিহ্ন করে দেয়। সেনারা এক এক করে ভাগতে শুরু করে। পলায়নকারীদের গতি ছিল খনাফিসের দিকে, যেখানে মাদায়েনের আরেকটি বাহিনী তাঁবু স্থাপন করে অপেক্ষা করছিল।

✪

খনাফিসের সৈন্যদের উপর হামলা করার জন্য হযরত খালিদ (রা.) সালার আবু লায়লাকে এই দিক-নির্দেশনা দিয়ে পাঠান যে, খনাফিস এবং হুসাইদে এক সময়ে হামলা হবে। কিন্তু বাস্তবে এমনটা হয় না। কারণ এই ছিল যে, খনাফিস উসাইদের তুলনায় দূরে ছিল। আবু লায়লা ৫ হাজার সৈন্য নিয়ে ঝড়ের বেগে চললেও সময়মত পৌঁছতে পারেন না। হুসাইদে পৌঁছেই কা'কা' আক্রমণ শুরু করে। বিলম্ব করার ক্ষতি এই হত যে, দুশমন সচেতন হয়ে যেত। কিন্তু বিলম্ব করাটাও উপকারী প্রমাণিত হয়। আর তা এভাবে যে, আবু লায়লা পৌঁছানোর কিছু পূর্বে খনাফিসের সেনাদের অবগতি মেলে যে, মুসলমানরা রোযাবাহ এবং যরমোহরকে মেরে ফেলেছে এবং সৈন্যরা যুদ্ধে মূলা-গাজরের মত কাটা পড়ছে।

আবু লায়লা যখন শত্রুদের মুখোমুখি হন তখন তাদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত পান। দুশমনের সংখ্যা কয়েক গুণ বেশি ছিল। আবু লায়লার বুঝে-শুনে সামনে অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজন ছিল। সরাসরি যুদ্ধ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। কৌশলীপন্থা অবলম্বন করার প্রয়োজন ছিল।

আবু লায়লা এই অপেক্ষায় ছিলেন যে, দুশমনরা আগে আক্রমণ করুক। ইতোমধ্যে হুসাইদ হতে পরাজিত সৈন্যরা আসতে শুরু করে। সর্বাগ্রে একটি দল আসে যাদের মধ্যে জখমী সৈন্য বেশি ছিল। তারা বিনা কারণে রণাঙ্গন ছেড়ে আসেনি–এটা প্রমাণ করতে তারা মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা এবং তাদের যুদ্ধের প্রচণ্ডতাকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে বর্ণনা করে। তারা সেখানে এমন ত্রাস সৃষ্টি করে যে, খনাফিসের সৈন্যদের মনোবল বিনা যুদ্ধে ভেঙ্গে পড়ে। পালিয়ে আসা সৈন্যরা এই খবর শোনায় যে, হযরত খালিদ স্বসৈন্যে এসে পড়েছেন।

খনাফিস সৈন্যদের বর্তমান সালার হয়েছিল মাহবুজান। বেশিরভাগ ঐতিহাসিক লিখেছেন, মাহবুজানসহ অন্যান্য সালারদের এ কথা বলা হয় যে, খালিদ চলে গেছে। তাই এ সুযোগে আক্রমণ করে মুসলমানদের শেষ করে দিতে হবে। কিন্তু বর্তমানের চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। মাহবুজান রোযবাহ এর সৈন্যদের অবস্থা শোনে এবং স্বীয় বাহিনীর মানসিকতা যাচাই করে। সাথে সাথে সে শুনতে পায় যে, হযরত খালিদ (রা.) স্বীয় বাহিনীসহ এসে পড়েছেন; তখন সে যুদ্ধ করার ইচ্ছা পরিত্যাগ করে এবং সৈন্যদের মার্চ করে চলে যাবার নির্দেশ দেয়।

আবু লায়লা বিনা যুদ্ধে বিজয় অর্জন করেন। তিনি কয়েকজন লোককে মাহবুজানের পেছন পেছন এটা দেখতে পাঠায় যে, তাদের গতি কোন্ দিকে এবং তারা যাচ্ছে কোথায়।

✪

হযরত খালিদ (রা.) যুদ্ধের যে পরিকল্পনা পেশ করেন, তা এমন ছিল যে, দুশমনের ওপর তিন দিক থেকে হামলা করতে হবে। হামলার স্থান পর্যন্ত এত নীরবে যেতে হবে, দুশমনরা যেন টের না পায়। হযরত খালিদ (রা.) সৈন্যদের তিনটি দলে ভাগ করেন। প্রতিটি অংশে কমপক্ষে পাঁচ হাজার অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য ছিল। এই তিনটি দল এক স্থানে নয়; বরং দূর-দূরান্তে বিভিন্ন স্থানে ছিল। হুসাইদ, খনাফিস এবং আয়নুত তামার– এই তিন স্থান থেকে তিনটি দলের মাযীহ্ পৌঁছানোর কথা হয়। হযরত খালিদ (রা.) হামলার রাতও নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। তবে প্রথম মাযীহের অনতিদূরে জমা হওয়ার পরিকল্পনা করা হয়। তিন দলই জমা হবে রাতের বেলায়। মাযীহতে শত্রুদের সৈন্য কত ছিল তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মাঝে মতভেদ দেখা যায়। তবে এটা বলা যায় যে, শত্রুদের সংখ্যা ষাট থেকে সত্তর হাজারের মধ্যে ছিল। এ বিশাল বাহিনীর উপর হামলাকারীদের সংখ্যা ছিল ১৫ হাজার মাত্র।

✪

এ ধরনের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা খুবই অসম্ভব ছিল। ৫ হাজার সৈন্যের জন্য সফরে নীরবতা রক্ষা করা সহজসাধ্য ছিল না। কিন্তু পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য অবশ্যই নীরবতা পালন করা জরুরী ছিল। দ্বিতীয় সমস্যা এই ছিল হযরত খালিদ (রা.) নিজে আয়নুত তামারে ছিলেন। সেখানে সৈন্যদের মাত্র একটি দল

ছিল। অপর দু'টি দল হুসাইদ এবং খনাফিস থেকে যাবার কথা ছিল। তাদের সাথে দূতের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করাও জরুরী ছিল। যাতে হামলাকারীরা সময় মত নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছতে পারে।

হামলার জন্য ৬৩৩ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ মোতাবেক ১২ হিজরীর শাবান মাসের চতুর্থ সপ্তাহের একটি রাত নির্ধারিত ছিল।

হযরত খালিদ (রা.)-এর মুজাহিদ বাহিনীর তিন অংশই নিজ নিজ স্থান হতে রওনা হয়ে যায়। ঘোড়ার মুখ বেঁধে দেয়া হয়েছিল। তিন বাহিনীই এ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল যে, কিছু লোক সামনে এবং ডানে-বামে ছড়িয়ে দিয়েছিল। তাদের কাজ এই ছিল যে, কোনো লোক পথিমধ্যে পেলে তাকে গ্রেফতার করা, যাতে সে শত্রুদের খবর দিতে না পারে। দুশমন সচেতন হয়ে গেলে মুসলমানদের সফলতা হুমকির মুখে পড়ত এবং শত্রুরা ফাঁদও পাততে পারত।

রাতে রওনা দিয়ে তিন বাহিনী সে রাতেই লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না। দিনের বেলায় সৈন্যদের লুকিয়ে রাখা হয়। পর্যবেক্ষণকারীরা দূর দূরান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। হযরত খালিদ (রা.) গুপ্তচরদের শত্রুদের অবস্থানস্থল মাযীহ পর্যন্ত পাঠিয়েছিলেন। তারা শত্রুদের গতিবিধি সম্পর্কে তথ্য পাঠাচ্ছিল। তাদের শেষ তথ্য এই ছিল যে, শত্রুদের মাঝে এখনও এমন কোনো কিছু দেখা যায় না, যার দ্বারা বোঝা যায় যে, তারা কোনো বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাচ্ছে। ঐতিহাসিকগণ লিখেন, শত্রুবাহিনী তাদের সর্বাধিনায়ক বাহমানের পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষায় ছিল। হযরত খালিদ (রা.) এসে পড়ার কারণে তাদের জন্য পরিস্থিতি বদলে গিয়েছিল। পটের পরিবর্তনের কারণে তাদের পরিকল্পনাতেও পরিবর্তন অপরিহার্য ছিল।

হযরত খালিদ (রা.) আয়নুত তামারে ছিলেন। আগেই তিনি জানতে পেরেছিলেন হুসাইদের সৈন্যরা পালিয়ে গেছে। অনেক পরে আবু লায়লার প্রেরিত দূত হযরত খালিদ (রা.)-এর কাছে পৌঁছে। দূত তাঁকে এ সংবাদ জানায় যে, খনাফিসের সৈন্যরা যুদ্ধ না করেই পালিয়ে গেছে। তারা সবাই মাযীহ গিয়ে ঈসায়ীদের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। সেখানে উপস্থিত সৈন্যদের কমান্ডার ছিল হুজাইল বিন ইমরান।

বিভিন্ন রণক্ষেত্রের পলায়নপর শত্রুদের জমা হওয়ার মাধ্যমে মাযীহতে বিশাল একটি বাহিনীর সমাগম হয়। হযরত খালিদ (রা.) এ সংবাদে চিন্তায়

পড়ে যান। তিনি অগ্নিপূজারীদের প্রধান কেন্দ্রস্থল মাদায়েনে হামলা করতে পারতেন। মাদায়েন ছিল ইরান বাহিনীর সমরশক্তির মূল কেন্দ্র। হযরত খালিদ (রা.) চিন্তা করছিলেন যে, তিনি ইরানীদের এই মূল শক্তিতে আঘাত হানতে পারেন কিনা। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক তবারী লিখেন, হযরত খালিদ (রা.) সালারদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। পরামর্শের পর এই সিদ্ধান্ত হয় যে, প্রথমে মাযীহের ফায়সালা করা হবে।

মাযীহের সৈন্যদের খতম করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ যতটা সহজ ছিল বাস্তবে তাদের খতম করা ততটা সহজ ছিল না। বিশাল এক বাহিনীকে মুষ্টিমেয় কিছু সৈন্য দ্বারা পরাজিত করা এক প্রকার অসম্ভবই ছিল। কিন্তু হযরত খালিদ (রা.) এই অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। তিনি এর জন্য এমন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, যা আজও সমরবিদদের নিকট নজিরবিহীন হিসেবে খ্যাত।

"আমার বন্ধুরা!" হযরত খালিদ (রা.) সালার, নায়েব সালার ও কমান্ডারদের ডেকে বলেন "খোদার কসম! তোমরা যত সফলতা অর্জন করেছ তা মানুষের সাধ্যের বাইরের ছিল। তোমরা পাঁচ গুণ অধিক শক্তিশালী ও বেশি সৈন্যদের যেভাবে কচুকাটা করেছ এবং পালাতে বাধ্য করেছ, তা তোমাদের স্বাভাবিক শক্তির উর্ধ্বে ছিল। তোমাদের মাঝে ছিল ঈমানী শক্তি। দৈহিক নয়; এই ঈমানী শক্তির জোরেই তোমরা লড়ে চলেছ। তোমাদের ত্যাগের বিনিময় আল্লাহ্ দিবেন। ... এবার আমি তোমাদের এক কঠিন পরীক্ষায় অবতীর্ণ করছি।"

"ইবনে ওলীদ!" সালার কা'কা' বিন আমর হযরত খালিদ (রা.)-কে বাধা দিয়ে বলেন "আপনি এসব বলা জরুরী মনে করছেন? কাবা ঘরের মালিকের কসম! আমরা ঐ আল্লাহর নির্দেশে লড়ছি, যিনি আপনাকে আমাদের নেতা বানিয়েছেন। নির্দেশ দিন, আমরা আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ব। এরপর আপনি আমাদের জ্বলন্ত শরীর দেখবেন।"

"ইবনে আমর! তোমার প্রতি আল্লাহর রহম হোক" হযরত খালিদ (রা.) বলেন। "আমি এ কথা বলা এ জন্য জরুরী মনে করছি, আমি তোমাদেরকে এবার সত্যিই আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দিতে যাচ্ছি। আমার ভয় হয়, কোনো মুজাহিদ যেন না বলে বসে যে, ওলীদের পুত্র সীমাহীন অবিচারমূলক

নির্দেশ দিয়েছে। ... আমার বন্ধুগণ! এবার আমাদের সত্যিকার অর্থেই জীবন বাজি রাখতে হবে। সমস্ত মুজাহিদদের বলে দাও, তোমাদের ধৈর্য ও অবিচলতার আরেকটি পরীক্ষা বাকী আছে আর সেটাকে আল্লাহর নির্দেশ মনে কর।"

✪

সে রাতেও মাযীহ ক্যাম্পে শত্রুবাহিনী গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিল, যে রাতে হযরত খালিদ (রা.)-এর তিনও দল পরিকল্পনা মোতাবেক মাযীহ এর সন্নিকটে পূর্ণ নীরবতার সাথে গিয়ে পৌঁছেছিল। কোনো কোনো ঐতিহাসিক এটাকে সম্পূর্ণ মোজেযা বলেছেন। অনেকের মতে, এটা ছিল হযরত খালিদ (রা.)-এর প্রদত্ত প্রশিক্ষণ এবং তাঁর উদ্ভাবিত নিয়মানুবর্তিতার ফসল।

অর্ধেক রাতের কিছু পর শত্রুদের উপর গযব ভেঙ্গে পড়ে। পুরো বাহিনী ঘুমন্ত ছিল। মুজাহিদরা স্থানে স্থানে আগুন লাগিয়ে দেয়, যার আলোয় লক্ষ্যবস্তু চেনা সহজ হয়ে যায়। মাদায়েন এবং ঈসায়ী বাহিনীর সৈন্যরা সামলানো এবং প্রস্তুতি নেওয়ার সুযোগ পায় না। মুসলমানরা নারাধ্বনি দিচ্ছিল। আহতদের আত্মচিৎকার ও আর্তনাদ ত্রাসের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল, যা শত্রুদের মনোবল চুরমার করে দেয়।

"মদীনার মুজাহিদগণ!" হযরত খালিদ (রা.)-এর নির্দেশে এই আওয়াজ বজ্রধ্বনির রূপ পরিগ্রহ করে যে, "কাউকে জীবিত ছাড়বে না, মূলা গাজরের মত সবাইকে কাট।"

শত্রুদের ঘোড়া যেখানে বাঁধা ছিল সেখানেই বাঁধা থাকে। আরোহী ঘোড়ার কাছে এগিয়ে যেতেই ভূপাতিত হচ্ছিল। মুসলমানরা রাতের আঁধার দ্বারা লাভবান হচ্ছিল। আঁধার দ্বারা দুশমনও লাভবান হয়। কিছু অগ্নিপূজারী এবং ঈসায়ী জীবিত পালিয়ে যায়। তাদের ক্যাম্প দেড়-দুই মাইল এলাকা জুড়ে ছিল। হামলা চালানো হয় ত্রিমুখী।

রাতভর চলে মারাত্মক হামলা। রাত পেরিয়ে সকাল হলে দেখা যায় দুশমনের বিশাল ক্যাম্পের কোথাও একজন সৈন্য জীবিত নেই। জিন্দা কেবল তারাই থাকে, যারা মুসলমানদের ফাঁদ পেরিয়ে যেতে পেরেছিল। অবস্থা খুবই শোচনীয় ছিল। যত দূর চোখ যায় শুধু লাশ আর লাশ পড়ে ছিল। এক লাশের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল অপর লাশ। আহতরা ছটফট করে বেহুঁশ হয়ে পড়ছিল। মৃত্যু এবং রক্তের গন্ধে বাতাস ছিল ভারী, পরিবেশ ছিল ভয়াবহ।

সালারদের তাঁবু চেক করা হয়। সেখানে মূল্যবান সামগ্রী পড়ে ছিল। মদের পেয়ালা সাজানো ছিল। প্রত্যেকটি জিনিস এমনভাবে পড়ে ছিল, মনে হচ্ছিল, তাঁবুর অধিকারী সবেমাত্র চলে গেছে এখনই ফিরে আসবে। কোনো সালারের নাম-গন্ধ পাওয়া যায় না। তারা জীবিত পালিয়েছিল। এখানের সৈন্যদের নেতা ছিল রবীয়া বিন বুযাইর।

গনীমতের মাল হিসেবে মুসলমানরা সবচেয়ে দামী হিসেবে যা পায় তা হলো, হাজারো ঘোড়া, যা তারা জিনসহ লাভ করে।

এর একটু আগে ছাননী এবং জুহাইল নামে দু'টি স্থান ছিল, যেখানে বনূ তাগাল্লুব, নমর এবং আয়াদের ঈসায়ীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাঁবু স্থাপন করে অবস্থান করছিল। তারাও মুসলমানদের চিরতরে খতম করতে ঘর থেকে বের হয়েছিল। ঈসায়ীদের নেতা আক্কাহ বিন আবী আক্কাহ-এর পুত্র বেলাল বিন আক্কাহও এসেছিল।

সে পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ নিতে ঈসায়ীদের সঙ্গে এসেছিল।

"খোদার কসম!" হযরত খালিদ (রা.) মোজেযা সমতুল্য বিজয় লাভ করার পর তার সালারদের বলছিলেন "আমি দাওমাতুল যান্দাল থেকে কসম করে এসেছিলাম, বনূ তাগাল্লুবের উপর এমনভাবে আক্রমণ করব যে, তারা আর কখনো ইসলামের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। ... বনূ তাগাল্লুবরা এখনো সামনে আছে। তাদের উপর আরেকটি আঘাতের প্রস্তুতি নাও।"

মাযীহ বসতির উপর মুসলিম গেরিলা বাহিনী আক্রমণ চালিয়েছিল। এটা ছিল খ্রিস্টান অধ্যুষিত এলাকা। সেখানে দুইজন মুসলমানকে ভুলবশত হত্যা করা হয়। তারা একসময় মদীনায় এসে ইসলাম কবুল করে এবং ফিরে এসে নিজের বসতিতে থাকে। মুজাহিদ বাহিনী তাদের না চিনে ঈসায়ী মনে করে হত্যা করে।

হযরত খালিদ (রা.) বিশাল এ বিজয়ের কথা খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত আবুবকর (রা.)-কে দূত মারফৎ জানান। বার্তায় এ তথ্যও ছিল যে, ঈসায়ীদের এলাকায় দুই ব্যক্তি ভুলবশত মুজাহিদদের হাতে মারা যায়। হযরত আবু বকর (রা.) বিজয়ের খবরের পাশাপাশি দু'জন মুসলমানের নিহত হওয়ার দুঃখজনক ঘটনাটিও সবাইকে শুনান।

"এর শাস্তি খালিদের হওয়া উচিত" হযরত উমর (রা.) বলেন। "মুসলমানের রক্ত মাফ হতে পারে না।"

"যারা কাফেরদের সাথে থাকে, তারা উদ্ভূত পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবেই মারা যেতে পারে" খলীফাতুল মুসলিমীন বলেন।

"এই হত্যার জন্য দায়ী খালিদ" হযরত উমর (রা.) পুনরায় বলেন। "তাঁর শাস্তি হওয়াই উচিত।"

"মদীনার বায়তুল মাল হতে উভয় নিহত ব্যক্তির রক্তপণ আদায় করে দেয়া হবে" হযরত আবু বকর (রা.) ফায়সালা শুনিয়ে দেন। "আর এই রক্তপনের বদলা ঐ দূতের হাতেই তুলে দেয়া হবে, যে বিজয়ের সংবাদ এনেছে।"

উমর (রা.) এরপরেও শাস্তির কথা বলেন।

"উমর!" খলীফাতুল মুসলিমীন ক্রুদ্ধস্বরে বলেন। "খালিদ ফেরত আসবে না। আমি ঐ তলোয়ারকে খাঁপে পুরতে পারি না, যাকে আল্লাহপাক কাফেরদের বিরুদ্ধে 'নাঙ্গা' করেছেন।" (সূত্র : তবারী, ইবনে হিশাম, আবু সাঈদ, হুসাইন হাইকেল।)

✪

মাযীহ রণাঙ্গনে মানুষের হাড়গোড় আর মাথার খুলি দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে পড়েছিল। শকুন, মরু শিয়াল, সাপ ও অন্যান্য প্রাণী সেসব পড়ে থাকা হাড় থেকে গোশত বের করে উদরপূর্তি করছিল। এটা ছিল ঐ অগ্নিপূজারীদের হাড়-গোড়, যারা আরব, ইরাক এবং সিরিয়ায় ত্রাস সৃষ্টি করেছিল।

এখানে ঐ ঈসায়ীদেরও হাড়-গোড় ছিল, যারা ইরান বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য এসেছিল। ঈসায়ীদের আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল, নিহত নেতাদের হত্যার প্রতিশোধ নেয়া। তারা এটাকে ধর্মযুদ্ধ হিসেবে অভিহিত করেছিল। তারা ইসলামের প্রসারমান রাস্তায় প্রতিবন্ধক হিসেবে ছুটে এসেছিল।

এসব হাড়-গোড়ের মধ্যে ঐ সমস্ত হাতের হাড়ও ছিল, যে হাত মুজাহিদ বাহিনীকে কচুকাটা করতে খাঁপ থেকে তলোয়ার বের করেছিল। সেসব হাতে বর্শাও ছিল। ঘোড়ার বাগডোরও ছিল তাদের হাতে। তারা এই ভেবে আত্মতৃপ্ত ছিল যে, আসমান জমিনের সমস্ত শক্তি তাদের হাতে চলে এসেছে। তারা মনে করত, তারা যখন ঘোড়ার পিঠে চেপে বসে তখন নিচের মাটি থরথর করে কাঁপতে থাকে। কিন্তু এখন তাদের পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে গিয়েছে। শুধু তাই নয়; মাটির তাদের দেহ কবুল করতেও অস্বীকার করে। যার ফলে ভাগ্যের নির্মম পরিহাস হিসেবে তাদের দেহগুলো কুকুর-শিয়ালের খাদ্যে পরিণত হয়েছে।

মাটি আল্লাহপূজারীদের বোঝা এবং ভারে কাঁপত না। আল্লাহর নির্দেশ কুরআনের মাধ্যমে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। যারা আল্লাহকে এক বলে স্বীকার করে তারা আল্লাহর এই নীতি সম্পর্কে অবগত থাকে যে, ঘাড় যতই উঁচু করা হোক, মাথা যতই উপরে তোলা হোক, পাহাড়ের থেকে কখনো উঁচু হবে না। এবং তুমি যত বড় প্রভাব-প্রতাপের অধিকারী হও না কেন, জমিনকে কখনও বিদীর্ণ করতে পারবে না।

আল্লাহপূজারীদের আল্লাহর এই ওয়াদার কথাও স্মরণ ছিল যে, দশজন মুমিন একশজন কাফেরের মোকাবেলা এবং বিশজন দুইশজনের মোকাবেলায় বিজয়ী হবে।

"মহান সেনাপতি ইবনে ওলীদ বলুক বা না বলুক, তোমরা নিজেরা কি জান না?" মুসলমানদের সালার আবু লায়লা তার কমান্ডার এবং তার চারপাশে জড়ো হওয়া সিপাহীদের লক্ষ্য করে বলছিলেন। "যদি তোমাদের থেকে ঈমান ছিনিয়ে নেয়া হয়, তাহলে তোমাদের কাছে শুধু গোশত আর হাড় রয়ে যাবে।... কী অবস্থা হবে এসব দেহের?... দেখ, ঐসব খুলি দেখ। তাদের হাড়ের উপরের গোশত খেয়ে ফেলা হয়েছে। এসব খুলির মধ্যে মগজ রয়েছে। কিন্তু এ মগজ এখন আর চিন্তা করার যোগ্য নেই। তার মধ্যে পোকা ঢুকে গেছে। মগজগুলো এখন পোকা-মাকড়ের খাদ্যে পরিণত হয়েছে।

তিনি একটু উঁচুস্থানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল ঐ প্রশস্ত ময়দানের দিকে যেখানে ইরান বাহিনী ও ঈসায়ী গোত্রীয় সৈন্যদের ক্যাম্প ছিল। সৈন্যরা নাচত, গাইত আর ফূর্তি করত। তাদের সালার এবং নেতারা মদপানে বিভোর হয়ে ছিল। মুজাহিদ বাহিনীর অতর্কিত হামলা তাদের উপর কেয়ামত হয়ে আঘাত হেনেছিল।

"... ঐ দেখ!" সালার কা'কা' বিন আমর তার অধীনস্থ সৈন্যদের বলছিলেন "এটা তাদের পরিণতি, যারা আল্লাহকে মানে নি। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহর রসূল বলে মানেনি। তারা নিজেরা নিজেদের খোদা বানিয়ে নিয়েছিল। তাদের নেতারা খোদার প্রতিনিধি ও দূত হয়ে বসেছিল। পারস্য সম্রাটরা আল্লাহর বান্দাদের নিজেদের বান্দা মনে করত। সেনাপতি হযরত খালিদ (রা.) বলেছেন, মুজাহিদদের বলো যে, আল্লাহ তোমাদের দেখছেন এবং তিনিই প্রতিদান দিবেন। তিনিই তোমাদের শরীরে এত শক্তি দিয়েছেন যে,

আরাম- বিশ্রাম ব্যতিরেকেই সফরের পর সফর করে তোমরা এগিয়ে চলেছ এবং প্রতিদিন নতুন নতুন লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হতে পারছ। এটা দৈহিক শক্তি নয়; বরং আত্মিক শক্তি। আর আত্মাকে শক্তি পৌঁছায় ঈমান।"

"মহান সেনাপতি বলেছেন, সবাইকে বলে দাও, তোমরা জমিনের উপর রাজত্ব করার জন্য লড়তে আসনি। বরং তোমরা কাফেরদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার জন্য লড়ছ" সালার যাবারকন তার কমান্ডারদের উদ্দেশে বলেন। "ইবনে ওলীদ বলেছেন, তোমাদের শরীরকে যদি ঈমান এবং দৃঢ় প্রত্যয় থেকে মুক্ত করে দেয়া হয়, তবে তা এখনই ধ্বসে পড়বে। শরীর তো অনেক আগেই লড়ে লড়ে শেষ হয়ে গেছে, এখন তোমাদের রূহ লড়ে যাচ্ছে।"

সালার আদী বিন হাতেম (রা.)ও তাঁর বাহিনীকে সর্বাধিনায়ক হযরত খালিদ (রা.)-এর এই বার্তা দিচ্ছিলেন। সালার আসেম বিন আমরও, যিনি সালার কা'কা বিন আমরের বড় ভাই ছিলেন– তাঁর মুজাহিদ বাহিনীর সাথে এই ধরনের কথাই বলছিলেন। হযরত খালিদ (রা.) তাঁর সমস্ত সালারদের বলেছিলেন যে, মুজাহিদদের দেহ লড়াই করার উপযুক্ত নেই। এটা দৃঢ় প্রত্যয়ের ফসল ছিল যে, এই দুর্বল এবং ভগ্ন দেহই প্রতি রণাঙ্গনে তাজা ও বলবান হয়ে যায়। হযরত খালিদ (রা.) সালারদের আরও বলেছিলেন, মুজাহিদদের মনোবল অটুট এবং চাঙ্গা রাখা খুবই জরুরী।

"শত্রুর পা উপড়ে গেছে" হযরত খালিদ (রা.) বলেছিলেন "শত্রু যদি আবার ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ পায়, তাহলে তা আমাদের জন্য ভয়াবহ হতে পারে। ... আমার বন্ধুগণ! যেভাবে আল্লাহপাক আমাদেরকে বিজয়ের পর বিজয় দান করছেন এই বিজয়ও সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়াতে পারে। আমাদের সৈন্যরা যেন এই ভেবে ভুল না করে যে, আমাদের পরাজয় হতে পারে না। তাদের ভাল করে বলবে, প্রতি ময়দানে শত্রুর বিরুদ্ধে জয়দানকারী একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। আল্লাহর কথা কখনও মন থেকে ভুলবে না এবং অহঙ্কার থেকে বেঁচে থাকবে।"

মদীনার মুজাহিদদের মনোবল পলায়নপর দুশমন, রণাঙ্গনে তাদের আহত হয়ে ছটফট করা এবং সারি সারি লাশের বহর দেখে চাঙ্গা হচ্ছিল। কিন্তু তারাও মানুষ ছিল। আর মানুষ ভুল-ভ্রান্তির শিকার হয়েই থাকে। মাথা গর্ব-অহঙ্কারে উচুঁ করতেই পারে। হযরত খালিদ (রা.)-এর এই আশঙ্কা ছিল। তিনি কাফেরদের উপর ত্রাস সৃষ্টি করে তাদের মানসিকভাবে দূর্বল করে দিয়েছিলেন।

কিন্তু সেসব ঐতিহাসিকের মতে, যারা রণবিদ্যায় অভিজ্ঞ ছিলেন- হযরত খালিদ (রা.)-এর এই শংকা ছিল, তাঁর সৈন্যরা এই পর্যায়ে পৌঁছবে না যে, একের পর এক বিজয়ের পর দুশমনদের প্রতিরোধে যদি একটু পিছিয়ে আসতে হয়, তাহলে সৈন্যরা একেবারে মনোবল হারিয়ে ফেলবে।

এই আশংকা হযরত খালিদ (রা.)-কে উদ্বিগ্ন করে তুলছিল। তিনি এই চিন্তা করতে পারছিলেন না যে, স্বীয় বাহিনীকে বিশ্রামের জন্য কিছুদিন সময় দিবেন। তিনি এমন যুদ্ধচাল সম্পর্কে চিন্তা করছিলেন যে, শত্রুদের অগোচরে হামলা করে নেস্তনাবুদ করে দিবেন। একটি চাল তিনি মাযীহ্ রণক্ষেত্রে প্রয়োগ করে সফল হয়েছিলেন। আর তা ছিল অতর্কিত হামলা। পুরো বাহিনী তিন দিক থেকে দুশমনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কিন্তু এর থেকে এটা জরুরী হয় না যে, এই চাল প্রতিবার সফলতার মুখ দেখবে। কেননা, পুরো বাহিনীর নিরবে শত্রু শিবির পর্যন্ত যাওয়া সহজ কাজ ছিল না।

শত্রুদের দু'টি দল দুই স্থানে সমবেত ছিল। একটি জুমাইলে আর অপরটি সান্নীতে। দুই স্থান সম্পর্কে মুসলিম বাহিনীর এই তথ্য ছিল যে, সেখানে ইরানী ও ঈসায়ী বাহিনী সমবেত হয়ে আছে। পরে হুসাইদের পলায়নপর সৈন্যরাও সেখানে গিয়ে আশ্রয় নিতে থাকে। মাযীহ্ থেকেও যেসব সৈন্য প্রাণ নিয়ে বেঁচে গিয়েছিল তারাও এক এক করে ঐ দুই স্থানে সমবেত হচ্ছিল।

এই পরাজিত ও পালিয়ে আসা সৈন্যরা সান্নী এবং জুমাইলে গিয়ে সমস্ত সৈন্যের মধ্যে রীতিমত ত্রাস সৃষ্টি করে। সেখানে সালার এবং নেতারাও ছিল। সৈন্যদের মানসিক দুর্বলতায় তারা বেশ চাপের মুখে পড়ে। তাদের চাঙ্গা মনোবল ম্লান হয়ে গিয়েছিল। দৈহিকভাবে সৈন্যরা তাজাদম থাকলেও মানসিকভাবে ছিল পর্যুদস্ত। সান্নীতে তাদের নারীরাও ছিল। অবুঝ-নাবালেগ সন্তানরাও। মহিলারা পুরুষদের কাপুরুষ আত্মমর্যাদাহীন বলে ধিক্কার দেয় এবং লড়াই করার জন্য প্রস্তুত করে।

✪

এই দুই স্থানে যুদ্ধের প্রস্তুতি রণাঙ্গনের মতই ছিল। পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যরা তলোয়ার চালানার প্রশিক্ষণ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত করতে থাকে। অশ্বারোহীদের হামলা করা, হামলা প্রতিহত করার ট্রেনিং দেয়া হচ্ছিল।

ইতোমধ্যে কিসরার সালার এবং তাদের মিত্রশক্তি ঈসায়ীদের নেতারা হযরত খালিদ (রা.)-এর রণকৌশল ধরে ফেলেছিল।

"কিন্তু চাল বুঝলে কি হয়!" ঈসায়ী গোত্রদের এক নেতা রবীয়া বিন বুজাইর বলছিল "মনোবল দৃঢ় থাকলে ক্ষুদ্র মুসলিম বাহিনীকে শায়েস্তা করা কোনো ব্যাপারই নয়।"

তার পাশে ঈসায়ীদের বড় নেতা আক্কাহ ইবনে আবী আক্কাহ-এর ছেলে বেলাল বিন আক্কাহ বসা ছিল। আক্কাহ বিন আবী আক্কাহ নেতাদের নেতা ছিল। সে সদম্ভে বলেছিল, খালিদের মাথা কেটে আনবে। কিন্তু আয়নুত তামারের রণাঙ্গনে সে খালিদের হাতে ধরা পড়ে। এর পূর্বে হযরত খালিদ (রা.) কসম করেছিলেন যে, তিনি আক্কাহকে জীবন্ত গ্রেফতার করবেন। হযরত খালিদ (রা.)-এর কসম পুরো হয়ে যায়। তিনি নিজ তলোয়ার দ্বারা আক্কাহর মাথা কাটেন। বেলাল আক্কাহর যুবক পুত্র ছিল। সে স্বীয় পিতার খুনের বদলা নিতে এসেছিল।

"ইবনে বুযাইর!" সে সর্দার রবীয়ার কথা শুনে বলে "আমি স্বীয় পিতার মাথার বদলে খালিদের মাথা নিতে এসেছি।"

"একের নয় আমাদের উপর হাজারো মাথার বদলা নেয়ার ঋণ রয়েছে" রবীয়া বিন বুজাইর বলে।

সে আরও কিছুক্ষণ কথা বলে। ইতোমধ্যে বেলাল বিন আক্কাহ চলে যায়। রাতের বেলা চলছিল এ আলোচনা। নভেম্বর মাস, রাত ঠাণ্ডা এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন। আকাশে রমযানের চাঁদ। বেলাল বাইরে এসে থেমে যায়। সে তার সেনাক্যাম্প হতে কিছুটা দূরে ছিল। এক দিক থেকে সে কাউকে এগিয়ে আসতে দেখে। নতুন চাঁদ। অন্ধকার রাতে চলমান একটি ছায়া সক্রিয় ছিল। ছায়াটি বেলালের দিকেই আসছে। নিকটে এলে দেখা যায় ছায়াটি কোনো পুরুষের নয় বরং একজন মহিলার।

"ইবনে আক্কাহ!" মহিলা বলে। "আমি সাবিহা।.... সাবিহা বিনতে রবীয়া বিন বুযাইর। ... আমার জন্য একটু দাঁড়াতে পার?"

"ওহ! রবীয়া বিন বুযাইরের মেয়ে!" বেলাল বিন আক্কাহ প্রফুল্ল কণ্ঠে বলে। "আমি কেবলমাত্র তোমাদের বাড়ী হতে এলাম না?"

"কিন্তু যা বলার তা আমি পিতার সামনে বলতে পারছিলাম না" সাবিহা বলে।

"তুমি আমাকে নিজের যোগ্য বলে মনে কর?" বেলাল বলে। "তুমি যা বলতে চাও তা পূর্ব হতেই আমার অন্তরে রয়েছে।"

"ইবনে আব্বাহ! ভুল বুঝনা!" সাবিহা বলে। "আগে আমার কথা শোন। ... আমাকে বল যে, আমার থেকে অধিক সুন্দরী তুমি কখনও দেখেছ?"

"না বিনতে রবীয়া!" বেলাল বলে।

"তুমি কখনও মাদায়েন গিয়েছ?" সাবিহা জানতে চায়।

"গিয়েছি!" বেলাল জবাব দেয়।

"শুনেছি পারস্যের মেয়েরা নাকি খুব রূপসী হয়" সাবিহা বলে। "তারা কি তবে আমার চেয়েও বেশি সুন্দরী?"

এটা কি ভাল হয় না যে, তোমার অন্তরে যা আছে তা আমাকে বলবে?" বেলাল জিজ্ঞাসা করে এবং বলে "আমি কোনো মেয়েকে তোমার থেকে অধিক সুন্দরী জানি না। তোমার পিতার কাছে আমি তোমার পানি প্রার্থনা করতাম। আমার জানা ছিল না যে, তোমার অন্তর পূর্ব হতেই আমার মহব্বতে ভরপুর।"

"মহব্বত তো এখনও সৃষ্টিই হয়নি" সাবিহা বলে। "আমি অন্য কাউকে চাই। তাও আজ থেকে নয়; সেদিন থেকে চাই, যেদিন অনুভব করেছিলাম যে, আমি বড় হওয়া শুরু করেছি এবং যৌবন এক সাথীকে চায়।"

"তাহলে তুমি আমাকে কী বলতে এসেছ?" বেলাল বিষণ্ন কণ্ঠে বলে।

"এ কথা বলতে যে, আমি তাকে আমার যোগ্য মনে করা ছেড়ে দিয়েছি" সাবিহা বলে। "পুরুষের শক্তি শুধু মহিলার দেহের উপর খাটানোর জন্য নয়। সে খুব শক্তিবান এবং সুন্দর। সে যখন ঘোড়ায় চেপে বসে তখন আমার আরও ভাল লাগে।"

"তাহলে তার কী হয়েছে?" বেলাল উৎসুক হয়ে জানতে চায়।

সে কাপুরুষতার পরিচয় দিয়েছে" সাবিহা বলে। "সে যুদ্ধ হতে পালিয়ে এসেছে। দুইবার সে কিছু দূর গিয়ে ফিরে আসে। আমার সন্দেহ লাগে যে, সে না লড়েই পালিয়ে এসেছে। সে আমার নিকট এসেছিল। আমি তাকে বলে দিয়েছি, সে যেন আমাকে ভুলে যায়। আমি কোনো কাপুরুষের স্ত্রী হতে পারি না। সে বিষয়টি আমার পিতাকে বলে দিয়েছে। পিতা এ কথা শুনে আমাকে বলেছে, তুমি তার স্ত্রী হতে যাচ্ছ। আমি পিতাকেও জানিয়ে দিয়েছি যে, রণাঙ্গণ থেকে

পালিয়ে আসা কোনো পুরুষের স্ত্রী আমি হব না। আমি পিতাকে এ কথাও বলেছি যে, আমাকে যদি তার স্ত্রী বানান তাহলে আমার লাশ যাবে তার ঘরে; প্রাণবন্ত দেহ যাবে না।"

"তবে কি তুমি আমার বীরত্বের পরীক্ষা চাও?" বেলাল জিজ্ঞাসা করে।

"হাঁ!" সাবিহা জবাবে বলে "আর তার পুরস্কার দেখ। এত সুন্দর দেহ তুমি আর কোথায় পাবে?"

"কোথাও নয়" বেলাল বলে। "তবে আমি একটি কাজের ওয়াদা করব না। আমাদের নেতারা এবং গোত্রীয় নবযুবকরা এই ঘোষণা দিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়তে যায় যে, মুসলমানদের সালার খালিদ বিন ওলীদের মাথা কেটে আনবে। অথচ পরে তারাই আগে মারা যায় অথবা পলায়ন করে। আমি এমন ওয়াদা করব না। খালিদের মাথা কে কাটবে? তার পর্যন্ত পৌঁছানোই যায় না!"

"আমি এমন ওয়াদা নিব না" সাবিহা বলে। "আমি তোমার মুখ থেকে নয়; বরং অন্যদের মুখ থেকে শুনতে চাই যে, তুমি সবার চেয়ে বেশি মুসলমান হত্যা করেছ এবং মুসলমানদের পরাজয়ে তোমার অবদান সবচেয়ে বেশি। আমি এই ওয়াদাও করছি, যদি তুমি মারা যাও তাহলে আর কারো স্ত্রী হব না। তোমার ভালবাসা ও বীরত্ব স্মরণ করে আজীবন কাটিয়ে দিব।"

"আমি তোমাকে একটি কথা বলতে চাই সাবিহা!" বেলাল বলে। "আমি তোমার কারণে যুদ্ধে যাচ্ছি না। আমার উপর পিতৃহত্যার প্রতিশোধের ঋণ আছে, আমাকে সে ঋণ পরিশোধ করতে হবে। আমার আত্মার প্রশান্তি তখনই মিলবে, যখন খালিদের শির আমার বর্শায় গাঁথা থাকবে। আমি তা বনূ তাগাল্লুবের প্রতিটি বাচ্চাকে দেখাব। কিন্তু আমি সে কথা মুখে আনতে চাই না, যা হাতে করতে পারব না। অবশ্যই তার পর্যন্ত পৌঁছাতে চেষ্টা করব। যে-ই বাধা হয়ে সামনে আসবে, তাকে হত্যা করতে থাকব। আমি ঘোড়া পরিবর্তন করেছি। এবারের ঘোড়াটি বাতাসের চেয়েও দ্রুততর এবং অধিক বলিষ্ঠ।"

"আমি তোমার শক্তি, বীরত্ব এবং তৎপরতা দেখতে চাই" সাবিহা বলে। "যদি এমনটি দেখাতে পার তাহলে আমাকে সঙ্গে নিয়ে চল। আমি তোমার পাশে থেকে পুরুষের মত যুদ্ধ করব। কিন্তু যদি পৃষ্ঠপ্রদর্শন কর, তাহলে আমার তলোয়ার তোমার পিঠে বসে যাবে।"

"আমি তোমাকে গনীমতের মাল হিসেবে মুসলমানদের হাতে তুলে দিতে পারি না" বেলাল বলে। "আর এটাও শুনে রাখ সাবিহা! আমার পিতা আব্বাহ বিন আব্বাহ এই অঙ্গীকার করে গিয়েছিল যে, সে খালিদ বিন ওলীদের রক্তে গোসল করে আসবে। কিন্তু সে অস্ত্র সমর্পণ করে নিজেকে মুসলমানদের হাতে তুলে দিয়েছিল। বলতে পারি না, মুসলমানদের কে বলে দিয়েছিল যে, এই লোকটি ইবনে ওলীদের রক্ত প্রবাহিত করার অঙ্গীকার করে এসেছে। ইবনে ওলীদ এর শাস্তিস্বরূপ আমার পিতাকে যুদ্ধবন্দীদের থেকে পৃথক করে এবং সকলের সামনে নিজের তলোয়ার দ্বারা তার মাথা কেটে ফেলে। ... আমি তোমাকেও এ কথা বলছি যে, তুমিও ঐ কথা বলবে না, যা তুমি করতে পারবে না।"

"আর আমিও তোমাকে একটি কথা বলতে চাই, যদিও কথাটি তোমার ভাল লাগবে না" সাবিহা বলে। "এবারও যদি আমার ঈসায়ী গোত্র যুদ্ধে হেরে যায়, তাহলে আমি নিজেকে নিজে মুসলমানদের হাতে হাওলা করে দিব এবং তাদের বলব যে, আমি সে পুরুষের স্ত্রী হতে চাই, যে সবচেয়ে বীর-বাহাদুর।"

"আমরা সর্বাত্মকভাবে এই চেষ্টা করব, যাতে মুসলমানরা আমাদের মহিলাদের পর্যন্ত পৌঁছাতে না পারে" বেলাল বিন আব্বাহ্ বলে। "কিন্তু কেউ বলতে পারে না যে কী হবে? একদিকে তোমার অন্তরে মুসলমান-বিদ্বেষ রয়েছে অপরদিকে তুমি আবার নিজেকে তাদের হাতে তুলে দিতে চাও-এটা কেমন কথা?"

"আমি এ কথা এ জন্য বলেছি যে, আমার অন্তরে কিছু সংশয়-সন্দেহ সৃষ্টি হচ্ছে" সাবিহা বলে। "আমার এরকম মনে হচ্ছে, যেন মুসলমানদের ধর্মই সঠিক। এত কম সৈন্য নিয়ে তারা পারস্য ও আমাদের সমস্ত গোত্রের সৈন্যদের প্রত্যেক রণাঙ্গনে পরাজিত করে আসছে। এর কারণ এছাড়া আর কী হতে পারে যে, তারা কোনো গায়েবী শক্তির দ্বারা শক্তিপ্রাপ্ত। যদি হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর পুত্র হতেন, তবে আল্লাহ কি তার পুত্রের উম্মতদের এভাবে লাঞ্ছিত করতেন? আমাকে বলার কেউ নেই যে, মুসলমানরা ঐ খোদাকেই আল্লাহ বলে নাকি তাদের আল্লাহ ভিন্ন।"

"এমন কথা বলো না সাবিহা!" বেলাল ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলে। "তুমি মস্ত বড় নেতার মেয়ে। নিজের ধর্মের ব্যাপারে এমন সন্দেহ করো না, যার শাস্তি আমাদের সবাইকে ভোগ করতে হয়।"

"ইবনে আক্কাহ! আমি অপারগ!" সাবিহা বলে। "আমার ভেতর থেকে কেমন যেন এক ধরনের আওয়াজ বের হয়। কখনও মনে হয় যে, আমি আমার গোত্র ও নিজ ঘরে পরদেশী। এমন লাগে যে, আমি অন্য কোথাকার অধিবাসী। ... আমি কিছু বুঝি না বেলাল! আমি যা বলছি তা করে দেখাও। এরপর আমি তোমার হয়ে যাব।"

"এমনি হবে সাবিহা!" বেলাল তার দুই হাত নিজের দু'হাতের মধ্যে নিয়ে বলে।

"আমি যদি জীবিত ফিরি তবে বিজয়ীবেশেই ফিরব। আর যদি মারা যাই তবে প্রত্যাবর্তনকারীদের কাছে জিজ্ঞাসা করবে যে, আমি মারা যাওয়ার পূর্বে কতজন মুসলমানকে হত্যা করেছি।"

বেলাল এই কথা বলে সান্নীর রাতের আঁধারে গায়েব হয়ে যায়। সাবিহা বিনতে রবীয়া সেখানেই ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থেকে বেলালের ছায়ার মত হারিয়ে যাওয়া পথের দিকে চেয়ে থাকে।

✪

এরপর তিন বা চার রাত অতিবাহিত হয়। সান্নীর তাঁবু এবং ঈসায়ীদের বসতিসমূহ অন্ধকারে ডোবা ছিল। ১২ হিজরীর রমযানের তৃতীয় বা চতুর্থ তারিখের চাঁদ আকাশে উঠেছিল। সে রাতের আঁধারে মানবরূপী এক সয়লাব সান্নীর দিকে এগিয়ে আসছিল। এটা ছিল মদীনার মুজাহিদ বাহিনী, যাদের পুরোপুরি সয়লাব বলা চলে না। কেননা, তাদের সংখ্যা পনের বা ষোল হাজারের মধ্যে ছিল। অপর দিকে প্রতিপক্ষের সংখ্যা ছিল এর থেকে তিন-চারগুণ বেশি। হযরত খালিদ (রা.) সান্নীর উপরও মাযীহের মত পরিকল্পনা প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি মুজাহিদদের বলেছিলেন, দুশমনদের বেশি সময় সুযোগ দেয়া বিপদজনক হবে। আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন। জয়-পরাজয় তাঁরই হাতে। আমরা আল্লাহ তা'আলার নামে কাফেরদের জ্বালানো আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়েছি। হযরত খালিদ (রা.) আরও অনেক কিছু বলেছিলেন। মুজাহিদদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা পূর্বের মতই ছিল। শরীর পূর্বের মত তাজাদম না থাকলেও হিম্মত ও জযবা পূর্বের থেকে কোনো অংশে কম ছিল না।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, পনের ষোল হাজার সৈন্য দ্বারা গেরিলা আক্রমণ করা এই জন্য বিপদজনক ছিল যে, এত লোকের পক্ষে নিরবতা পালন করা এক প্রকার দুঃসাধ্যই ছিল। যে কোনো সময় শত্রুরা মুসলমানদের আগমণ ও আক্রমণ সম্পর্কে জেনে যেতে পারত। আর তাতে পরিকল্পনা ভেস্তে যেত।

শত্রুদের ফাঁদ পাতার সম্ভাবনাও তখন সৃষ্টি হত। হযরত খালিদ (রা.) এই আশংকা রোধ করার ব্যবস্থা এই নিয়ে রাখেন যে, তিনি পূর্বের মতই সৈন্যদেরকে তিন ভাগে ভাগ করেন। সালারও তারা ছিলেন যাদের পূর্বে অতর্কিত হামলার অভিজ্ঞতা ছিল।

শত্রুদের আশেপাশে থাকা গুপ্তচররা দুশমনের অবস্থানস্থলের যে তথ্য দিচ্ছিল, সে অনুযায়ী জানা যায় যে, মাদায়েন বাহিনী আর ঈসায়ী বাহিনী এক স্থানে ছিল না। ক্যাম্পে শুধু মাদায়েনের সৈন্য ছিল। ঈসায়ীরা নিজেদের এলাকাতেই ছিল। এটা ছিল বনূতাগাল্লুবের এলাকা। গুপ্তচররা এই এলাকার লোকেশান বলে দিয়েছিল। হযরত খালিদ (রা.) ফৌজের এক অংশের কমান্ড সালার কা'কা'কে, দ্বিতীয় অংশের কমান্ড সালার আবু লায়লাকে দিয়েছিলেন। তৃতীয় অংশের কমান্ড নিজের হাতে রেখেছিলেন। তিনি কা'কা, এবং আবু লায়লাকে ঈসায়ী গোত্রীয় সৈন্যদের উপর আক্রমণ করতে পাঠান এবং নিজের অংশকে তাদের পশ্চাতে রাখেন। পেছনে থাকার কারণ এই ছিল যে, হযরত খালিদ (রা.) সেনা ক্যাম্পে গেরিলা আক্রমণ করতে চান, যাদের অবস্থান ঈসায়ী বসতির কাছাকাছি ছিল। কথা ছিল তিন দলই এক সময়ে আক্রমণ করবে। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, হযরত খালিদ (রা.) নির্দেশ দেন, যুদ্ধে কোনো মহিলা এবং শিশুর গায়ে হাত তুলবে না। মাযীহতে কাফেরদের এ অভিজ্ঞতা হয়েছিল, মুসলমানদের গেরিলা আক্রমনের দৃশ্য কেমন ভয়াবহ হয়। এই জন্য তারা সান্নী -এর সেনাক্যাম্পের চতুর্দিকে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা রেখেছিল। সান্ত্রীদের টহলের ব্যবস্থাও ছিল। চারজন করে অশ্বারোহী দূর-দূরান্ত পর্যন্ত প্রদক্ষিণ করছিল। মুসলিম গুপ্তচররা হযরত খালিদ (রা.)-কে এই তথ্যও জানিয়ে দিয়েছিল। হযরত খালিদ এমন চাল চালেন যে, তাদের প্রহরাও বেকার যায়।

সান্ত্রীর অদূরে পরিকল্পনা মোতাবেক মুজাহিদ বাহিনী থেমে যায়। সামনে থেকে সবুজ সংকেত পেয়ে তাদের অগ্রসর হওয়ার কথা ছিল। মুসান্না বিন হারেছার অনুগত গেরিলা বাহিনীর কয়েকজন উষ্ট্রারোহী সম্মুখপানে চলে গিয়েছিল। তারা উটের কাফেলার মত চলছিল। তারা সান্নীর সেনাক্যাম্প হতে দূরেই ছিল। ইত্যবসরে তাদেরকে কেউ হুঁশিয়ার করে দেয়। তারা থেমে যায় এবং তাদের দিকে আগুয়ান ঘোড়ার ঘণ্টাধ্বনি শুনতে থাকে। চারটি ঘোড়া তাদের কাছে এসে থেমে যায়।

"তোমরা কারা?" এক অশ্বারোহী তাদের জিজ্ঞাসা করে।

"মুসাফির" এক উষ্ট্রারোহী ভয়ার্তকণ্ঠে জবাব দেয় এবং কোনো বসতির নাম নিয়ে বলে যে, তারা সেখানে যাচ্ছে।

উষ্ট্রারোহীরা ৮/১০ জন ছিল। তাদের মধ্য হতে একজন তো বলছিল যে, তারা কোথা হতে এসেছে এবং যাচ্ছে কোথায়! অন্যান্য আরোহীরা উটকে আস্তে আস্তে নাড়া দিতে থাকে যাতে চার ঘোড়সওয়ার তাদের লক্ষ্যবস্তুর সীমানার মধ্যে চলে আসে।

"উট থেকে নিচে নেমে আস" এক অশ্বারোহী গম্ভীর কণ্ঠে নির্দেশ দেয়।

চার উষ্ট্রারোহী এভাবে নিচে নেমে আসে যে, উপর থেকে এক একজন অশ্বারোহীকে জাপটে ধরে। তাদের হাতে থাকা খঞ্জর অশ্বারোহীদের দেহে আমূল বিদ্ধ হয়। অতঃপর তাদের ঘোড়া হতে নামিয়ে হত্যা করা হয়। চার মুজাহিদ চার ঘোড়ায় চড়ে বসে এবং শত্রুদের ক্যাম্পে চলে যায়। এক প্রহরী তাদের নিজেদের অশ্বারোহী মনে করে কাছে আসে। অন্ধকারে দুই অশ্বারোহী নিচে নেমে আসে এবং ঐ প্রহরীকে চিরকালের জন্য ঘুম পড়িয়ে দেয়।

তারা এভাবে আরও কয়েকজন প্রহরীকে নীরবে খতম করে ফিরে চলে আসে। হযরত খালিদ (রা.) অস্থির হয়ে তাদের অপেক্ষায় ছিলেন, যারা উটে চড়ে গিয়েছিল। তারা ফিরে আসে অতিরিক্ত চারটি ঘোড়া নিয়ে। তারা হযরত খালিদ (রা.)-কে জানায়, রাস্তা পরিষ্কার।

হযরত খালিদ (রা.) নিরবতা বজায় রেখে দূতদের অন্যান্য সালারদের নিকট এই বার্তা দিয়ে পাঠান যে, হামলা শুরু কর। এর আগ পর্যন্ত ঘোড়ার মুখ বন্ধ ছিল। মুখ বন্ধ থাকার কারণে তারা আওয়াজ করতে পারে না। সালারদের নির্দেশে অশ্বারোহীরা অশ্বের মুখ খুলে দেয়। তাদের লক্ষ্যস্থল দূরে ছিল না। কিছুদূর পর্যন্ত ঘোড়াকে ধীরে ধীরে চালানো হয়। এরপর গতি বাড়িয়ে দেয়া হয়। ফলে পদাতিক বাহিনীকে দৌড়াতে হয়।

সেনা ক্যাম্পের কাছে গিয়ে আগুন জ্বালানো হয়। হযরত খালিদ (রা.) তাঁর বাহিনীকে বেশি দ্রুত অগ্রসর করলেন না। তিনি সৈন্যদের গেরিলা আক্রমণের জন্য বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে দিলেন।

এটা ছিল এমন অগ্রযাত্রা, যাতে না ছিল কোনো নারাধ্বনি, আর না ছিল কোনো হুংকার-গর্জন।

✪

৬৩৩ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ ১২ হিজরীর রমযান মাসের প্রথম সপ্তাহের রাত খুব শীতের ছিল। বনূ তাগাল্লুবের বসতি এবং পারসিকদের বিস্তৃত সেনাক্যাম্পের মধ্যে অবস্থানরত সৈন্যরা গরম লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়েছিল। কেউ বলতে পারে না, তাদের কে কোন স্বপ্ন দেখছে। তবে এটা বলা যেতে পারে যে, প্রত্যেকের মাথায় মুসলিম ফৌজ এবং তাদের ত্রাস আচ্ছন্ন ছিল। মানুষজন মুসলিম বাহিনীর আলোচনা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

হঠাৎ বসতিতে কেয়ামত শুরু হয়ে যায়। ঘরের দরজা ভেঙ্গে পড়ছে। অলি-গলি দিয়ে ঘোড়া ছুটছে। মুজাহিদরা ঘর-বাড়ী হতে খাট, আসবাবপত্র বের করে একস্থানে জমা করে আগুন জ্বালিয়ে দেয়, যাতে বসতি আলোকিত হয়ে যায়। নারী এবং বাচ্চাদের চিৎকার শীতের রাতকে গরম বানিয়ে দেয়।

"মহিলারা বাচ্চাদের নিয়ে বাইরে এসে একস্থানে দাঁড়িয়ে যাও" এটা ছিল মুজাহিদদের ঘোষণা, যা বারবার শোনা যাচ্ছিল।

বনূ তাগাল্লুবের লোকেরা পাইকারী হারে কাটা পড়ছিল। হযরত খালিদ (রা.)-এর নির্দেশ ছিল, বৃদ্ধ, নারী এবং বাচ্চারা ব্যতীত কাউকে জীবিত রাখবে না।

তাদের সেসব সৈন্যরা বাঁচতে পারত যারা একটু দূরে সেনাক্যাম্পে ছিল। বসতির লোকজনের আর্তচিৎকার তাদের কানে পৌঁছে কিন্তু সেখানে ঘুম এবং প্রচণ্ড শীত তাদের বেহুঁশ করে রেখেছিল। সৈন্যদের জাগানোর জন্য কোনো প্রহরী জীবিত ছিল না।

পরিশেষে সেনাক্যাম্পের কিছু লোক জেগে যায়। তারা আশেপাশের বসতিতে আগুন লাগা দেখে এবং চিৎকারও শুনতে পায়। তারা তখনও বুঝে উঠতে পারছিল না যে, ব্যাপারটা কী। ইতোমধ্যে সেনাক্যাম্পের একদিকে হৈচৈ পড়ে যায়। ক্রমে হৈ চৈ বাড়ছিল এবং ছড়িয়ে পড়ছিল। কিছু তাঁবুতে আগুন ধরে যায়। হযরত খালিদ (রা.)-এর বাহিনী ইরানীদের কচুকাটা করতে শুরু করে। তন্দ্রাচ্ছন্ন সেনারা নিরস্ত্রভাবে হত্যার শিকার হওয়া ছাড়া কিছুই করতে পারছিল না।

কিছু সৈন্য প্রাণের ভয়ে তাঁবুর উপরে উঠে পড়েছিল। মুসলমানরা তাদের ধরতে তাঁবুর রশি কেটে দেয়। এতে সেনারা নতুন ফাঁদে পড়ে। মুসলমানরা তাদের বর্শা দিয়ে হত্যা করে। মুসলমানদের নারাধ্বনি এবং শ্লোগান বজ্রের মত ভয়ানক ছিল।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, মুসলমানদের দ্বিতীয়বারের মত বিশাল মাত্রায় গেরিলা আক্রমণের অভিজ্ঞতা হয় এবং এতে তাঁরা পূর্ণ সফলতাও লাভ করে। পূর্ব হতেই এই ব্যবস্থা নেয়া ছিল যে, একজনও যেন পালিয়ে যেতে না পারে। বসতি এবং সেনাছাউনীর আশেপাশে মুসান্না বিন হারেছার অশ্বারোহীরা প্রদক্ষিণ করছিল। কেউ পালিয়ে যেতে চাইলে তাঁরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করত এবং বর্শা বা তলোয়ার দিয়ে তাকে শেষ করে ফেলত। কোনো নারীকে পালিয়ে যেতে দেখলে তাকে ধরে ঐ স্থানে পৌঁছে দেয়া হতো, যেখানে নারী ও শিশুদের জড়ো করে রাখা হয়েছিল।

রাত যতই বাড়তে থাকে বনূ তাগাল্লুবের বসতি এবং ইরানীদের সেনা ছাউনীতে শোরগোল ও আর্তচিৎকার ততই বাড়ছিল। মৃত্যুযাত্রী এবং আহতদের আর্তনাদে আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে গিয়েছিল। মুসলমানদের ধ্বংস করার জন্য যারা বের হয়েছিল তাদের লাশ বরফে জমে যাচ্ছিল। তাদের আহত ও পিপাসার্ত সৈনিকরা তিলে তিলে ধুঁকে মরছিল। তাদের স্ত্রী ও কন্যারা ছিল মুসলমানদের কব্জায়।

✪

সকাল হলে প্রভাত রবি এক ভয়াবহ ও ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে। লাশ ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছিল না। চতুর্দিকে লাশ আর লাশ পড়ে ছিল। লাশগুলো ছিল রক্তে রঞ্জিত। মুসলমানদের এই বিজয়ে কিসরার বাহু কেটে গিয়েছিল। সেনাছাউনি আর ঈসায়ী বসতি মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছিল। যে ঘোড়ার ব্যপারে তাদের গর্ব ও অহঙ্কার ছিল, সে ঘোড়া সেখানেই বাঁধা ছিল, যেখানে গতকাল সন্ধ্যায় বাঁধা হয়েছিল।

মহিলা আলাদা স্থানে কাঁদছিল। বাচ্চারা চেঁচামেচি করছিল। হযরত খালিদ (রা.) নির্দেশ দেন যে, সর্বপ্রথম মহিলা, শিশু ও বয়স্কদের খানা দাও।

যুদ্ধ শেষ। শত্রুবাহিনী খতম। মুজাহিদরা গনীমতের মাল কুড়িয়ে একস্থানে জড়ো করছিল। সালার আবু লায়লার কাছে এক অপূর্ব সুন্দরী মহিলাকে আনা হয়। সে নিবেদন জানিয়েছিল যে, সে সর্বাধিনায়ক অথবা কোনো সালারের সঙ্গে কথা বলতে চায়।

“এ এক নেতার মেয়ে’ তাকে যে আনে সে সালার আবু লায়লাকে বলে। “নেতার নাম রবীয়া বিন বুযাইর বলছে। সে তার পিতার লাশের কাছে বসে পড়ে কাঁদছিল।”

"তোমার নাম কী?" আবু লায়লা মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করে।

"সাবিহা!" মেয়েটি জবাবে বলে "সাবিহা বিনতে রবীয়া বিন বুযাইর। ... আমার পিতা অস্ত্র ধরারই সুযোগ পাননি।"

"শুধু এটুকু বলার জন্যই তুমি প্রধান সেনাপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাও?" সালার আবু লায়লা জিজ্ঞাসা করেন। "যারা লড়াই করার সুযোগ পেয়েছিল তাদের পরিণতি তুমি দেখনি? ... সত্যি করে বল, তুমি চাও কী?

"আপনারা কি আমাকে এটুকু অনুমতি দিবেন যে, আমি লাশের স্তূপের মাঝে একজনের লাশ তালাশ করব?" সাবিহা বলে "তার নাম বেলাল বিন আক্কাহ।"

"ভস্মীভূত গাছ-পালার মাঝে নির্দিষ্ট একটি গাছ তুমি অনুসন্ধান করে ফিরবে?" আবু লায়লা জিজ্ঞাসা করেন। "তুমি তাকে খুঁজে কী করবে? জিন্দা থেকে থাকলে সে আমাদের হাতে বন্দী হয়ে আছে আর যদি মারা যায় তাহলে তাকে নিয়ে কোনো স্বপ্ন দেখা বৃথা।"

সাবিহা সালার আবু লায়লাকে ঐ আলাপ শুনিয়ে দেয় যা তার এবং বেলাল বিন আক্কাহর মাঝে হয়েছিল। সাথে সাথে এটাও জানায়, সে দেখতে চায় যে, বেলাল জীবিত আছে না মারা গিয়েছে।

মুসলিম সেনাপতিগণ কতিপয় ঈসায়ীকে এই উদ্দেশ্যে জীবিত গ্রেফতার করেছিল যে, তাদের থেকে যুদ্ধস্থল, আশেপাশের লোকজন ও রণাঙ্গন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা যাবে। আবু লায়লার নির্দেশে এমন তিনজন লোক ডেকে তাদের কাছে বেলাল বিন আক্কাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়।

"দু'তিন দিন পূর্ব পর্যন্ত সে এখানেই ছিল" এক ঈসায়ী বলে। "সে জুমাইল চলে গেছে।"

"তার সেখানে থাকা উচিত ছিল নাকি এখানে?" আবু লায়লা প্রশ্ন ছুঁড়ে মারেন।

"তিনি গোত্র প্রধানের সন্তান" ঈসায়ী লোকটি বলে। "তিনি কারো হুকুমের অধীন নন; বরং তিনি নির্দেশদাতাদের একজন ছিলেন।"

সে কি পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে এসেছে?

তিনি কয়েকবার বলেন যে, তিনি ইবনে ওলীদ হতে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিবেন" আরেক ঈসায়ী বলে।

"এখন বলার কী আছে তোমার?" আবু লায়লা সাবিহার কাছে জানতে চান।

"আমি আপনার বন্দিনী" সাবিহা বলে। "আপনি আমার সঙ্গে বাঁদী ও বন্দীদের মত আচরণ করলে আপনাকে বাধা দেয়ার সাধ্য আমার নেই। তবে শুনেছি মুসলমানদের অন্তর নরম এবং তারা দয়াশীল। আমার একটি নিবেদন আছে। ... আমি এক সর্দারের মেয়ে। আমার এই মর্যাদা রক্ষা করা সম্ভব হবে কি?"

"ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের মাঝে কোনো ভেদাভেদ নেই" আবু লায়লা বলে। "আমরা তাকেও আমাদের নেতা হিসেবে বরণ করে নিই যার বাপ-দাদারাও স্বপ্নে কোনো দিন নেতৃত্ব কী জিনিস দেখেনি। আমরা এ ব্যাপারে কেবল এতটুকু দেখি যে, সে নেতৃত্ব দেয়ার যোগ্যতা রাখে কিনা এবং তার আখলাক-চরিত্র উন্নত কিনা। ব্যক্তিস্বার্থকে সে প্রাধান্য দেয় কিনা। ... ভেঙ্গে পড়োনা সর্দার-কন্যা! তুমি সুন্দরী এবং অভিজাত। এমন হবে না, যে কেউ ইচ্ছা তোমাকে বিবাহ করে নিবে।"

"আপনাদের হাতে বন্দী হওয়ার পর থেকে আমার সমস্ত পছন্দ অপছন্দ শেষ হয়ে গিয়েছে" সাবিহা বলে। "আমাকে নিজের পছন্দের ব্যাপারে সামান্যতম স্বাধীনতা দেয়া হলে আমি আপনাদের মধ্য হতে তার স্ত্রী হওয়া পছন্দ করব, যিনি সবচেয়ে বড় বাহাদুর হবেন, নিজের জাতি ও গোত্রের ইজ্জত ও মান রক্ষার্থে জীবন কুরবানী দিবেন; রণাঙ্গন হতে পিছু হটবেন না। ... মেয়েরা যাদের অধীনে থাকে তাদের মাজহাবই হয় তার মাজহাব। তবে স্বতন্ত্র আকীদা-বিশ্বাস যারটা তার অন্তরে ঠিকই বিদ্যমান থাকে। পুরুষ মহিলার শরীরের অধিকার লাভ করতে পারে কিন্তু তার মনের মালিক কেউ জোর করে হতে পারে না। ... আমার ইস্পাতদৃঢ় প্রত্যয় হলো, যদি জীবনে এমন কোনো বাহাদুরের সাক্ষাৎ মেলে, যে সমাজ ও গোত্রের মর্যাদা জ্ঞানে রণাঙ্গন কাঁপিয়ে তোলে এবং সর্বাত্মক আত্মত্যাগে সর্বদা প্রস্তুত থাকে, তাহলে তাকে আমার মন উপহার দিব এবং তার আকীদা-বিশ্বাসের উপর নিজের আকীদা বিশ্বাস কুরবানী করব।"

"আল্লাহর কসম! তুমি আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন এবং বিচক্ষণ নারী" আবু লায়লা বলেন। "আমি তোমাকে ঐ ওয়াদা বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, যা

বেলাল বিন আক্কাহ তোমাকে দিয়েছিল। তবে শর্ত হলো, বেলালকে তার ওয়াদা পূরণ করতে হবে। তাকে নিজ হাতে আমাদের সর্বাধিনায়ক হযরত খালিদ (রা.)-কে হত্যা করতে হবে। কিন্তু বিনতে রবীয়া। বেলাল কখনও তা পারবে না। কারণ, ইবনে ওলীদের মাথা আল্লাহর হেফাজতে। তাকে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'সাইফুল্লাহ' আল্লাহর তরবারী আখ্যা দিয়েছেন।... তারপরও তুমি অপেক্ষা কর। জুমাইলে বেলালের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হবে।"

"আমি কি আমার ঘরে অবস্থান করতে পারি?"-সাবিহা জানতে চায়।

"সে ঘরে কি আছে?" আবু লায়লা বলেন। "সেখানে তোমার পিতা, ভাই এবং বডিগার্ডদের লাশ ছাড়া আর কিইবা আছে? এখানে নিজের গোত্রের মহিলাদের সঙ্গেই থাক। এখানে থাকতে তোমার কষ্ট হবে না। আমাদের কোনো লোক তোমাদের কোনো মহিলার নিকটবর্তী হবে না।"

সাবিহা বিনতে রবীয়া ভারাক্রান্ত হৃদয়ে উদাসভাবে জনৈক মুজাহিদের সঙ্গে ঐদিকে চলে যায়, যেখানে বন্দী মহিলা ও বাচ্চাদের রাখা হয়েছিল। তার চলনে উদাসভাব এবং চেহারা চিন্তাক্লিষ্ট থাকলেও সেখানে এক ধরনের গাম্ভীর্য লুকিয়ে ছিল। এটা এ কথার স্পষ্ট প্রমাণ বহন করছিল যে, সে কোনো সাধারণ চরিত্রের মেয়ে নয়; বরং উন্নত চরিত্র ও অভিজাত রমণী।

"ইবনে হারেসা!" হযরত খালিদ (রা.) বিজয়ের খুশিতে বাগবাগ হয়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে মুসান্না বিন হারেসাকে বলেন। "আল্লাহ কী তোমার সকল সাধই পূরণ করেন নি?"

"নিঃসন্দেহে, নিঃসন্দেহে!" মুসান্না বিন হারেসা গদগদ কণ্ঠে বলেন কাফেরদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বলবে, মুসলমানরা তাদের পিতৃ-পুরুষদের উপর অনেক অত্যাচার-অবিচার করেছে। আর আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তাদের আল্লাহর এই ঘোষণা শুনিয়ে দিবে, যাদের উপর অবিচার হয়েছে তারা যদি জালিমের উপর জুলুম করে তাহলে এ জন্য তাদের ব্যাপারে কোনো অভিযোগ নেই।...

"আপনি জানেন না ইবনে ওলীদ! এই অগ্নিপূজক এবং ক্রুশপূজারীরা আমাদের উপর কেমন অমানসিক জুলুম করেছে। আপনি জানেন না। আপনি শোনেননি, কিন্তু আমরা সবই মুখ বুজে সয়েছি।"

"এখন এসব লোকেরা আল্লাহর হাতের নাগালে এসে গেছে" হযরত খালিদ (রা.) বলেন। "কিন্তু ইবনে হারিসা! আমি দম্ভ-অহংকারকে ভয় করি। ... বারবার মনে হচ্ছে, হজ্বে যাব। আমি কাবা ঘরে গিয়ে আল্লাহর শোকর আদায় করব। জানি না আল্লাহপাক আমার এই তামান্না পূরণ করবেন কিনা!"

"আপনি হজ্বের নিয়ত করলে আল্লাহ আপনাকে হিম্মত দান করবেন এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগও সৃষ্টি করে দিবেন " মুসান্না বলেন।

বেশ কিছু সময় পরে সমস্ত সালাররা হযরত খালিদ (রা.)-এর সামনে বসা ছিলেন। হযরত খালিদ (রা.) তাদের জানান, আমাদের পরবর্তী মঞ্জিল হলো, জুমাইল। ইতোমধ্যে সেখানে গুপ্তচরদের পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।

"এতদিন এভাবে চলে আসছিল যে, একস্থানে আমরা হামলা করলে শত্রুরা পালিয়ে গিয়ে অন্য স্থানে জড়ো হত" হযরত খালিদ (রা.) বলেন। "কিন্তু এ যুদ্ধে আমরা কাউকে পালাতে দিইনি। তারপরও হতে পারে সান্নী হতে কেউ পালিয়ে জুমাইলে গিয়েছে, আবার নাও যেতে পারে। কিন্তু তাই বলে জুমাইল খালি পড়ে নেই। সেখানেও শত্রু বিদ্যমান এবং চলমান ঘটনা সম্পর্কে তারা মোটেও বেখবর নয়। কাল রাতে জুমাইল অভিমুখে যাত্রা করা হবে এবং রাতেই সেখানে পূর্বের মত অতর্কিত আক্রমণ চালানো হবে।"

ইতিহাস এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরব যে, সান্নী ছেড়ে যাবার কালে সেখানে প্রশাসক হিসেবে হযরত খালিদ (রা.) কাকে নিয়োগ দান করেন। সূর্য পশ্চিম আকাশে বিদায় নিতেই মুসলিম বাহিনী জুমাইলের উদ্দেশে রওনা হয়ে যায়। রাতভর চলা অব্যাহত থাকে। দিনে সৈন্যরা গাছ-গাছালি ও জঙ্গলের আড়াল হয়ে যতটুকু পারে চলে। কিন্তু সূর্য ডুবতেই লক্ষ্যপানে দ্রুত এগিয়ে চলে মুজাহিদ বাহিনী।

জুমাইলেও শত্রুসৈন্যরা ঘুমন্ত ছিল। সান্ত্রীরা ছিল সজাগ-জাগ্রত। তবে এখানকার টহলরত সান্ত্রী ও অন্যান্য সান্ত্রীদের ঠিক সেভাবে খতম করা হয় যেভাবে ইতোপূর্বে মাযীহ ও সান্নীতে করা হয়েছিল। মুসলিম বাহিনীর বিন্যাসও ছিল পূর্ববৎ অর্থাৎ পুরো বাহিনী ছিল তিন ভাগে বিভক্ত।

জুমাইলেও সাড়াশি অভিযান সফল হয়। ঐতিহাসিকগণ লিখেন, অতর্কিত আক্রমণ হতে একজনের পক্ষেও প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। সবাই মারা যায়। এ যুদ্ধেও মহিলা ও বাচ্চাদের পৃথক পৃথকভাবে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

সালার আবু লায়লা বেলাল বিন আক্কাহ-এর সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নেন। তিনি জানতে পারেন যে, আক্রমণের একদিন পূর্বে সে জুমাইল ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছিল। অনুসন্ধানে আরেকটি তথ্যও লাভ হয় যে, জুমাইলের অদূরে রিজাব নামক একটি বসতি আছে, সেখানে বেশ কিছু সংখ্যক ঈসায়ী সমবেত হয়েছে এবং তাদের সঙ্গে মাদায়েনের এক-দুই প্লাটুন সৈন্যও আছে।

হযরত খালিদ (রা.) এক সঙ্গে দু'টি নির্দেশ দেন। একটি হলো সান্নী হতে গনীমতের মাল এবং বন্দী মহিলা বাচ্চাদের দ্রুত জুমাইলে নিয়ে আসা এবং অপর নির্দেশ হলো, এখনিই রিজাব হামলা করা হোক। কেননা, অগ্নিপূজারীদের যুদ্ধনেশা ইতোমধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং এখনই তাদের প্রতি আক্রমণ করা হলে তারা শক্তি সঞ্চয়ের সুযোগ পাবে না। পক্ষান্তরে দেরী করা হলে তারা নিজেদের গুছিয়ে নেয়ার ফুরসত পাবে এবং অতিরিক্ত শক্তি সঞ্চয় করে প্রবল হয়ে যাবে। এই জন্য হযরত খালিদ (রা.) তাদের কোনরূপ ফুরসত না দিয়ে আক্রমণ চালানোর জন্য মনস্থির করেন।

মুসলমানরা পরিকল্পিতভাবে তিন দিক হতে রিজাবের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু আক্রমণ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। রিজাব সম্পূর্ণ খালি ছিল। সেখানে শত্রুবাহিনীর কোনো নাম-নিশানা ছিল না। পূর্বে সেখানে প্রচুর সৈন্য থাকলেও বর্তমানে একজনও ছিল না। আক্কাহ বিন আবী আক্কাহ-এর ছেলে বেলালেরও কোনো খোঁজ ছিল না। মুসলিম বাহিনীর একটি অশ্বারোহী বহর দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ঘুরে আসে। কিন্তু কোথাও দুশমনদের ছায়া মেলে না। এদিক-ওদিক তালাশ করে না পেয়ে সন্ধানী বহর এক সময় ফিরে আসে।

সান্নীর বন্দিনী মহিলাদেরকে ইতোমধ্যেই জুমাইলে আনা হয়েছিল। গনীমতের মালও আনা হয়। হযরত খালিদ (রা.) খেলাফতে মদীনার অংশ পৃথক করে অবশিষ্ট মাল-সম্পদ মুজাহিদদের মাঝে বিলি-বণ্টন করে দেন। এ সময়ে আবু লায়লা সাবিহাকে ডেকে পাঠান।

"বেলাল বিন আক্কাহ এখান থেকেও পালিয়ে গেছে"-আবু লায়লা তাকে বলেন "সে যদি সত্যিকার অর্থেই পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে চাইত, তাহলে এভাবে বারবার পলায়ন করত না। তাহলে বল, এখনও কি তুমি তার অপেক্ষায় প্রহর গুনবে?"

"আমি কী করব বা আমার কী করা উচিত ভেবে পাচ্ছি না" সাবিহা সালার আবু লায়লাকে জানায়।

আবু লায়লা ইতিপূর্বেই সাবিহার ব্যাপারে হযরত খালিদ (রা.)-এর সঙ্গে আলাপ করেছিলেন। ঐতিহাসিকগণ লিখেন, মেয়েটির রূপ সৌন্দর্য এবং যৌবন দেখে সকলের ধারণা হয়েছিল যে, হযরত খালিদ (রা.) তাকে বিবাহ করে নিবেন। এমনটি হলে সাবিহার ঐ স্বপ্নও সফল হত যে, তার বড় ইচ্ছা ছিল এমন ব্যক্তির স্ত্রী হবে, যিনি হবেন সর্বাধিক বাহাদুর এবং নির্ভীক যোদ্ধা। কিন্তু হযরত খালিদ (রা.) সবাইকে অবাক করে দিয়ে বলেন, আমার চেয়েও বড় বীর বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং তিনি এক বিশেষ পয়গাম লিখে গনীমতের মাল এবং বন্দিনী নারীদের দূত মারফৎ মদীনায় পাঠিয়ে দেন।

যে বহরের হেফাজতে গনীমতের মাল ও নারীদের পাঠানো হয় তার কমান্ডার ছিলেন হযরত নুমান বিন আওফ শায়বানী। তিনি মদীনায় পৌঁছে সাবিহার পরিচয়, রূপ-গুণ এবং ইচ্ছার কথা মদীনাবাসীদের জানান।

ঐতিহাসিক তথ্যের বরাতে জানা যায় যে, হযরত আলী (রা.) সাবিহাকে ক্রয় করেন। সাবিহা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলাম গ্রহণ করে। হযরত আলী (রা.) তাকে বিবাহ করেন। হযরত আলী (রা.)-এর পুত্র উমর এবং কন্যা রুকাইয়া সাবিহারই গর্ভজাত ছিলেন।

মাদায়েনে কিসরার শাহী মহল পূর্বের মতই দাঁড়িয়ে ছিল। তার দেয়াল ও প্রাচীরের কোথাও ঘুন ধরেনি। চাকচিক্য ও সৌন্দর্য ছিল চোখ ধাঁধানো। কিন্তু সারা মহল জুড়ে ছিল থমথমে ভাব। রাজপুরী ভেতর থেকে অনেকটা ছিল ভগ্ন প্রাসাদের মত। জৌলুস ও কোলাহলপূর্ণ মহল ছিল নীরব, নিথর, স্তব্ধ, নিষ্প্রাণ। সেখানে নাচের আসর বসে না। সুন্দরী নর্তকীদেরও দেখা যায় না। অথচ ক'দিন পূর্বে এই মহল হতেই মানুষের মৃত্যুর পরওয়ানা জারী হত। প্রতি রাতে নতুন নতুন কুমারী নারীর কুমারীত্ব বিসর্জন যেত। প্রজাদের সুন্দরী মেয়েদের জোরপূর্বক নাচানো হত।

আরবের যে সব মুসলমান ইরাকে বসতি গেড়েছিল পারস্য রাজন্যবর্গগণ তাদের ছাগল ভেড়ায় পরিণত করেছিল। ইরাক পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। অগ্নিপূজারীরা মুসলমানদের দজলা এবং ফোরাতের উপকূল ও সংলগ্ন এলাকায় অবস্থান করতে বাধ্য করেছিল। বেচারা মুসলমানরা হাড়ভাঙ্গা খাঁটুনী খেঁটে রবিশস্য উৎপাদন করলেও তাতে তাদের কোনো অধিকার ছিল না। ফসল পাকার

মৌসুমে অগ্নিপূজকরা এসে জোর করে এবং না বলেই সমুদয় ফল-ফসল নিয়ে চলে যেত। এতে তাদের টুশব্দ করারও শক্তি ছিল না। কেউ প্রতিবাদ কিংবা মুখ খোলার দুঃসাহস দেখালে তাকে দুনিয়ার বুক হতে চিরদিনের জন্য মুছে ফেলত। এমনকি মুসলমানদের কন্যা, বোন এবং স্ত্রীদের উপরও তাদের কোনো অধিকার ছিল না। কিসরার কোনো শাসকের চোখে কোনো মেয়ে ভাল লাগলে সে তাকে জোরপূর্বক উঠিয়ে নিয়ে যেত।

এই দুর্বিষহ অবস্থার মধ্য দিয়ে অভ্যুদয় হয় মুসান্না বিন হারেসার মত মুজাহিদ বাহিনীর। প্রতিবাদী কণ্ঠ ও সংগঠক মুসান্না বিন হারেসাকে বন্দী করে হত্যা করার নির্দেশ একদিন মাদায়েনের এই শাহী মহল থেকেই জারী হয়েছিল। যখন শাহী মহলে এই খবর পৌঁছেছিল যে, মদীনার মুসলিম বাহিনী পারস্যের সীমান্তে প্রবেশ করেছে, তখন সেখানে ফেরআউনের প্রেতাত্মার মত অট্টহাসি উঠেছিল যে, আরবের এই মুর্খদের এই সাহস হল কী করে! ... সেদিন মুসলিম বাহিনীর উপহাস ও বিদ্রুপে শাহী মহল সরগরম হলেও মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানে সেই মুখরিত শাহী মহল এখন মৃত্যুপূরীর মত নিরব-নিস্তব্ধ। পারস্যের কোনো সেনাপতি মুসলমানদের সামনে দাঁড়াতে পারছিল না। ইতোমধ্যেই খ্যাতিসম্পন্ন বীর বাহাদুরদের অনেকেই নিহত হয়েছে। যেসব জেনারেলরা তখনও পর্যন্ত জীবিত ছিল, জান নিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। মুসলিম বাহিনীর আগমণের সংবাদ পেলেই দ্রুত সে স্থান ত্যাগ করল। "মাদায়েন রক্ষা কর" থেকে থেকে কিসরার রাজপ্রাসাদ থেকে বারবার এই আহ্বান শোনা যাচ্ছিল।

"মাদায়েন মুসলমানদের কবরস্থান হবে" এই ছিল পরাজিত সালারদের আওয়াজ। "মুসলিম বাহিনী মাদায়েন পর্যন্ত আসার দুঃসাহস করবে না।"

"আপনারা এখনও নিজেরা নিজেদের ধোঁকা দিচ্ছেন?" কিসরার বর্তমান উত্তরাধিকারী বলছিলেন– "তারা কি মাদায়েন পর্যন্ত আসার দুঃসাহস করতে পারে না, যারা কিছুদিনের ব্যবধানে চারটি রণাঙ্গনে এমনভাবে আঘাত হেনেছে যে, আমাদের প্রশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ সেনাদের মেরে সাবাড় করে দিয়েছে? আমাদের সৈন্য বলতে এখন আর কতই বা আছে? এখন যা আছে সবই হলো ভীত-সন্ত্রস্ত সালাররা এবং অনাড়ি কিছু নওজোয়ান সিপাহী। ... কোনো ঈসায়ী কি জীবিত আছে? ... মাদায়েন রক্ষা কর।"

এদিকে মাদায়েনের শাহী মহলে যখন এমন ফরিয়াদ চলছিল, ঠিক তখন ওদিকে হযরত খালিদ (রা.) তাঁর পরবর্তী লক্ষ্যস্থল নির্ধারণ করেন ইরানের রাজধানী মাদায়েন। মাদায়েন ছিল পারস্য সাম্রাজ্যের প্রাণ। কিন্তু এখানে অতর্কিত ও গেরিলা আক্রমণের কোনো সুযোগ ছিল না। হযরত খালিদ (রা.) জানতেন, ইরানীরা মাদায়েন রক্ষা করতে কিসরার সমস্ত শক্তি একত্রিত করবে। তিনি আরও জানতেন, অমুসলিমদের মধ্য হতে বিশেষ করে ঈসায়ীদের ছোট ছোট কিছু গোত্র আছে, যারা এখনও কোনো যুদ্ধে শরীক হয়নি, আশংকা আছে যে, অগ্নিপূজারীরা ছলে বলে কৌশলে তাদের হাত করে নিবে এবং মাদায়েনের চতুর্দিকে মানব ঢালের সুদৃঢ় দেয়াল দাঁড় করিয়ে দিবে। এই আশংকা নিরসনের জন্য জরুরী ছিল ঐসব ক্ষুদ্র কবিলাগুলোকে নিজেদের মিত্রে পরিণত করা। এই উদ্দেশ্যে হযরত খালিদ (রা.) তাঁর দূতদের বিভিন্ন গোত্রের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করার জন্য পাঠিয়ে দেন। তিনি দূতালির মাধ্যমে জানতে চান যে, গোত্রগুলোর চিন্তা-চেতনা কী এবং উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তাদের মতি-গতি কী?

✪

"এসব গোত্রগুলোর উপর আমার প্রভাব বিস্তার করেছে" জনৈক গুপ্তচর হযরত খালিদ (রা.)-কে সুরতহাল রিপোর্ট প্রদান করে। "তারা নিজ নিজ গোত্রের মহিলা এবং বাচ্চাদের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন। ধন-সম্পদের ব্যাপারেও চিন্তিত। কিসরার উপর তাদের আর ভরসা নেই।"

"... আর তারা এখন পুনরায় ন্যায়পরায়ণ নওশেরওয়ার যুগের কথা স্মরণ করছে" আরেক দূত এসে বলে। "তারা বর্তমানে মাদায়েনের স্বার্থে লড়তে রাজি নয়। তারা ভালভাবেই বুঝতে পেরেছে, বনূ তাগাল্লুব, নমর এবং আয়াদ-এর মত বড় বড় যুদ্ধবাজ গোত্রগুলোর পরিণতি কেমন ভয়াবহ হয়েছে।"

"তারা আনুগত্য স্বীকার করার জন্য প্রস্তুত" আরেক দূত জানায়। "কিন্তু এই শর্তে যে, তাদের সঙ্গে ইনসাফ করতে হবে এবং রাজস্ব আদায় করতে গিয়ে তাদেরকে নিঃস্ব এবং অভাবী করা হবে না।"

"আল্লাহর কসম! তারা যা যা চাইবে আমরা তা পূর্ণ করব"– হযরত খালিদ (রা.) বলেন–" কেউ কি তাদের এটা জানায়নি যে, আমরা সাম্রাজ্য করায়ত্ত করতে এবং এখানকার মানুষদের গোলাম বানাতে আসিনি? ... ডাকো, তাদের সকল গোত্র প্রধানদের তলব কর।"

এক-দুই জন ঐতিহাসিক লিখেন, হযরত খালিদ (রা.) ইরাকের প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্থানে স্থানে গেরিলা আক্রমণ চালিয়ে অত্র এলাকার সমস্ত গোত্রকে নিজের অনুগত বানিয়েছিলেন। তবে এ তথ্য সঠিক নয়। বাস্তবতা হলো সেটাই যা বেশিরভাগ ঐতিহাসিক লিখেছেন; হযরত খালিদ (রা.) মিত্রতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে গোত্রগুলোকে এক পতাকাতলে এনেছিলেন। তবে এটা ঠিক যে, তাদের আনুগত্য স্বীকারের পেছনে হযরত খালিদ (রা.)-এর ত্রাসও কাজ করেছিল। মরুঝড়ের মত এই খবর সকল গোত্রে পৌঁছে গিয়েছিল, মুসলমানদের মাঝে এমন কোনো শক্তি আছে, যার সামনে দুনিয়ার বিশাল থেকে বিশাল সেনাবাহিনীও দাঁড়াতে পারে না।

ইরানীদের ব্যাপারেও গোত্রগুলো জেনেছিল যে প্রতিটি রণাঙ্গনে তারা মুসলমানদের হাতে পরাজয় বরণ করছে এবং ঈসায়ীদেরকে তলোয়ারের মাথায় রেখে নিজেরা জান বাঁচাতে পলায়ন করছে। তাদের আরও মনে পড়ে যে, ইরানীরা এখন নিজেদের স্বার্থে তাদের ব্যবহার করলেও প্রকৃতপক্ষে ইরানী শাসকরা তাদেরকে কেনা গোলামের মত বানিয়ে রেখেছে এবং তাদের অধিকার হরণ করেছে।

হযরত খালিদ (রা.) মৈত্রীচুক্তি করে তাদের থেকে আনুগত্যের স্বীকৃতি নিয়েছিলেন এবং তাদেরই লোকজন হতে প্রশাসক নিযুক্ত করে রাজস্ব আদায় ইত্যাদি সরকারী কাজ আঞ্জামের দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন। নিজস্ব ধর্ম পালনে তাদের পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হয়েছিল। ফলে গোত্রগুলোর সামনে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, মুসলমানরা তাদের সুন্দরী নারীদের প্রতি চোখ তুলেও চায় না। হযরত খালিদ (রা.) মৈত্রীচুক্তির মধ্যে এটাও অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন যে, মুসলমানরা তাদের জান-মাল ও ইজ্জতের জিম্মাদার।

"ওলীদের পুত্র!" এক গোত্রের বৃদ্ধ নেতা হযরত খালিদ (রা.)-কে সম্বোধন করে বলেন "ন্যায়পরায়ণ নওশেরওয়ার যুগেও এমন ইনসাফপূর্ণ শাসন জারী ছিল। অনেক দিন পর আমরা আবার তেমন যুগের দেখা পেলাম।"

হযরত খালিদ (রা.) ফোরাত নদীর উপকূল অভিমুখী চলার পাশাপাশি উত্তর দিকেও অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখেন। সামনে ইরাকের সীমান্ত এলাকা শেষ হয়ে রোমীয়দের সাম্রাজ্য শুরু হয়েছিল। তখন সিরিয়া ছিল রোমীয়দের অধীনে। হযরত খালিদ (রা.) দুঃসাহসিক চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিলেন। এই চ্যালেঞ্জ তাঁর

জন্য ছিল অত্যন্ত বিপদসংকুল। এমনও হওয়ার সম্ভাবনা ছিল যে, এই চ্যালেঞ্জ তাদের সকল বিজয়কে ধুলিস্মাৎ করে দিবে। অবস্থাদৃষ্টে এটাই মনে হয় যে, একের পর এক বিজয়ের নেশা হযরত খালিদ (রা.)-এর মাথা খারাপ করে দিয়েছে। কিন্তু বাস্তবে ব্যাপারটি এমন ছিল না। ঐতিহাসিকরা লিখেছেন, হযরত খালিদ (রা.) আগে-পিছে সবকিছু নিয়ে ভাবতেন। চিন্তা-ভাবনা না করে তিনি এক পা-ও আগে বাড়তেন না।

"খোদার কসম! আমরা মদীনাকে যরথুস্ট্রের পূজারীদের হাত থেকে নিরাপদ করেছি" হযরত খালিদ (রা.) তাঁর সালারদের উদ্দেশে বলেন- "এখন এমন কোনো আশংকা নেই যে, তারা আমাদের খেলাফতের রাজধানীতে আক্রমণ করবে।"

"এটা কি আল্লাহর দয়া নয় যে, ইরানীরা এখন নিজেদের রাজধানী রক্ষার চিন্তায় উদ্বিগ্ন?" সালার কা'কা' বিন আমর বলেন "তারা এখন আরব পানে চোখ তুলতেও ভয় পাবে।"

"তাই বলে সাপ এখনও মরেনি" হযরত খালিদ (রা.) বলেন। "যদি আমরা এখানে ক্ষান্ত দিয়ে চলে যাই তাহলে কিসরার ফৌজ আবার দাঁড়িয়ে যাবে এবং হস্তচ্যুত এলাকা পুনরুদ্ধারের জোর চেষ্টা চালাবে। তাদের এমন সম্ভাবনার পথ আমাদের রুদ্ধ করে দিতে হবে। ...

আমার প্রিয় ভাইরা! আপনারা কি এ দিকটা চিন্তা করে দেখেছেন যে, অগ্নিপূজারীদের পার্শ্বেই রোমীয়দের অবস্থান। যদি রোমীয়দের বুদ্ধি-জ্ঞান থাকে তাহলে ইরাকে সৃষ্ট আমাদের উদ্ভূত পরিস্থিতি হতে তারা ফায়দা তুলবে। তারা বসে থাকবে না, সামনে চলে আসবে। তখন তারা যদি সফলকাম হয় তাহলে আরবের জন্য সেই আশংকাই আবার দেখা দিবে, যা ইতোপূর্বে যরথুস্ট্রের পূজারীদের থেকে ছিল।"

হযরত খালিদ (রা.) মাটিতে আঙ্গুল দ্বারা রেখা টেনে তাঁর সালারদের জানান যে, রোমীয়দের আগমনের সম্ভাব্য পথ কোনটি। পক্ষান্তরে সেই স্থানটি কোথায়, যা অধিকার করে আমরা তাদের আগমনের পথ বন্ধ করতে পারি।

সে স্থানটি ছিল 'ফারাজ'। এ স্থানটি ফোরাত শহরের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত ছিল। সেখানেই ছিল রোম ও পারস্যদের অর্থাৎ সিরিয়া ও ইরাকের পরস্পর সীমান্তবর্তী এলাকা। ইরাকের বেশিরভাগ এলাকা এসে গিয়েছিল

মুসলমানদের করতলে। এই এলাকাটিই ছিল বিপদজনক। ফারাজ হতে স্থলপথ ছাড়াও রোমীয় বা পারস্যরা জলপথও অবলম্বন করতে পারত। প্রখ্যাত ইউরোপীয়ান ঐতিহাসিক লেনপোল লিখেন, হযরত খালিদ (রা.) শুধু রণাঙ্গনে আজব চাল চেলে শত্রুকে পরাজিত করার উস্তাদ ছিলেন না; বরং সামরিক চিন্তা-চেতনা এবং উন্নত পরিকল্পনাও তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল। তাঁর দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। ভবিষ্যতে দেখা দিতে পারে এমন আশঙ্কাও তিনি আগে ভাগে অনুমান করে ফেলতেন। হযরত খালিদ (রা.) যখন ফারাজের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেন, তখন সৃষ্ট একটি আশঙ্কা সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন না। তাঁর চিন্তায় তখনও পর্যন্ত এটা আসেনি যে, তিনি চতুর্দিক হতে শত্রুর ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে যেতে পারেন।

✪

রোমক শাহী দরবারে একটি আওয়াজ ক্রমেই উচ্চকিত হচ্ছিল। যা স্পষ্ট জানান দিচ্ছিল যে, কোনো মহাবিপর্যয় ঘটে গেছে বা ঘটতে যাচ্ছে। রোম সম্রাটের সামনে রোমীয় সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তারা বসা ছিলেন।

"খবর পাওয়া গেছে, মুসলিম বাহিনী ফারাজ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। তবে এটা জানা সম্ভব হয়নি যে, তাদের অভিপ্রায় কী?"

"তারা কোনো ভাল নিয়তে আসেনি। ... পারসিকদের সম্পর্কে আপনি কোনো খবর জানতে পেরেছেন?"

"মাদায়েন ছাড়া তাদের কাছে আর কিছু নেই।"

"তাহলে আর আমাদের অপেক্ষা করা ঠিক হবে না। মুসলমানরা আমাদের দেশে ঢুকে আক্রমণ করার পূর্বেই তাদের উপর আমাদের হামলা করা দরকার।"

"তোমার থেকে বড় গর্দভ আমাদের বাহিনীতে আর আছে? তুমি কি শোনোনি যে, পারস্য বাহিনী এবং তাদের মিত্র হাজার হাজার ঈসায়ীকে মুসলিম বাহিনী প্রতিটি রণাঙ্গনে শুধু পরাস্তই করেনি; বরং তাদের খ্যাতিমান জেনারেল এবং হাজার হাজার সিপাহীকে হত্যা করেছে?"

"আপনি ঠিকই বলেছেন। এখন এটা ভেবে দেখা জরুরী হয়ে পড়েছে যে, মদীনাবাসীদের সমর পদ্ধতি কেমন।"

"এটা দেখা অবশ্যই জরুরী। তারা যেভাবে স্বল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে অধিক সংখ্যক প্রতিপক্ষ সৈন্যদের পরাস্ত করে শেষ করে দিচ্ছে, নিশ্চয় এর পেছনে তাদের বিশেষ যুদ্ধ প্রশিক্ষণ থেকে থাকবে। আমরাও পারস্য সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়েছি। যদিও এটা ঠিক যে, সে যুদ্ধে আমরা তাদের পরাজিত করেছিলাম, কিন্তু সেখানে জয়ের বড় কারণ ছিল আমাদের বাহিনী তাদের থেকে বেশি ছিল।"

"এখন সবাই আমার সিদ্ধান্ত শোনো। আমরা পারসিকদের সঙ্গে নিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়ব।"

"পারসিকদের সঙ্গে নিয়ে? আমাদের একথা ভুলে যাওয়া কি ঠিক হবে যে, পারসিকদের সঙ্গে আমাদের শত্রুতা রয়েছে এবং ইতোপূর্বে আমাদের পরস্পরে যুদ্ধও হয়েছে।"

"হাঁ, এখন আমাদের এটা ভুলে যেতে হবে। মুসলমানরা তাদের এবং আমাদের সম্মিলিত শত্রু। এমন শত্রুকে পরাজিত করতে শত্রুদের সঙ্গে মৈত্রীত্বের সম্পর্ক করা বিচক্ষণতার পরিচয় হয়ে থাকে। আমরা পারসিকদের মত ঠকতে চাই না। পারসিকরা আমাদের সঙ্গে মিত্রতার বন্ধনে এগিয়ে এলে তাদের সঙ্গে ঈসায়ী গোত্রগুলোও চলে আসবে।"

সিদ্ধান্ত মোতাবেক রোমীয় দূত বন্ধুত্বের বার্তা নিয়ে মাদায়েন গেলে অগ্নিপূজারীরা দু'হাত বাড়িয়ে বক্ষ পেতে তাকে স্বাগতম জানায়। উপঢৌকন আদান প্রদান হয়। দূতের উপস্থিতিতেই চুক্তির শর্তাবলী চূড়ান্ত হয়। পারসিকদের এ ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। রাজমুকুট আর সিংহাসন তাদের হস্তচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। তারা চাইছিল, যে কোনোভাবে মাদায়েন রক্ষা পাক। তাই তারা পড়ন্ত বিকেলে এসে রোমীয়দের পয়গামকে গায়েবী মদদ মনে করে লুফে নেয় এবং যেনতেন শর্তে চুক্তি করতে রাজি হয়ে যায়। মাদায়েনের দরবার হতে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ঈসায়ী গোত্রপ্রধানদের ডেকে পাঠানো হয়। তারা ছিল বনূ তাগাল্লুব, বনূ নমর এবং বনূ আয়াদ নামক ঐ তিন গোত্র যারা ইতোপূর্বে মুসলমানদের হাতে মার খেয়ে শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করেছিল।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, মাদায়েনের শাহী ফরমান পেয়েই গোত্র প্রধানরা মাদায়েন এসে পৌঁছে। তারা তাদের নিহত হাজার হাজার সদস্যদের হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার অপেক্ষায় ছিল। ইসলামের প্রচার-প্রসার রোধ করাও ছিল

তাদের অন্যতম লক্ষ্য। অথচ এসব গোত্রদের মধ্যে যারা যোদ্ধা ছিল তারা ইতোপূর্বে মুসলমানদের হাতে মারা গিয়েছিল। যুবক শ্রেণীর সংখ্যা ছিল খুবই কম। বেশির ভাগ লোক ছিল আধা বয়সী ও প্রৌঢ়।

ফারাজ অভিমুখে রওনা হওয়া ছিল হযরত খালিদ (রা.)-এর ব্যক্তিগত রায়। আমীরুল মু'মিনীন হযরত আবু বকর (রা.) তাদের কেবল পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পাঠিয়েছিলেন। আমীরুল মু'মিনীন (রা.)-এর এই আশাও ছিল না যে, মুসলিম ক্ষুদ্র বাহিনীটি শক্তিধর পারস্যের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে টিকে থাকবে এবং তাদের পরাজিত করবে। কিন্তু আমীরুল মু'মিনীন এত বেশি চ্যালেঞ্জ নিতে চান না যে, বছরের পর বছর ধরে অবিরত লড়াই করে আরেকটি পরাশক্তি রোমীয়দের বিরুদ্ধে লড়াই করা হবে। কারণ রোম সৈন্যরা পারস্য সৈন্যদের চেয়ে গুণগতভাবে ভাল ছিল।

এ সিদ্ধান্ত হযরত খালিদ (রা.)-এর সম্পূর্ণ একার ছিল যে, ফারাজ গিয়ে রোম এবং পারসিকদের সীমান্ত পথ আটকে দিবেন। হযরত খালিদ (রা.) নিশ্চিন্ত বসে থাকার মত সালার ছিলেন না। পাশাপাশি তিনি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমর রীতির ঘোর সমর্থক ও ভক্ত ছিলেন। আর তা হলো, শত্রুর মাথায় চড়ে বসা। শত্রুদের পক্ষ হতে আক্রমনের আশঙ্কা হলে তাদের হামলার অপেক্ষায় বসে না থাকা; বরং আক্রমণ করার আগেই তাদের উপর হামলা করা। হযরত খালিদ (রা.) নিজের মধ্যে জিহাদী জোশ ১০০ ভাগ জাগ্রত করে রেখেছিলেন।

✪

হযরত খালিদ (রা.)-এর গোয়েন্দারা যখন তাকে রোম- পারস্যের আঁতাত ও তাদের সমরায়োজনের তথ্য জানায়, তখন তাঁর চেহারা এত গম্ভীর হয়ে যায় যা ইতোপূর্বে খুব কমই দেখা গেছে। তিনি অনুধাবন করেন যে, রোম-পারস্য দু'বাহিনীর মাঝখানে তিনি চলে এসেছেন। এক দিকে রোম বাহিনী আর অপরদিকে পারস্য বাহিনী, তাদের সঙ্গে ঈসায়ী গোত্রের লোকেরাও ছিল। হযরত খালিদ (রা.)-এর সৈন্য সংখ্যা হ্রাস পেয়েছিল। কেননা প্রত্যেক বিজিত এলাকায় তাকে বেশ কিছু সংখ্যক সৈন্য রেখে আসতে হয়। একদিকে ছিল বিদ্রোহের আশংকা, তেমনি ছিল অগ্নিপূজক পারসিকদের পক্ষ হতে জবাবী হামলার সম্ভাবনা।

হযরত খালিদ (রা.) ১২ হিজরী রমযান মাসের শেষ সপ্তাহে ফারাজ গিয়ে পৌঁছান। তখন মুজাহিদ বাহিনী ছিল রোযাদার।

মুসলিম বাহিনী ফোরাত নদীর এক পাড়ে তাঁবু স্থাপন করে অবস্থান নেয়। ঠিক অপর পাড়ে অবস্থান গ্রহণ করে রোম, পারস্য ও ঈসায়ী বাহিনী। উভয় পাড়ে সর্বক্ষণ সান্ত্রী পাহারারত ছিল। টহলরত সান্ত্রীরা ঘোড়ায় চেপে নদীর কূল দিয়ে টহল করে ফিরছিল। হযরত খালিদ (রা.) নিজেও নদীর গা ঘেঁষে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত পায়চারী করতেন এবং শক্রদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতেন।

একদিন সন্ধ্যায় রোম ও ইরানীদের তাঁবুতে হৈ চৈ পড়ে যায় এবং তারা লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। এর কারণ এই ছিল যে, মুসলিম শিবির হতে একটি আওয়াজ হয়েছিল এবং আনন্দ সংগীত বেজেছিল। সৈন্যরা মহড়া চালাচ্ছিল। কিন্তু শক্রপক্ষ এটাকে যুদ্ধের সূচনা মনে করে। পর্যবেক্ষণের জন্য তাদের সালার ও অন্যান্য সামরিক কর্মকর্তারা ফোরাতের তীরে ছুটে আসে।

"তাদের অশ্ব জিন ছাড়াই বাঁধা" শক্রদের কেউ জোর আওয়াজে বলে।

"তারা প্রস্তুত অবস্থায় নয়" আরেকজন মন্তব্য করে।

"ঐ যে দেখ" আরেকজন বলে। "আকাশ পানে চেয়ে দেখ। মুসলমানরা ঈদের চাঁদ দেখেছে। আজকের রাত এবং কাল সারা দিন তারা আনন্দ উৎসব করবে।"

পর দিন মুসলমানরা হৈ চৈ করে ঈদুল ফিতরের খুশি উদযাপন করে। এই খুশিতে বিভিন্ন বিজয়ের আনন্দও শামিল ছিল। মুসলমানরা ঈদের নামায পড়তে দাঁড়ালে নদীর কূলে এবং মুসলিম শিবিরের আশেপাশে সান্ত্রী বাড়িয়ে দেওয়া হয়, যাতে শক্ররা নামাযের অবস্থায় আক্রমণ করতে না পারে।

"সম্মানিত মুজাহিদগণ!" হযরত খালিদ (রা.) নামাযের পর মুজাহিদদের উদ্দেশে সংক্ষিপ্ত ভাষণ প্রদান করেন। "নামাযের পর আপনারা এমনভাবে খুশি উদযাপন করবেন, যাতে দুশমনরা বোঝে যে, মুসলমানদের কোনো ধরনের আশংকা নেই এবং তারা নিজেদের বিজয়ের ব্যাপারে পূর্ণ বিশ্বাসী। নদীর তীরে গিয়ে আনন্দ উৎসব করুন। যেভাবে আপনারা শক্রদের উপর নিজেদের তলোয়ারের প্রভাব বিস্তার করেছেন, ঠিক সেভাবে আনন্দ-ফূর্তি দ্বারা তাদের মনে ত্রাস সৃষ্টি করে দিন।

কিন্তু বন্ধুগণ! এ কথা ভুলবেন না যে, আপনারা আল্লাহর পক্ষ হতে আগত একের পর এক কঠিন পরীক্ষায় লিপ্ত। কিন্তু এবার আপনাদের সামনে সবচেয়ে কঠিন দুই পরাশক্তি। তাদের সঙ্গে আছে ঈসায়ীদের মদদ। আমি জানি, দৈহিকভাবে আপনারা যুদ্ধের উপযোগী নন। কিন্তু আল্লাহ পাক আপনাদের যে আত্মিক শক্তি দিয়েছেন তা দুর্বল হতে দিবেন না। কারণ আপনারা ঐ শক্তিবলেই শত্রুদের উপর বিজয়ী হয়ে আসছেন। আমি বলতে পারি না যে, আগামীকাল কী হবে। যে কোনো ধরনের কুরবানীর জন্য প্রস্তুত থাকবেন। আল্লাহ আপনাদের সহায় হোন।"

হযরত খালিদ (রা.) কথা শেষ করতেই মুজাহিদ বাহিনী এমন নারাধ্বনি দেয় যে, তাদের নারাধ্বনিতে আসমান-জমিন কেঁপে ওঠে। অতঃপর সকলে জায়নামায ছেড়ে আনন্দ-ফূর্তি করতে করতে নদীর তীরে যায়। সেখানে তারা অশ্ব ছুটাছুটিও করায়। বিভিন্নভাবে পুরো দিন আনন্দ উৎসব করে কাটায়। হযরত খালিদ (রা.)-এর সালারদের এই ধারণাই ছিল যে, তিনি হয়ত গেরিলা আক্রমণের কথা ভাবছেন। অনেক দিন অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও হযরত খালিদ (রা.) সালারদের জানান না যে, তিনি কী করতে চান। ইতোমধ্যে এক মাস পেরিয়ে যায়। উভয় পক্ষ সামনাসামনি অবস্থানরত ছিল। অবশেষে হযরত খালিদ (রা.) তাঁর সালারদের পরামর্শ, প্রস্তাব এবং করণীয় ঠিক করার জন্য ডেকে পাঠান।

"আমার বন্ধুগণ!" হযরত খালিদ (রা.) বলেন। "হয়ত আপনারা ভেবে থাকবেন যে, এখানেও গেরিলা আক্রমণ চালানো হবে। কিন্তু আপনারা দেখছেন যে, এখানকার পরিস্থিতি গেরিলা আক্রমণের অনুকূলে নয়। শত্রুদের সংখ্যা অনেক বেশি। আমরা সদা সংখ্যার স্বল্পতা নিয়েই লড়েছি। কিন্তু এখানে আমাদের সামনে নদী অন্তরায়। শত্রুরা এই নদী হতে ফায়দা নিতে পারে। আপনারা দেখেছেন যে, শত্রুরা সংখ্যায় অনেক হওয়া সত্ত্বেও তারা আমাদের উপর আক্রমণ করছে না। এতে পরিষ্কার বুঝা যায় তারা খুবই সতর্ক। আমাদের জন্য ভাল এটাই যে, তাদের সতর্কতার দৈর্ঘ্য আমরা আরও বাড়িয়ে দিব এবং আগে আক্রমণ করব না। আমি চাচ্ছি যে, তারা আগে হামলা করুক। যদি আপনারা নতুন কোনো পরামর্শ দিতে চান তাহলে আমি তা নিয়ে ভাবব এবং ভাল বুঝলে তদনুযায়ী আমল করব।"

প্রায় সকল সালারগণ সর্বসম্মতভাবে বলেন, অবশ্যই আমরা আগে হামলা করব না; বরং এখানে থেকে এমন সব পরিস্থিতি সৃষ্টি করব, যাতে শত্রুরা নদী পেরিয়ে এ পাড়ে আসে। কিছুক্ষণ পর্যন্ত সালারগণ আলোচনা- পর্যালোচনা করেন এবং একটি সিদ্ধান্তে একমত হয়ে যান। সেদিন থেকেই ঐ সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন শুরু হয়ে যায়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কয়েকটি সেনাবহর যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হয়ে নদীর কূল ঘেঁষে রওনা হয়ে যায়। এতে শত্রুরা মনে করে, মুসলমানরা বুঝি কোনো মহড়া চালাচ্ছে। ফলে তারাও এ ধরনের মহড়া চালানোর বন্দোবস্ত করে।

উদ্দেশ্যমূলক এই মহড়ার ধারা পনের ষোল দিন যাবত চলতে থাকে। কোনো কোনো ঐতিহাসিক লিখেছেন, মুসলমানদের এ ধরনের মহড়ায় রোমীয়রা অস্থির হয়ে ওঠে। তারা ইতোপূর্বে কোনো ময়দানে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়েনি। তাদের সেনাপতিদের মাথায় এই চিন্তা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল, যে মুষ্টিমেয় সৈন্যরা ইরানীদের মত বীর সেনানীদের পর্যুদস্ত করে ছেড়েছে, তারা নিশ্চয় এমন কোনো বিশেষ আক্রমণ পরিচালনায় পারদর্শী, যা তারা ছাড়া অন্যদের পক্ষে বোঝা অসম্ভব।

পূর্বে বলা হয়েছে যে, হযরত খালিদ (রা.) শত্রুদের মনোবলে চিঁড় ধরাতে খুবই পারঙ্গম ছিলেন। মানসিকভাবে শত্রুদের কোনঠাসা করতে তাঁর জুড়ি ছিল না। উদ্ভূত পরিস্থিতিতেও হযরত খালিদ (রা.) রোমক বাহিনীকে দোদুল্যমান অবস্থায় নিক্ষেপ করে তাদের মানসিকভাবে এমনভাবে পঙ্গু করে দেন যে, বর্তমানে কোন্ অবস্থা চলছে এবং এহেন অবস্থায় তাদের করণীয় কী–তা তারা নির্ণয় করতে পারছিল না।

✪

৬৩৪ খ্রিস্টাব্দের ২১ জানুয়ারি। ১২ হিজরীর ১৫ জিলকাদ। মুসলিম বাহিনীর দীর্ঘ মেয়াদী সামরিক মহড়ার জবাবে রোমক বাহিনী মহড়া চালাতে চালাতে এত অস্থির হয়ে পড়ে যে, তাদের জনৈক সেনাপতি নদীর কিনারায় দাঁড়িয়ে জোর আওয়াজে মুসলমানদের উদ্দেশে বলে "তোমরা নদী পেরিয়ে এপারে আসবে নাকি আমরা নদী পেরিয়ে ওপারে আসব? যুদ্ধ করতে চাইলে মুখোমুখী হও।"

"আমাদের সংখ্যা খুবই সীমিত" হযরত খালিদ (রা.) লোক মারফৎ ঘোষণা করিয়ে দেন। "আমাদের ভয় কর কেন? তোমাদের সংখ্যা এত বেশি যে, জিজ্ঞাসা করা ছাড়াই তোমাদের এপারে আসা উচিত।"

"তাহলে ঠেলা সামলাও" শত্রু বাহিনীর পক্ষ হতে উচ্চকিত আওয়াজ শোনা যায় "আমরা আসছি।"

শত্রুরা নদী পার হতে শুরু করে। হযরত খালিদ (রা.) মুসলিম বাহিনীকে নদীর পাড় হতে কিছুটা দূরে সরিয়ে এনে সৈন্য বিন্যাস করেন। বরাবরের মত এবারও তাঁর বাহিনী তিন গ্রুপে বিভক্ত ছিল। হযরত খালিদ (রা.) নিজে ছিলেন মধ্যম বাহিনীতে। সমর বিশেষজ্ঞগণ লিখেন, হযরত খালিদ (রা.) শত্রুবাহিনীর জন্য এত বেশি স্থান খালি করে দেন, যাতে শত্রুদের সকলেই সেখানে সমবেত হতে পারে এবং তাদের পশ্চাতে থাকে নদী। শুধু তাই নয়, হযরত খালিদ (রা.) মুসলিম বাহিনীকে আরও সরিয়ে নেন এই উদ্দেশ্যে, যাতে শত্রু বাহিনীর পেছনেই নদী না পড়ে, তাহলে পেছনের দিক তাদের সংরক্ষিত হয়ে যাবে। তাই তিনি সৈন্যদের আরও সরিয়ে নেন, যাতে শত্রু বাহিনীর পেছনে নদীর আগে কিছু স্থান খালি থাকে, যাতে প্রয়োজনে সেদিক দিয়েও আক্রমণ করা যায়।

যখন শত্রুবাহিনীর সকলেই নদী পেরিয়ে এপারে চলে আসে তখন রোমীয় জেনারেলরা পারস্য বাহিনী ও ঈসায়ীদের পৃথক পৃথক দলে বিভক্ত করে। রোমীয় জেনারেলরা এর পক্ষে এই যুক্তি দেখায় যে, এই বিভক্তির দ্বারা সহজেই জানা যাবে যে, কারা কেমন লড়েছে। পলায়নপর গোত্র কারা তাও চিহ্নিত হয়ে যাবে।

এই বিভক্তির ফলে রোমীয়রা সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে যায়। মাদায়েন বাহিনীও ছিল পৃথক। ঈসায়ী গোত্রগুলো মাদায়েন বাহিনী হতে আলাদা হয়ে যায়। এমনকি এক গোত্র আরেক গোত্র হতেও পৃথকভাবে অবস্থান গ্রহণ করে।

রোমীয় জেনারেলরা (ঐতিহাসিকদের মতে) এই বিভক্তি এই উদ্দেশ্যেও করেছিল যে, তাদের এই বিভক্তির জবাবে মুসলিম বাহিনীকেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইউনিটে বিভক্ত হতে হবে। ফলে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে আর এই বিচ্ছিন্নতার সুবাদে খুব সহজেই তাদের পরাস্ত করা যাবে।

"আমার বন্ধুগণ!" হযরত খালিদ (রা.) শত্রুদের এভাবে বিভক্ত হতে দেখে সালারদের ডেকে পাঠান এবং তারা উপস্থিত হলে তাদের উদ্দেশে বলেন। "আল্লাহর কসম! হয়ত শত্রুরা বোকা নতুবা আমাদের বোকা মনে করেছে। আপনারা কি দেখছেন না যে, শত্রুরা কিভাবে নিজেদের ছড়িয়ে দিয়েছে?"

"শত্রুরা আমাদের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করেছে ইবনে ওলীদ!" সালার কা'কা' বিন আমর (রা.) বলেন। "তাদের মত আমাদেরও বিক্ষিপ্ত হতে হবে। অতঃপর এক একজনের মোকাবেলা দশ দশজনের সঙ্গে হবে।

"মাথায় বুদ্ধি দানকারী আল্লাহ তা'আলা" হযরত খালিদ (রা.) বলেন। "আমরা মুখোমুখী হয়ে লড়াই করব না। অশ্বারোহী বাহিনীর সালার শুনুন। এখনি অশ্বারোহী বাহিনী দু'ভাগে ভাগ হয়ে শত্রুদের ডান-বামে চলে যাবে। পদাতিকরাও তাদের সঙ্গে থাকবে। ডানে বামে গিয়ে পশ্চাতে যাওয়ার চেষ্টা করবে। আমি স্বীয় বাহিনীর সঙ্গে শত্রুদের সামনে থাকব। চতুর্দিক হতে শত্রুদের উপর জোরদার আক্রমণ করুন। শত্রুরা এখনও লড়াই করার জন্য তৈরি হয়নি। চারদিক থেকে শত্রুদের উপর এমনভাবে আক্রমণ করুন, যাতে তাদের ভাগ-বিন্যাস লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। আল্লাহর নাম নিয়ে বেরিয়ে পড়ুন।

রোম, ইরান ও ঈসায়ীরা দলে দলে বিভক্ত হলেও তখন পর্যন্ত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়নি। ইতোমধ্যে হযরত খালিদ (রা.)-এর ইশারায় মুসলিম বাহিনী চতুর্দিক হতে তাদের উপর একযোগে হামলা চালায়। আক্রমণের পাশাপাশি যখন শত্রুদের উপর চতুর্দিক হতে তীর বর্ষিত হতে থাকে তখন ছড়িয়ে পড়া বিভক্ত দলগুলো ক্রমেই ভেতর দিকে আসতে থাকে। চারপাশের সৈন্যরা ক্রমে সরে আসায় মূল রণাঙ্গনে এত সৈন্যের সমাগম হয় যে, চরম ভীড়ের অবস্থার জন্ম দেয়। ফলে অতি সহজেই মুসলিম অশ্বারোহী বাহিনী সংখ্যার স্বল্পতা সত্ত্বেও শত্রুদের ঘিরে ফেলে। রণাঙ্গন সংকুচিত হয়ে ক্রমেই এত ভীড় ও চাপাচাপির অবস্থা সৃষ্টি হয় যে, অশ্বগুলোকে এদিক-ওদিক ফেরানোরও স্থান সংকুলান হয় না। ইরানী ও ঈসায়ীরা প্রথম থেকেই মুসলমানদের ভয়ে ভীত ছিল। তারা মুসলমানদের হাতে চরম মার খেয়ে আত্মরক্ষা করতে পালানো বা পিছু হটার পন্থায় রোম বাহিনীর অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে। এতে করে সেখানেও মানবজট সৃষ্টি হয়। রোমীয়দের স্থান সংকুচিত হয়ে যাওয়ায় তারাও পূর্বের মত স্বাধীন ও স্বাচ্ছন্দে লড়তে পারে না।

জটলা যতই বাড়তে থাকে, অশ্বারোহী বাহিনী অশ্বে চেপে তাদের প্রতি আক্রমণের মাত্রা ততই বৃদ্ধি করে। অশ্বারোহী বাহিনীর তীর বৃষ্টির মুখে শত্রুরা আরও সংকুচিত হয়ে যায়। যখন চতুর্দিকের বিক্ষিপ্ত শত্রু সৈন্য একস্থানে এসে আত্মরক্ষার প্রচেষ্টায় অবতীর্ণ হয়, ঠিক তখনই পদাতিক মুজাহিদ বাহিনী শত্রুদের পেছনে চলে যেতেও সক্ষম হয়। পদাতিক বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়লে তারাও বজ্রের মত তাদের উপর পতিত হয়। হযরত খালিদ (রা.) একসঙ্গে সব ইউনিটকে আক্রমণে পাঠান না। পর্যায়ক্রমে এক একটি দল আক্রমণে অংশ নেয়।

হযরত খালিদ (রা.) এ যুদ্ধে এমন চাল চালেন যে, রণক্ষেত্রে যুদ্ধ চলছিল না; চলছিল রোম, পারস্য ও ঈসায়ীদের উপর গণহত্যা। এক পর্যায়ে রোমীয়রা আত্মরক্ষামূলক লড়াই করার চেষ্টা করে কিন্তু রণাঙ্গন তাদের আহত সৈন্য ও মরা লাশ দ্বারা ভরে গিয়েছিল। চোখের সামনে সাথী-সৈন্যদের এভাবে কাতরাতে ও মরতে দেখে অবশিষ্ট সৈন্যদের মনোবল ভেঙ্গে যায়। তারা জীবন বাঁচাতে পালাতে চেষ্টা করতে থাকে। "পশ্চাদ্ধাবন কর" হযরত খালিদ (রা.) নির্দেশ দেন। "পলায়নপর সৈন্যদের পশ্চাদ্ধাবন কর। একজনও যেন জান নিয়ে পালাতে না পারে।"

মুজাহিদ বাহিনী পলায়নপর সৈন্যদের পশ্চাদ্ধাবন করে তাদের তীর এবং বর্শা দ্বারা বধ করতে থাকে। এভাবে এক সময় যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়। প্রায় সকল ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, এ যুদ্ধে এক লাখের মত রোম, পারস্য ও ঈসায়ীরা নিহত হয়। একটি বিরাট সম্মিলিত বাহিনী খতম হয়ে যায়। মুসলমানদের সংখ্যা পনের হাজারের থেকে বেশি ছিল না।

হযরত খালিদ (রা.) দশ দিন রণাঙ্গনেই থাকেন। তিনি অত্যন্ত দ্রুততার সাথে সেখানকার ব্যবস্থাপনা ঢেলে সাজান। একটি ইউনিট সেখানে রাখেন এবং ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দের ৩১ জানুয়ারি মোতাবেক ১২ হিজরীর ২৫ জিলকদ অবশিষ্ট সৈন্যদের হীরা অভিমুখে যাত্রা করার নির্দেশ দেন।

✪

"আপনি কি দেখেছেন, ইবনে ওলীদ কেমন যেন নীরব হয়ে গেছেন?" এক সালার অপর সঙ্গী সালারকে বলছিলেন "খোদার কসম! আমি এটা মানতে পারি না যে, ইবনে ওলীদ ক্লান্ত হয়ে গেছেন অথবা অবিরাম লড়াই করায় আগ্রহ-উদ্দীপনা হারিয়ে ফেলেছেন।"

"আর আমি এটাও মানব না যে, ইবনে ওলীদ এই ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছেন যে, তিনি স্বদেশ ছেড়ে এত দূরে এসে শত্রুর দেশের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েছেন" অপর সালার বলেন "তবে এটা ঠিক যে, আমি অবশ্যই তাঁকে কোনো এক চিন্তায় বিভোর থাকতে দেখছি।"

"ঠিকই বলেছেন, তিনি বিশেষ কোনো চিন্তায় বিভোর।"

"জিজ্ঞাসা করলে হয় না?"

"আমরা জিজ্ঞাসা না করলে কে আর করতে আসবে?"

হযরত খালিদ (রা.) মাঝে-মধ্যে চিন্তায় ডুবে যেতেন। তার এই চিন্তা হত এক রণাঙ্গন শেষ করে অপর রণাঙ্গনের চিন্তা। তিনি অত্যন্ত চিন্তা-ভাবনা করে এবং ভাল-মন্দ সবদিক ভেবে যুদ্ধ করতেন। শত্রুদের নিকট অজস্র সমরশক্তি ছিল। তিনি এভাবে গভীর চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই স্বীয় বাহিনীর টানা জয় এবং দুর্দান্ত আত্মবিশ্বাসের ভিত্তিতে লড়াতে পারতেন। কিন্তু সেটা ঝুঁকি ও আশংকামুক্ত হত না। আর মুসলমানদের জন্য বিনা প্রয়োজনে কোনো ঝুঁকি নেয়া শোভনীয় নয়। মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা কোনো যুদ্ধেই ১৫ হাজারের বেশি ছিল না। সাধারণত তাদের সংখ্যা ১৫ হাজার থেকে ১৮ হাজারের মধ্যে থাকত। এক একজন মুজাহিদের লড়াই তিন থেকে ছয়জন কাফেরের সঙ্গে হত। ফলে তাদের মাথা ঠিক রেখে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হত।

এমন বিচক্ষণতা ও সতর্কতার ক্ষেত্রে হযরত খালিদ (রা.)-এর কোনো দ্বিতীয় ছিল না। এসব গুণাগুণের কারণেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে 'সাইফুল্লাহ' তথা আল্লাহর তলোয়ার বলেছিলেন। হযরত খালিদ (রা.)-এর মধ্যে শতভাগ জযবা-প্রেরণা থাকলেও তাকে জোশের চেয়ে হুশের সঙ্গে লড়াই করতে হত বেশি। প্রতিটি রণাঙ্গনে যাওয়ার পূর্বে হযরত খালিদ (রা.) স্বীয় গোয়েন্দাদের দ্বারা শত্রুপক্ষের অবস্থা, তাদের অবস্থানস্থল এবং সৈন্যসংখ্যা ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জেনে গভীর চিন্তায় ডুব দিতেন। এরপর স্বীয় সালারদের সঙ্গে আলোচনা-পরামর্শ করতেন। কিন্তু ফারাজের যুদ্ধের পর তিনি এমন নীরবতায় হারিয়ে যান, যা ছিল ভিন্ন ধরনের। তাঁকে এভাবে নীরব ও চিন্তামগ্ন দেখে তাঁর সালারগণও চিন্তিত হয়ে পড়ছিলেন। নীরবতার এই ঘটনা ছিল ফারাজ থেকে হীরার উদ্দেশে যাত্রার দু'দিন পূর্বের ঘটনা। তিন-চারজন সালার হযরত খালিদ (রা.)-এর তাঁবুতে গিয়ে বসেন।

"ইবনে ওলীদ!" সালার কা'কা' বিন আমর (রা.) বলেন। "খোদার কসম! যে চিন্তায় আপনি ডুবন্ত নিশ্চয় তার সম্পর্ক কোনো যুদ্ধের সঙ্গে নয়।"

"তাহলে সেটা কী বলুন ইবনে ওলীদ!" আরেক সালার বলেন "খোদার কসম! অবশ্যই আপনি এটা পছন্দ করবেন না যে, আমরা সবাই আপনাকে দেখে পেরেশান হতে থাকব।"

"না, পছন্দ করব না" হযরত খালিদ (রা.) বলেন। "আপনাদের কেউ পেরেশান হন এটা আমার পছন্দনীয় হবে না। আমি কখনও কোনো লড়াইয়ের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হইনি। বিশাল বিশাল তিন বাহিনী মিলে আমাদের বিরুদ্ধে

এসেছে তারপরও আমি পেরেশান হইনি। আমি খলীফাতুল মুসলিমীনের নির্দেশ লংঘন করে রোমীয়দের প্রতি যুদ্ধের আহ্বান জানিয়ে একটি বিরাট ঝুঁকি নিয়েছিলাম। কিন্তু তাতেও আমি পেরেশান হইনি। আমাকে প্রতিটি রণাঙ্গনে এবং সকল সমস্যায় আল্লাহ তা'আলা পথ দেখিয়েছেন। আর তোমাদের আল্লাহ তা'আলা হিম্মত দিয়েছেন যে, তোমরা অসম শত্রুর বিরুদ্ধে জয়ী হয়েছ।.....

"আমার বর্তমানের উদ্বেগের বিষয়টা হলো, আমি হজ্জ করতে ইচ্ছুক। কিন্তু ভেবে দেখ, আমি কোথায় আছি এবং আমার দায়িত্ব কী? এখন প্রশ্ন হলো, এই গুরুদায়িত্ব ফেলে রেখে আমি হজ্জ করতে যেতে পারব? ... পারি না আমার বন্ধুগণ! কিন্তু হজ্জের প্রশ্নে আমার মন আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। আল্লাহর কসম! এটা আমার আত্মার আওয়াজ যে, ওলীদের পুত্র! তোমার জীবনের কী এই নিশ্চয়তা আছে, আগামী হজ্জ পর্যন্ত তুমি জীবিত থাকবে? ... আমার বিশ্বাস নেই প্রিয় বন্ধুগণ! আমরা যে দুই শত্রু বাহিনীকে পরাস্ত করেছি, তোমরা তাদের সামরিক শক্তি-সামর্থ্য দেখেছ। আর তোমরা এটাও দেখেছ যে, প্রত্যেকটি গোত্র সুযোগ পাওয়া মাত্রই ঐ দুই বাহিনীর সঙ্গে গিয়ে মিলছে। সামনে এখন আমাদের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ রয়েছে। পারস্য ও রোমকরা আবার প্রস্তুতি নিয়ে আমাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে আসবে। আমার মনে হচ্ছে, আমার জীবনের দৌড় আর বেশি দিন বাকী নেই। ...

"হে আমার প্রিয় সাথীগণ! আমি কিছুই নই। তোমরাও কিছু নও। শুধু আল্লাহ্ আছেন আমাদের পক্ষে। তিনিই সব কিছু। তাহলে কেন আমি তাঁর দরবারে, তার মহান গৃহে গিয়ে সেজদা দিব না! তোমরা কি আমাকে এই অনুমতি দিবে যে, আমি নিজের পক্ষ হতে, তোমাদের সকলের পক্ষ হতে এবং প্রত্যেক মুজাহিদের পক্ষ হতে কাবা শরীফে গিয়ে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করব?"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়" এক সালার বলেন। "যে জযবা ও অভিপ্রায়ের কথা আপনি বললেন তার বাস্তবায়ন কে রুখতে পারে!"

"কিন্তু আপনি হজে যাবেন কীভাবে ইবনে ওলীদ!" মুসান্না বিন হারেসা জিজ্ঞাসা করেন। "আপনার অনুপস্থিতিতে অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু ঘটে গেলে ..."

"আমি কোনো যুদ্ধে মারা গেলে তোমরা কখনও এটা ভাববে না যে, এখন কী হবে" হযরত খালিদ (রা.) বলেন "আমি না থাকলে কি তোমাদের মনোবল ভেঙ্গে যাবে? ... না ... না ... এমন যেন না হয়।"

"কাবা ঘরের মালিকের কসম! এমনটি হবে না" কা'কা' বিন আমর (রা.) বলেন। "আমাদের মধ্য হতে একজনও জীবিত থাকলে সে ইসলামের পতাকা ভূলুণ্ঠিত হতে দিবে না। ... ইবনে ওলীদ! আপনি এমন করতে পারেন যে, আজই আপনি দূত পাঠিয়ে দিন, যাতে সে আমীরুল মু'মিনীন হতে আপনার হজে যাওয়ার অনুমতি নিয়ে আসে।"

"যে চিন্তা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে সেটা এটাই" হযরত খালিদ (রা.) মুচকি হেসে বলেন। "আমি জানি, আমীরুল মু'মিনীন অনুমতি দিবেন না। তিনি এখানকার অবস্থা সম্পর্কে অবগত। যদি তিনি অনুমতিও দেন, তবে এই আশংকা সৃষ্টি হবে যে, শত্রুরা জেনে যাবে, ইবনে ওলীদ চলে গেছে। আমি স্বীয় বাহিনীকেও এটা জানাতে চাই না যে, আমি তাদের মাঝে নেই। আমি খুবই অল্প সময় নিয়ে যাব এবং হজ শেষ করেই আবার ফিরে আসব।"

"খোদার কসম! ওলীদের পুত্র!" মুসান্না বিন হারেছা বলেন। "আপনি জানেন না যে, আপনি যা বলছেন তা সম্ভব নয়।"

"আল্লাহ অসম্ভবকে সম্ভব করে দেন" হযরত খালিদ (রা.) বলেন। "মানুষের কেবল হিম্মত করা দরকার। আমি তোমাদের খুলে বলছি যে, আমি কী করব এবং কোন রাস্তা দিয়ে যাব।"

হযরত খালিদ (রা.) উপস্থিত সালারদের প্রথমে তার ইচ্ছার কথা জানান এরপর ঐ পথের কথা বলেন, যে পথ দিয়ে তিনি মক্কায় গিয়ে হজ করে আবার ফিরে আসবেন। হজ্জের মাত্র ১৪ দিন বাকী ছিল। অথচ ফারাজ থেকে মক্কার দূরত্ব ছিল দ্রুততার সঙ্গে চললেও আড়াই মাস থেকে কিছু বেশির। হযরত খালিদ (রা.)-এর প্রয়োজন ছিল কোনো সংক্ষিপ্ত পথ কিন্তু কোনো রাস্তা সংক্ষিপ্ত ছিল না। হযরত খালিদ (রা.) বণিক গোত্রের লোক ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি বাণিজ্য উপলক্ষে দীর্ঘ এবং কঠিন সফর করেছিলেন। তিনি এমন রাস্তা সম্পর্কেও অবহিত ছিলেন, যা সাধারণ রাস্তা ছিল না বরং সেটা রাস্তা হিসেবে অবহিত হওয়ারই যোগ্য ছিল না। হযরত খালিদ (রা.) তাঁর সালারদের এমনি এক রাস্তা সম্পর্কে অবগত করান।

"খোদার কসম! ইবনে ওলীদ!" মুসান্না বিন হারেসা বলেন "আপনার মাথা খারাপ না হলেও এখন আপনি এমন কথা বললেন, যা এমন কেউ বলতে পারেনা যার মাথা ঠিক আছে। আপনি যে রাস্তার কথা বললেন, তা মূলত কোনো রাস্তাই নয়; সেটি একটি এলাকা মাত্র। আর সে এলাকা দিয়ে বইতে মরুঝড়ও ভীত-কম্পিত হয়। আপনি মরার আর কোনো পথ পান না! আমি কি ঐ এলাকা চিনি না?"

"যে আল্লাহ আমাদের এত বিশাল শক্তিধর শত্রুর বিরুদ্ধে জয়ী করেছেন তিনিই আমাকে এ এলাকা পার হওয়ার ব্যবস্থা করে দিবেন।" হযরত খালিদ (রা.) কথাটি মুচকি হেসে বললেও কথার মধ্যে দৃঢ়তা এবং যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস ছিল "আমি বিশ্বাস করি যে, তোমরা আমাকে যেতে বাধা দিবে না এবং এই গোপন কথা এই তাঁবুর বাইরে যেতে দিবে না। আমি এই রহস্যটি আমীরুল মু'মিনীনকেও জানাব না।"

"আমীরুল মু'মিনীন হজ্বে আসলে কী করবেন?" এক সালার জানতে চান।

"আমি তাঁকে আমার চেহারা দেখাব না" হযরত খালিদ (রা.) বলেন "তোমরা আমার জন্য অবশ্যই দোয়া করবে। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, আমি এমনভাবে তোমাদের সঙ্গে এসে মিলিত হব যে, তোমরা বলবে, লোকটি মধ্য পথ হতে ফিরে এসেছে।"

বেশিরভাগ ঐতিহাসিক, বিশেষত আল্লামা তবারী (রহ.) এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন, হযরত খালিদ (রা.) ১২ হিজরীর হজ্ব কীভাবে পালন করেন। সে সময় তার লড়াই চলছিল পারসিকদের সঙ্গে এবং রোম সাম্রাজ্যের মধ্য ঢুকেও তিনি আক্রমণ করেছিলেন। এই সম্ভাবনা সবসময় ছিল যে, এই দুই সাম্রাজ্যের পক্ষ হতে যে কোনো সময় জবাবী হামলা আসতে পারে। এই দিক বিবেচনায় হযরত খালিদ (রা.)-এর পক্ষে রণাঙ্গন থেকে দূরে থাকার বিন্দুমাত্র অবকাশ ছিল না। কিন্তু হজ্বের ইচ্ছা এত প্রচণ্ড হয়েছিল যে, তিনি তা দমাতে পারেননি।

প্রথমেই বলা হয়েছে যে, মুসলিম বাহিনী ফারাজ থেকে হীরা অভিমুখে যাত্রা করে চলছিল। হযরত খালিদ (রা.) পুরো বাহিনীকে তিন ভাগে বিভক্ত করেন। একটি দল ছিল সর্বাগ্রে। দ্বিতীয় দলটি তার পেছনে এবং তৃতীয় দলটি ছিল পশ্চাৎভাগে। হযরত খালিদ (রা.) বিশেষভাবে ঘোষণা করিয়ে দেন যে, তিনি পশ্চাৎ দলের সঙ্গে অবস্থান করবেন। হীরা পৌঁছতে সৈন্যদের কোনো তাড়া ছিল না। দ্রুততার প্রশ্ন তখনই থাকে যখন কোথাও হামলা করার পরিকল্পনা থাকে অথবা এমন সংবাদ পাওয়া যায় যে, অমুক স্থানে শত্রুরা হামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। বর্তমানে এমন কোনো পরিস্থিতি ছিল না।

মুসলিম বাহিনীর চলার গতি তীব্র না হওয়ার একটি কারণ তো এই ছিল যে, এখন তারা কোনো রণাঙ্গনের উদ্দেশে চলছিল না বরং নিজেদের জয়কৃত এলাকায় যাচ্ছিল। আরেকটি কারণ এই ছিল যে, মুজাহিদগণ একাধারে লড়াই করে যাচ্ছিলেন অগ্রাভিযান পরিচালনা করতে করতে তাদের দেহ শ্লথ হয়ে গিয়েছিল।

মুজাহিদ বাহিনীর স্বাভাবিক গতির পেছনে তৃতীয় আরেকটি কারণ ছিল, যা তিন সালার, হযরত খালিদ (রা.) এবং কয়েকজন একান্ত সাথী ছাড়া আর কেউ জানত না।

আর সে কারণটি এই ছিল যে, হযরত খালিদ (রা.)-এর উদ্দেশ্য ছিল তিনি পশ্চাৎ বাহিনী হতে সকলের আগোচরে সরে পড়বেন এবং একটি পুরাতন রাস্তা দিয়ে মক্কা যাবেন।

সৈন্যরা ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দের ৩১ জানুয়ারি যাত্রা শুরু করে। ইতিহাসে সে স্থানের কোনো নাম মিলে না যেখানে বাহিনী প্রথম যাত্রাবিরতি করেছিল। রাতে পুরো বাহিনী যখন গভীর ঘুমে হারিয়ে যায় তখন হযরত খালিদ (রা.) কয়েকজন সঙ্গীসহ তাঁবু হতে বের হয়ে গায়েব হয়ে যান। কোনো ঐতিহাসিক হযরত খালিদ (রা.)-এর সফরসঙ্গীদের নাম লিখেননি।

হযরত খালিদ (রা.) এবং তাঁর সঙ্গীগণ উটে আরোহী ছিলেন। যে স্থান দিয়ে তাদের অতিক্রম হওয়ার কথা ছিল, সেখান থেকে কেবল উটই যেতে পারত। ঘোড়া যেতে অপারগ ছিল। মরুভূমির কিছু অঞ্চল অত্যন্ত রুক্ষ ও বিপদসংকুল হয়। মুসাফিররা সে স্থান অতিক্রম করার সাহস পায় না। মরুদস্যু এবং দুর্ধর্ষ ডাকাতরা ঐ অঞ্চলে থাকত এবং লুট করে আনা সম্পদ সেখানে জমা রাখত। কিছু অঞ্চল ছিল এতটা ভয়ঙ্কর ও ভীতিপ্রদ যে, মরুদস্যু এবং লুটেরাও সেখানে যাওয়ার দুঃসাহস করত না।

হযরত খালিদ (রা.) দ্রুত মক্কায় পৌঁছার যে রাস্তা ধরেন, তা এমনই দুর্গম ছিল যে, মরুদস্যু এবং লুটেরাও ভয়ে সেখানে যেত না। এমন ভয়ঙ্কর এবং বিস্তীর্ণ মরুভূমি জীবন নিয়ে পাড়ি দেয়া সম্পূর্ণ অলীক ছিল। কিন্তু হযরত খালিদ (রা.) ২৪ ঘণ্টার দূরত্ব এক মিনিটেই পাড়ি দিতে চান। তাঁর প্লাস পয়েন্ট শুধু এই ছিল যে, তখন শীত মৌসুম চলছিল। কিন্তু হাজার হাজার মাইল পর্যন্ত পানির নাম-গন্ধ ছিল না।

মরুভূমির আরেকটি বিপদ ছিল মাটি ও বালুর ঐসব টিলা যাদের আকার-আকৃতি ছিল আজব ধরনের। এগুলো মাইলকে মাইল জুড়ে বিস্তৃত ছিল। কতক টিলা ছিল বিশাল দৈর্ঘের। কতক গোলাকার এবং কতক উঁচু উঁচু খাম্বার মত দাঁড়ানো। এসব অঞ্চল ছিল সাদৃশ্যপূর্ণ এবং দৃষ্টিভ্রমের মত। এ অঞ্চলে পা দিলে বিভ্রান্ত হওয়ার প্রবল শংকা ছিল। ঘুরে ঘুরে মানুষ সেখানেই থাকত অথচ মনে করত অনেক পথ পাড়ি দিয়ে ফেলেছে। মাসকে মাস চলেও সে পথ শেষ হত না। কাছে থাকা মজুদ পানিও পান করে করে একদিন শেষ হয়ে যেত।

তৎকালীন যুগের ইতিহাস পাঠ করে জানা যায়, মরুভূমির রূঢ়তা, কঠিনত্ব এবং বিপদশঙ্কা এত বেশি ছিল যে, না দেখলে কল্পনাও করা যায় না। কিছু কিছু স্থানে উট এমনভাবে ভীত হয়ে এদিক-সেদিক চলতে থাকে, যেন সে এমন কিছু দেখেছে, মানুষের নজরে পড়ে না। উট মরুপ্রাণী হওয়ার সুবাদে ঐ পানিও চুষে ফেলে যা মাটির তলে থাকে। কোথাও ঝর্ণা থাকলে, চোখে দেখা না গেলেও উট নিজে নিজে সেদিকে চলে যায়। উট দূর হতে বিপদের গন্ধও পায়।

হযরত খালিদ (রা.) এবং ছোট কাফেলার উটগুলো কয়েক স্থানে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। আরোহীরা এদিক-ওদিক এবং নীচে তাকায় কিন্তু সন্দেহ করার মত কোন কিছু তাদের নজরে পড়ে না। বেশি ভয় ছিল মরুসর্পের। যা দেড়-দুই বিঘতের মত হয়। এসব সাপ দুনিয়ার অন্যান্য দেশের সাপের মত সম্মুখভাগ দিয়ে চলে না; বরং পার্শ্বদেশ বেয়ে চলে। মানুষ বা কোনো প্রাণীকে দংশন করলে দু'-চার মিনিটেই তার মৃত্যু হয়ে যায়। মরুবিচ্ছুও সাপের মত বিষাক্ত হয়।

ঐতিহাসিক ইয়াকুবী হযরত খালিদ (রা.)-এর এই সফরনামা বর্ণনা করতে গিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। তিনি তার যুগের কোনো আলেমের হাওলা দিয়ে লিখেন যে, এক ধরনের মোজেযা হলো, যা আল্লাহ্ নবীদের দ্বারা দেখান। আর হযরত খালিদ (রা.)-এর এই হজ্জের সফর ঐ মোজেযার অন্তর্গত ছিল, যা মানুষ কেবল আল্লাহর শক্তির সাহায্যে করে দেখাতে পারে।

✪

হযরত খালিদ (রা.) সফরসঙ্গীসহ সময়মত মক্কায় পৌঁছে যান। এ খবর তাকে উদ্বিগ্ন করে তোলে যে, খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত আবু বকর (রা.)-ও হজ আদায় করতে এসেছেন। হযরত খালিদ (রা.) সুন্নত অনুযায়ী নিজের মাথা ক্ষুর দ্বারা মুণ্ডান। তিনি সঙ্গীদের বলেন, তিনি স্বীয় চেহারা লুকিয়ে রাখবেন, যাতে কেউ তাকে চিনতে না পারে।

হজ আদায়ের পর হযরত খালিদ (রা.) অতি অল্প সময়ে পানি এবং পথের পাথেয় যোগাড় করে প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। এটা বলা ভুল হবে না যে, তিনি দ্বিতীয়বারের মত আবার মৃত্যু-উপত্যকায় প্রবেশ করেন।

সকল ঐতিহাসিক লিখেন যে, হযরত খলিদ (রা.) হজ শেষে তখন হীরা পৌঁছেন, ফারাজ হতে রওনা হওয়া ইসলামী বাহিনী যখন সবেমাত্র হীরায় প্রবেশ করা শুরু করে। পশ্চাৎ যে দলটিতে হযরত খালিদ (রা.)-এর থাকার কথা ছিল, সেটি তখনও হীরা থেকে কিছু দূরে ছিল। হযরত খালিদ (রা.) নীরবে পশ্চাৎ দলের সঙ্গে এসে মিলিত হন এবং হীরায় এমনভাবে প্রবেশ করেন, যেন তিনি সকলের সঙ্গে ফারাজ হতে আসছেন।

ঐতিহাসিকগণ লিখেন, সৈন্যরা যখন দেখে যে, তাদের সর্বাধিনায়কসহ কয়েকজনের মাথা ক্ষুর দ্বারা মুণ্ডানো, তখন মুসলিম বাহিনীর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের কথা ও মন্তব্য হতে থাকে। কিন্তু মাথা-মুণ্ডানো কোন আজব কিছু ছিল না। হযরত খালিদ (রা.) যদি নিজেও সবাইকে জানাতেন যে, তিনি সদ্য হজ করে এসেছেন, তবে কেউ বিশ্বাস করত না।

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক হযরত তবারী (রহ.) লিখেন যে, হযরত খালিদ (রা.) নিশ্চিন্ত ছিলেন এই ভেবে যে, মক্কায় তাকে কেউ চেনেনি। ইতোমধ্যে চারমাস পেরিয়ে যায়। কিসরার বিরুদ্ধে সামরিক কার্যকলাপ শেষ হয়ে গিয়েছিল। ইরাকের অনেক ভূখণ্ড কিসরার অধীন হতে ছিনিয়ে নিয়ে তা ইসলামী সাম্রাজ্যের অন্তর্গত করা হয়েছিল। কিসরার সামরিক শক্তি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। অগ্নিপূজক পারসিকদের সকল দাপট ও দম্ভ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। চিরদিনের জন্য না হলেও এক দীর্ঘ সময়ের জন্য এই আশংকা শেষ হয়ে গিয়েছিল যে, পারস্য বাহিনী হামলা করে মুসলমানদের মূলোৎপাটন করবে। পারসিকদের নামকরা জেনারেল কারেন, হুরমুয, বাহমান, জাযুবা, আন্দাযগর, রোযবাহ, যরমেহেরসহ আরও যেসব সামরিক ব্যক্তিবর্গের সুনাম ও ত্রাস প্রসিদ্ধ ছিল, তাদের সকলে হযরত খালিদ (রা.) ও তাঁর মুজাহিদ বাহিনীর হাতে বিভিন্ন রণাঙ্গনে নিহত হয়েছিল। এ জাতীয় জেনারেল তৈরী করার জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। ইরানীরা একদিন যেসব আরব মুসলমানদেরকে আরব বুদ্দু ও ডাকু বলে অভিহিত করেছিল, বর্তমানে সমগ্র ইরাক এবং মাদায়েনের শাহী মহলগুলোতে সেসব মুসলমানদের নামে ত্রাস সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। মুসলমানদের নাম শুনে একদিন যারা নাক সিঁটকিয়েছিল এখন তারা তাদেরকে মর্যাদার চোখে দেখতে শুরু করেছিল। সবচে বড় বিজয় এটা ছিল যে, ইসলামের শান-শওকাত ও প্রভাব সারা ইরাক-ইরান জুড়ে বিস্তার লাভ করেছিল।

হযরত খালিদ (রা.) হীরায় চার মাস অবস্থান করে মুজাহিদদের আরাম করার অবকাশ দেন। এ সময়েও তিনি এই খেয়ালে জঙ্গি প্রশিক্ষণ অব্যাহত রাখেন, যেন তারা অলস না হয়ে যায় এবং তাদের রণশক্তিতে ভাটা না পড়ে। এ সময়ের মধ্যে হযরত খালিদ (রা.) বিজিত এলাকাগুলোর প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা ঢেলে সাজান এবং যাকাত, ট্যাক্স এবং কর উসূলের ব্যবস্থাপনাও উন্নত করেন।

✪

৬৩৪ খ্রিস্টাব্দের মে মাসের শেষ সপ্তাহে হযরত খালিদ (রা.) আমীরুল মু'মিনীন হযরত (রা.)-এর প্রেরীত পত্র পান। পত্রের প্রথম লাইন ছিল হযরত খালিদ (রা.)-এর হজ বিষয়ক, যে ব্যাপারে হযরত খালিদ (রা.) পূর্ণ নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, আমীরুল মু'মিনীন তাঁর হজ পালন সম্পর্কে অবহিত নন। হযরত আবু বকর (রা.) পত্রে হযরত খালিদ (রা.)-এর হজের প্রতি ইশারা করে শুধু এতটুকু লিখেছিলেন যে, "ভবিষ্যতে এমনটি আর না করা চাই।" অবশিষ্ট পত্রের বিবরণ ছিল নিম্নরূপ−

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

আতীক বিন আবু কুহাফা- এর পক্ষ হতে খালিদ বিন ওলীদের নামে। (এখানে স্মরণযোগ্য যে, প্রথম খলীফাকে বলা হয় হযরত আবু বকর (রা.)। কিন্তু এ উপাধি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দিয়েছিলেন।)

আসসালামু আলাইকুম। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার। যিনি ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই। দুরুদ ও সালাম মুহাম্মাদুর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি।

"হীরা হতে রওনা হয়ে সিরিয়ার (রোম সাম্রাজ্রের অন্তর্গত এলাকা) ঐ স্থানে চলে যাও, যেখানে ইসলামী বাহিনী অবস্থানরত। সেখানে মুসলিম বাহিনী সুবিধাজনক পর্যায়ে নেই। বিপর্যয়ের মুখে। আমি তোমাকে তোমার সাথে থাকা বাহিনী এবং যাদের সাহায্যের জন্য তুমি যাচ্ছ-সকল সৈন্যের সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করছি। রোমকগণের উপর জোরদার হামলা কর। আবু উবায়দা এবং তাঁর সঙ্গে থাকা সকল সালার তোমার অধীনস্থ হবে। ...

"আবু সুলাইমান! (হযরত খালিদ (রা.) এর অপর নাম) দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে যাত্রা কর। আল্লাহর তাওফিক এবং সাহায্যে এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আঞ্জাম দাও। বর্তমানে তোমার সাথে থাকা সৈন্যদের দু'ভাগে ভাগ করে একাংশ মুসান্না বিন হারেছার হাতে সোপর্দ কর। ইরাকের (পারস্য সাম্রাজ্যের বিজিত ভূখণ্ডের) সিপাহসালার মুসান্না বিন হারেছা হবে। সৈন্যদের অপর দলটি তুমি সঙ্গে নিয়ে যাও। আল্লাহ তোমাকে বিজয় দান করুন। সেখানে যুদ্ধ শেষে তুমি আবার পূর্বস্থানে ফিরে আসবে এবং তখন তুমিই হবে আবার সর্বাধিনায়ক।....

"আমি খুশি এ কারণে যে, অবসর শেষ হয়ে গেছে" হযরত খালিদ (রা.) বলেন। "আমরা সিরিয়া যাচ্ছি।"

হযরত খালিদ (রা.)-এর জন্ম হয়েছিল যুদ্ধের জন্য। কেল্লা এবং শহরে বসে থাকা তার পছন্দ ছিল না। তিনি সালারদের পত্রটি পড়ে শোনান এবং প্রস্তুতির নির্দেশ দেন। তিনি পুরো বাহিনীকে দু'ভাগে ভাগ করেন। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, হযরত খালিদ (রা.) সকল সাহাবাকে নিজের সঙ্গে রাখেন। সাহাবায়ে কেরামকে সৈন্যদের মাঝে মর্যাদা ও শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখা হত।

"ওলীদের পুত্র!" হযরত মুসান্না বিন হারেছা (রা.) বলেন "খোদার কসম! আপনি যে ভাগ করেছেন তাতে আমি রাজি নই। আপনি নবীজীর সকল সাহাবাকে নিজের সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন। সাহাবায়ে কেরামকেও সমানভাবে ভাগ করুন। অর্ধেক সাহাবী আপনার সঙ্গে যাবেন আর বাকী অর্ধেক আমার সঙ্গে থাকবেন। আপনি কি জানেন না যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরই উসিলায় বিজয় দান করেন?"

হযরত খালিদ (রা.) মুচকি হেসে সাহাবায়ে কেরামকে হযরত মুসান্না বিন হারেছার ইচ্ছেমত ভাগ করেন এবং স্বীয় বাহিনীর সালারদের এই নির্দেশ দেন যে, যত দ্রুত সম্ভব প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ফেল।

"এ কথা ভুলো না যে, আমরা ঐ ভাইদের সাহায্যের জন্য যাচ্ছি, যারা সেখানে দুরবস্থায় পতিত হয়েছেন।" হযরত খালিদ (রা) বলেন "নষ্ট করার মত একটি মুহূর্তও আমাদের হাতে নেই।"

সিরিয়ায় যে মুসলিম বাহিনীটি বিপর্যস্ত অবস্থায় পড়েছিল তা ছিল এক সালারের তাড়াহুড়া এবং সময়মত পরিস্থিতি বুঝতে না পারার পরিণতি। তিনি সিরিয়ার অভ্যন্তরে ঢুকে হামলা করার অনুমতি আমীরুল মু'মিনীন হতে যেভাবে সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে না জেনেই প্রার্থনা করেছিলেন, ঠিক তেমনিভাবে তিনি আমীরুল মু'মিনীনকেও এ ব্যাপারে অন্ধকারে রাখেন। আমীরুল মু'মিনীন হযরত আবু বকর (রা.) বিচক্ষণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি উক্ত সালারকে হামলা করার সরাসরি অনুমতি দেননা; বরং তিনি লিখেন ঃ

"... রোমকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আকাঙ্ক্ষা আমার অন্তরেও আছে। আমাদের প্রতিরক্ষার জন্যও এ হামলা জরুরী। রোমীয়দের সমরশক্তি এতটুকু দুর্বল করে দেয়া জরুরী, যাতে তারা ইসলামী সম্রাজ্যের দিকে চোখ তুলে

তাকানোরও দুঃসাহস না করতে পারে। কিন্তু এখনই আমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে পারি না। তুমি তাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধে লিপ্ত হয়ো না। সতর্কতার সঙ্গে সামনে অগ্রসর হবে, যাতে ঝুঁকির মুখে পিছু হটা যায়। তুমি কেবল এটা দেখার জন্য সীমিত পর্যায়ে যুদ্ধ কর যে, রোমীয় সৈন্যরা কিভাবে লড়াই করে এবং তাদের অধিনায়ক কেমন।"

আমীরুল মুমিনীন স্পষ্টভাষায় লিখেন যে, স্বীয় বাহিনীকে এমন অবস্থায় নিক্ষেপ করবে না যে পিছু হটা লাগে এমনকি পিছু হটেও দাঁড়াবার জায়গা থাকে না।

ঐ সালারের নামও ছিল খালিদ। খালিদ বিন সাঈদ। কিন্তু যুদ্ধের ময়দানে তিনি হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা.)- এর ধারে কাছেও ছিলেন না। তাঁকে একটি সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কমান্ডার বানানো হয়েছিল। তাঁর মধ্যে সমর যোগ্যতা ও অনুপ্রেরণা ভরপুর ছিল কিন্তু হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা.)-এর মত তাঁর রণাঙ্গনের অভিজ্ঞতা ছিল না। আমীরুল মু'মিনীন মূলত খালিদ বিন সাঈদকে সীমান্ত পাহারা দেওয়ার জন্য পাঠিয়ে ছিলেন। এ রক্ষী বাহিনীর হেডকোয়ার্টার ছিল 'তীমা' নামক স্থানে।

জনৈক ঐতিহাসিক লিখেছেন, হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা.)-এর ধারাবাহিক সাফল্য দেখে খালিদ বিন সাঈদ মনে করেন যে, খালিদ বিন ওলীদ যেভাবে পারস্য পরাভূত করেছে, ঠিক তেমনি আমিও রোমীয়দের পদানত করে হযরত খালিদ বিন ওলীদের মত সুনাম অর্জন করব।

এক ইউরোপীয় ঐতিহাসিক হ্যানরী মিথ এটাও লিখেছেন যে, খলীফা হযরত আবু বকর (রা.) খালিদ বিন সাঈদের নেতৃত্ব ও যোগ্যতা সম্পর্কে পূর্ণ অবগত ছিলেন। তাই তিনি তাকে বড় মাপের যুদ্ধ হতে বিরত রেখেছিলেন। কিন্তু তিনি খালিদ বিন সাঈদের কথার জাদুতে পড়ে যান।

হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা)-ও ফারাজ নামক স্থানে রোমীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু তিনি সীমান্তে থেকেই যুদ্ধ করেন। সীমান্ত ছেড়ে সামনে অগ্রসর হওয়ার মত ভুল তিনি করেননি। এর বিপরীতে খালিদ বিন সাঈদ আমীরুল মু'মিনীনের জবাব পেয়েই তার বহরকে যাত্রা করার নির্দেশ দেন এবং সিরিয়ার সীমান্তে ঢুকে যান। তখন সিরিয়ায় হিরাকেল রোম সম্রাট ছিলেন। তাঁর সমর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছিল প্রচুর। রোমীয়দের সমর ইতিহাস ও সাফল্য ছিল অনেক। তিনি নিজের দক্ষতা ও অভীজ্ঞতার আলোকে সৈনিকদের ট্রেনিং দিতেন।

এটা খুবসম্ভব তখনকার ঘটনা, যখন হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা.) ফারাজ্রে রোম-পারস্য ঈসায়ী সম্মিলিত বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে তাদের পরাজিত করেন। এ যুদ্ধে পরজিত হয়ে রোমকরা আরও সতর্ক ও সাবধান হয়ে গিয়েছিল। তিনি স্বীয় বাহিনীকে সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন।

খালিদ বিন সাঈদ সার্বিক পরিস্থিতির খোঁজ-খবর নেননি। কোনো গোয়েন্দা না পাঠিয়েই অন্ধের মত সামনে অগ্রসর হতে থাকেন। কিছু রোমীয় সৈন্যদের তাঁবু তাঁর নজরে পড়ে। তিনি শিকারকে সামনে দেখে ডান-বাম কিছু চিন্তা না করেই তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। রোমীয়দের সেনানায়ক ছিল বাহান। সমর চালের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা.) এর মত সমান দক্ষ ও অভিজ্ঞ। খালিদ বিন সাঈদ বুঝতে পারেন না যে, রোমীয়দের মুষ্টিমেয় যে বহরটির উপর তিনি হামলা করেছেন তা ছিল হাড়ির চাউলের মত। তিনি এদেরকেই পুরো বাহিনী মনে করে স্বীয় বহর নিয়ে তাদের মাঝে হারিয়ে যান।

কিছুক্ষণ পর তার হুঁশ হয় যে, তার বহরটি রোমীয়দের ঘেরাওয়ের কবলে পড়ে গেছে। আরও অনেক শত্রু সৈন্য পেছন দিক হতে তাদের উপর আক্রমণ করার জন্য দ্রুতগতিতে ছুটে আসছে। খালিদ বিন সাঈদের জন্য তাঁর বাহিনীকে বাঁচানো অসম্ভব হয়ে যায়। উপায়ন্তর না দেখে তিনি স্বীয় দেহরক্ষীদের নিয়ে রণাঙ্গণ হতে পালিয়ে যান এবং অবশিষ্ট বাহিনীকে রোমীয়দের দয়ার উপর ছেড়ে যান।

মুসলমানদের ঐ বহরে প্রখ্যাত যোদ্ধা হযরত ইকরামা বিন আবু জাহল (রা.)ও ছিলেন। কঠিন দুর্যোগময় মুহূর্তে তিনি হতাশ বাহিনীর কমান্ড নিজের হাতে নিয়ে নেন এবং অত্যন্ত সূক্ষ্ম চাল চেলে মুসলিম বহরকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন। প্রাণহানী তো ঘটেই, আহতদের সংখ্যাও ছিল প্রচুর। খালিদ বিন সাঈদের পলায়নের কারণে পুরো বাহিনী যুদ্ধবন্দী হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। হযরত ইকরামা (রা.) কমান্ড হাতে নিয়ে তাদের বন্দী হওয়ার অপমান হতে রক্ষা করেন।

ঘটনা মদীনায় পৌঁছলে খলীফাতুল মুসলিমীন খালিদ বিন সাঈদকে অপসারণ করে মদীনায় ডেকে পাঠান। খলীফাতুল মুসলিমীন এ ঘটনায় এত বেশি রাগান্বিত হন যে, তিনি ভরা মজলিসে খালিদ বিন সাঈদকে 'কাপুরুষ' এবং 'অযোগ্য' বলেন। খালিদ বিন সাঈদ নিরবে কালাতিপাত করতে থাকেন। তাঁর

মত দুঃখিত ও বিপর্যস্ত আর কেউ ছিল না। পরিশেষে আল্লাহ্ তার ডাক শোনেন। অনেকদিন পর যখন মুসলিম বাহিনী সিরিয়ায় নিয়মিত যুদ্ধ পরিচালনা শুরু করেছিলেন, তখন সিরিয়ার উদ্দেশে যাওয়া একটি বাহিনীর সঙ্গে খালিদ বিন সাঈদকে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়। তিনি নিজের নাম হতে পরাজয়ের দাগ এভাবে মুছেন যে, বীর-বিক্রমে লড়ে শহীদ হয়ে যান।

✪

আমীরুল মু'মিনীন আবু বকর (রা.) 'পরামর্শ সভা' তলব করেন। সভা শুরু হলে তিনি উপস্থিত সদস্যদের মতামত জানতে তাদের সামনে 'উদ্ভূত পরিস্থিতিতে করণীয় কী' শীর্ষক বিষয় উপস্থাপন করেন। উক্ত বৈঠকে প্রবীন সাহাবাগণ উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্যে হযরত উমর (রা.), হযরত উসমান (রা.), হযরত আলী (রা.), হযরত তলহা (রা.), হযরত যুবাইর (রা.), হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ (রা.), হযরত সাদ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.), হযরত আবু উবাইদা ইবনুল যাররাহ (রা.), হযরত মুয়াজ বিন যাবাল (রা.), হযরত উবাই বিন কা'ব (রা.) এবং হযরত যায়েদ বিন সাবেত (রা.) প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ উল্লেখযোগ্য।

"আমার বন্ধুগণ!" খলীফা আবু বকর (রা.) বলেন। "রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য ছিল সিরিয়ার পক্ষ হতে রোমীয়দের হামলার সকল সম্ভাব্য পথ রুদ্ধ করা। এর জন্য নবীজী যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন তা বাস্তবায়ন করার সুযোগ তিনি পাননি। নবীজী ইন্তেকাল করেছেন। আপনারা শুনেছেন যে, রোম সম্রাট হিরাকেল সমর প্রস্তুতি পূর্ণ করেছেন এবং ইতোমধ্যে আমাদের এক সালার পরাজিতও হয়েছেন। এমতাবস্থায় যদি আমরা রোমীয়দের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ না নিই তাহলে একে তো মুসলিম বাহিনীর মনোবল দুর্বল হয়ে যাবে এবং তারা রোমীয়দের নিজেদের তুলনায় বেশি বাহাদুর মনে করবে। আর দ্বিতীয় ক্ষতি এই হবে যে, রোমীয়রা আমাদের পানে ধেয়ে আসবে এবং তারা আমাদের জন্য বিপদের কারণ হয়ে দেখা দিবে। এহেন পরিস্থিতিতে আমি আপনাদের মূল্যবান পরামর্শ কামনা করছি। এটাও স্মরণযোগ্য যে, আমাদের বাড়তি সৈন্যও প্রয়োজন।"

"আমীরুল মু'মিনীন!" হযরত উমর (রা.) বলেন। "আপনার সংকল্প রদ করার কেউ নেই। আমি মনে করি, সিরিয়ার উপর হামলার ইঙ্গিত আল্লাহর পক্ষ

হতে আগত। আপনি সৈন্যের জন্য সেনাবাহিনীতে অধিক লোক ভর্তি করুন। যে পরিকল্পনা রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গ্রহণ করেছিলেন আমরা তা বাস্তবায়ন করব।”

“আমীরুল মুমিনীন!” হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) বলেন। “আল্লাহ আপনাকে হেফাজত করুন। চিন্তা করে দেখুন, রোমীয়রা আমাদের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী। ওদিকে খালিদ বিন সাঈদের পরিণতি দেখুন।

আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য অবশ্যই পূরণ করব। কিন্তু আমরা এখনও এর যোগ্য নই যে, রোমকদের উপর ব্যাপকভাবে হামলা করব। এটা কি ভাল হয় না যে, আমাদের বাহিনী রোমকদের সীমান্তবর্তী ফাঁড়িতে হামলা করতে থাকবে এবং হামলা করে পিছে সরে আসবে। এ প্রক্রিয়ায় রোমকদের শক্তি ক্রমান্বয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকবে এবং মুজাহিদ বাহিনীর মনোবল বৃদ্ধি পাবে। এ অবস্থায় আমরা একটি বিশাল বাহিনী তৈরি করার চেষ্টা করতে থাকব।

আমীরুল মুমিনীন! সৈন্য সংখ্যা বাড়িয়ে আপনি নিজেও জিহাদ করতে রওনা হয়ে যান এবং চাইলে নেতৃত্ব অপর কোনো নেতার হাতে সমর্পণ করুন।”

ঐতিহাসিকগণ তৎযুগের তথ্যের বরাত দিয়ে লিখেন যে, এ বক্তব্যের পর পুরো বৈঠকে সুনসান নীরবতা নেমে আসে। হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) অত্যন্ত দুঃসাহসিকতার সঙ্গে তার মতামত পেশ করেছিলেন। দীর্ঘ নীরবতায় এই ধারণা সৃষ্টি হয় যে, আর বুঝি কেউ কথা বলবেন না।

“আপনারা নীরব হয়ে গেলেন কেন?” আমীরুল মুমিনীন বলেন– “স্বীয় পরামর্শ পেশ করুন।”

“আপনার সততায় সন্দেহ করার কেউ আছে বলে মনে করি না” হযরত উসমান (রা.) বলেন। “অবশ্যই আপনি মুসলমানদের এবং দ্বীনের কল্যাণ চান। তাহলে কেন আপনি এই নির্দেশ দেন না যে, তোমরা সিরিয়ার উপর আক্রমণ কর। এর ফলাফল যাই হোক না কেন আমরা তা মাথা পেতে নিব।”

সভার অন্যান্য সদস্যগণ হযরত উসমান (রা.)-এর মত সমর্থন করেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে বলেন, দ্বীন এবং রসূলের উম্মতের মর্যাদা রক্ষার জন্য হুকুমতের পক্ষ হতে যে নির্দেশই দেয়া হবে তা আমরা সকলে বিনা বাক্য ব্যয়ে মেনে নিব।

"আপনাদের সকলের প্রতি আল্লাহর রহমত হোক" খলীফাতুল মুসলিমীন সর্বশেষে বলেন। "আমি কয়েকজন আমীর নিযুক্ত করছি। আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের পরে এ সকল আমীরদের আনুগত্য করবেন। সকলে নিজ নিজ নিয়ত ও ইরাদা পরিষ্কার রাখবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ এমন লোকদের সঙ্গেই থাকেন।"

আমীরুল মুমিনীন হযরত আবু বকর (রা.) এর কথার উদ্দেশ্য এটা ছিল যে, সিরিয়ার উপর হামলা হবে এবং রোমীয়দের সঙ্গে লড়াই করা হবে। আমীরুল মুমিনীনের কথার পর মজলিস আরেকবারের মত নীরব হয়ে যায়। মুহাম্মাদ হুসাইন হাইকেল (ঐতিহাসিক) লিখেন, এই নীরবতা অনেকটা এমন ছিল, যেন তারা রোমীয়দের ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছেন অথবা আমীরুল মু'মিনীনের ফায়সালা তাদের মনঃপূত হয় নি। হযরত উমর (রা.) সকলের পানে দৃষ্টি বুলান এবং তার চোখ অধিক আবেগ ও জযবায় লাল হয়ে যায়।

"হে ঈমানদারগণ!" হযরত উমর (রা.) গর্জে উঠে বলেন। "আপনাদের কী হল? খলীফার আহ্বানে কেন লাব্বাইক বলেন না? খলীফা কি ব্যক্তিস্বার্থে কোনো নির্দেশ দিয়েছেন? খলীফার নির্দেশ মানার মধ্যেই কি আপনাদের কল্যাণ নয়? রসূলের উম্মতদের সফলতা নয়? ... লাব্বাইক বলুন এবং অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে বলুন।"

হযরত উমর (রা.)-এর কথায় মজলিসের নীরবতা খান খান হয়ে যায়। চতুর্দিক হতে লাব্বাইক, লাব্বাইক আওয়াজ ওঠে এবং সকলে সর্বসম্মতিক্রমে বলেন যে, তারা রোমকদের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন।

✪

হজ্ব থেকে ফিরে খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত আবু বকর (রা.) মদীনায় ঘোড়দৌড়, বর্শা নিক্ষেপ, তীর ছোঁড়া, তলোয়ার চালনা এবং মল্লযুদ্ধের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। আশ-পাশের গোত্রগুলোকে এ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছিল। তিনদিন যাবত মদীনায় মানুষের এত উপচে পড়া ভীড় লেগেছিল যে, অলি-গলিতে চলাচলের জায়গাও ছিল না। যেদিকে চোখ যেত ঘোড়া এবং উটের পাল দাঁড়ানো দেখা যেত। অনবরত রণসঙ্গীত বাজতেছিল। প্রত্যেক গোত্র তাদের বীর যোদ্ধাদের বীরোচিত সংবর্ধনা দেয়ার জন্য উপস্থিত ছিল।

তিন দিন পর্যন্ত বিভিন্ন প্রতিযোগিতা চলে। যে গোত্রের লোক প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হত সে গোত্রের লোকজন ময়দানে নেমে নেচে-গেয়ে উল্লাস প্রকাশ করত। তাদের মেয়েরা বিজয়ীর প্রশংসায় গান গাইত। প্রতিযোগিতায় বাইরের কোনো অশ্বারোহী অথবা তীরন্দায অথবা কোনো উষ্ট্রারোহী আহত হলে মদীনার লোকজন তাকে তুলে নিয়ে নিজেদের ঘরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। মদীনাবাসীদের আতিথ্য বাইরে থেকে আসা গোত্রগুলোর মন কেড়ে নেয়।

প্রতিযোগিতা এবং মেলার এই আয়োজন খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত আবু বকর (রা.) করেছিলেন। প্রতিযোগিতা শেষের দিন মদীনার একজন লোক ঘোড়ায় চড়ে ময়দানে আসেন। ময়দানের চারপাশে মানুষ, ঘোড়া এবং উটের ভীড় লেগেছিল।

"হে রসূলের উম্মতগণ!" ময়দানে আগত অশ্বারোহী উচ্চকণ্ঠে বলেন- "খোদার কসম! আপনাদের হারাতে পারে, এমন কোনো শক্তি দুনিয়াতে নেই। আপনারা এই ময়দানে নিজেদের শক্তি সামর্থ্য চাক্ষুষভাবে দর্শন করেছেন। এমন হিম্মত কার আছে যে আপনাদের সামনে পা সোজা করে দাঁড়াতে পারে? যে শক্তি আপনারা একে অপরের বিরুদ্ধে প্রদর্শন করলেন, তা এখন ঐ শত্রুর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করার সময় এসে গেছে, যারা আপনাদের পানে ধাবমান।...

"হে ঈমানদারগণ! স্বীয় ভূখণ্ডের দিকে তাকান, নিজেদের ধন-সম্পদের দিকে তাকান, ঐ সকল মহিলাদের পানে তাকান, যারা আপনাদের বাচ্চাদের দুধ পান করায়। আপনাদের যুবতী ও কুমারী মেয়েদের দিকে তাকান, যারা আপনাদের জামাইয়ের অপেক্ষায় প্রহর গুনছে, যাতে বৈধ সন্তান জন্ম দিতে পারে। নিজেদের ধর্মের দিকে তাকান, যা আল্লাহর সত্য-সঠিক ধর্ম।

খোদার কসম! আপনারা তো আত্মমর্যাদাশীল জাতি। মান-সম্মানের অধিকাবী। আল্লাহ তা'আলা আপনাদের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। আপনারা অবশ্যই এটা চাইবেন না যে, দুশমন আপনাদের উপর এমন সময় ঝাঁপিয়ে পড়বে, যখন আপনারা শয্যায় নিদ্রাবিভোর থাকবেন। আপনাদের উট ও ঘোড়া জিন লাগানো ব্যতীত থাকবে। ফলে আপনারা শত্রুর হাত থেকে না নিজেদের বাঁচাতে পারবেন, না ধন-সম্পদ হেফাজত করতে পারবেন, না সন্তান-সন্ততি এবং মহিলা, যুবতী, কুমারী নারীদের ইজ্জত রক্ষা করতে পারবেন। শত্রুরা তখন আপনাদের বাধ্য করে ছাড়বে আল্লাহর সত্য ধর্ম ত্যাগ করে শত্রুদের দেব-দেবতাদের পূজা করতে।

"বলুন, সে দুশমন কে?" এক উষ্ট্রারোহী চিৎকার করে জানতে চায়– "কার দুঃসাহস এমন যে আমাদের আত্মমর্যাদাকে চ্যালেঞ্জ করছে?"

"রোমকরা!" অশ্বারোহী ঘোষণা দানের ভঙ্গিতে বলেন "তারা, যারা সিরিয়া করায়ত্ত করে রেখেছে। তাদের সৈন্য আমাদের থেকে বেশি। অনেক বেশি। তাদের অস্ত্র আমাদের চেয়ে ভাল। কিন্তু তারপরও তারা আপনাদের আক্রমণ সহ্য করতে পারবে না। আপনারা এই ময়দানে আপনাদের শক্তি ও নৈপুণ্য দেখেছেন। এখন ঐ ময়দানে চলুন যেখানে অপনাদের শক্তি ও দাপট আপনাদের শত্রুরা দেখবে।"

"আমাদেরকে সে ময়দানে কে নিয়ে যাবে?" ভীড়ের মধ্য হতে একজন জিজ্ঞাসা করে।

"মদীনাবাসী আপনাদের নিজেদের সঙ্গে নিয়ে যাবে" মদীনার অশ্বারোহী বলেন। "তাদের দিকে তাকান, যারা বছরের পর বছর ধরে সীমান্তে লড়াই করে চলেছে, হতাহত হচ্ছে এবং সেখানেই দাফন হয়ে যাচ্ছে। তারা দ্বীনের খাতিরে নিজ সন্তানদের কথা ভুলে গিয়েছে। নিজের বাড়ীর কথা ভুলে গিয়েছে। তারা সংখ্যায় অত্যন্ত স্বল্প। তারপরও তারা একের পর এক ঐ শত্রুদের পরাস্ত করে চলেছে, যারা সংখ্যায় তাদের চেয়ে অনেক গুণ বেশি। তারা রাতেও জেগে থাকে। শুধু আপনাদের ইজ্জতের জন্য। ... তারা অগ্নিপূজক পারসিকদের মস্তক চূর্ণ করে দিয়েছে। এখন শুধু রয়ে গেছে রোমকরা। কিন্তু আমাদের মুজাহিদ বাহিনী ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এক রণক্ষেত্র হতে অপর রণক্ষেত্র অনেক দূর। তারা সবখানে দ্রুত পৌঁছতে পারছেনা।... আপনারা তো আত্মমর্যাদাশীল, শক্তিধর এবং উঁচু হিম্মতওয়ালা, আপনারা কি তাদের সাহায্যে যাবেন না?"

জনতা পূর্ব হতেই উত্তপ্ত ছিল। এবার অশ্বারোহীর কথায় সকলের খুনে আগুন ধরে যায়। যুদ্ধের প্রেরণায় সকলেই উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। আমীরুল মু'মিনীনের উদ্দেশ্যও ছিল এটা যে, জনগণ জিহাদী জযবায় অনুপ্রাণিত হোক। অধিকহারে মানুষ সেনাবাহিনীতে ভর্তি হোক। বিভিন্ন গোত্রের সঙ্গে আসা মহিলারাও নিজ নিজ গোত্রের পুরুষদের সেনাবাহিনীতে ভর্তি হওয়ার জন্য তাদের উৎসাহ যোগাতে থাকে। ফলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ লোক সেনাবাহিনীতে নাম লিখিয়ে ইসলামী বাহিনীর সৈন্য হয়ে যায়।

ইয়েমেনে ইসলাম সকলের ধর্মমতে পরিণত হয়েছিল। ধর্মান্তরিতের ফেৎনারও অবসান ঘটেছিল। ইসলামই ছিল বিজয়ী ধর্ম। খলীফাতুল মুসলিমীন ইয়েমেনবাসীদের উদ্দেশে একটি বার্তা পাঠান। বার্তাটি বয়ে নিয়ে গিয়েছিল একজন দূত। বার্তার কথা ছিল নিম্নরূপ–

"ইয়েমেনবাসীগণ! আপনাদের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। আপনারা মুসলমান। আর মুসলমানের উপর জিহাদ করা তখন ফরজ হয়ে যায়, যখন এক শক্তিশালী শত্রুর আক্রমণের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। আল্লাহ পাকের নির্দেশ হলো, তোমরা সচ্ছল হও কী অসচ্ছল, তোমাদের কাছে যুদ্ধাস্ত্র কম থাক বা বেশি, তোমরা যে অবস্থায় থাক না কেন, শত্রুর বিরুদ্ধে নেমে পড়। জান-মাল দিয়ে এক আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার জন্য বের হও। আপনাদের যেসব লোকজন মদীনায় এসেছিল তাদের আমি জিহাদে যেতে উদ্বুদ্ধ করলে তারা স্বেচ্ছায় রাজি হয়ে যায়। ইসলামী বাহিনীতে নাম লেখায়। আমি সেই উৎসাহ আপনাদেরকেও দিচ্ছি। আমার কথা আপনাদের পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। তাতে আল্লাহর হুকুম রয়েছে। উহা শুনুন এবং যে আল্লাহ আপনাদের সৃষ্টি করেছেন তার নির্দেশ কার্যকর করুন।"

ঐ যুগের নিয়ম অনুযায়ী মদীনার পত্রবাহী দূত ইয়েমেনের তিন চার স্থানে মানুষদের জমা করে এবং সমবেত জনতাকে আমীরুল মু'মিনীনের বার্তা পড়ে শোনায়। এর প্রতিক্রিয়া এই হয় যে, এক সর্দার জুলকালা উমাইরী শুধু নিজ গোত্রের নওজোয়ানদের প্রস্তুত করেন না; বরং নিজের অধীনে থাকা আরও কয়েক গোত্রের যুদ্ধসক্ষম যোদ্ধাদের নিজের সঙ্গে নিয়ে নেন এবং সবাইকে নিয়ে মদীনার উদ্দেশে রওনা হন।

মদীনার দূত ইয়েমেনের সকল গোত্রে যায়। আরও তিনটি গোত্রের সর্দার-কায়েস, যুনদুব বিন আমর দাউসী এবং হাবিস বিন সাদ তাঈ স্ব-স্ব গেত্রের নওজোয়ান ও যোদ্ধাদের সঙ্গে নিয়ে সিরিয়ার যুদ্ধে অংশ নেয়ার উদ্দেশে মদীনা অভিমুখে রওনা হয়।

বিভিন্ন গোত্র হতে দলে দলে নতুন যোদ্ধারা এলে একটি বিরাট বাহিনী তৈরি হয়ে যায়। প্রত্যেক লোক ঘোড়া বা উটে আরোহী এবং বিভিন্ন ধরনের অস্ত্রে সজ্জিত ছিল। যোদ্ধারা তীরের বিশাল ভাণ্ডারও সঙ্গে করে এনেছিল। ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাস মোতাবেক ১৩ হিজরীর মুহাররম মাসে মদীনায় এই নয়া বাহিনীর সমাগম ঘটে।

আমীরুল মুমিনীন হযরত আবু বকর (রা.) নিজেই উপস্থিত প্রত্যেক লোকের প্রতি নজর দেন। সুস্থ না অসুস্থ যাচাই করেন। বাধ্য হয়ে এসেছে নাকি জিহাদের ফযিলত লাভের জন্য স্বেচ্ছায় এবং স্বতস্ফূর্তভাবে এসেছে-তা যাচাই

করেন। যাচাইয়ের একটি বড় কারণ এই ছিল যে, আগত অনেক লোক একসময় মুরতাদদের সঙ্গে ছিল। মুসলমানরা মুরতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করলে এসব লোক মুরতাদদের হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়েছিল। পরে তারা ইসলাম গ্রহণ করলেও তাদের উপর কোনো ভরসা ছিল না। মুরতাদদের এই অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল যে, তারা মুরতাদ হয়েই অবস্থান করত। যখন যুদ্ধের ময়দানে মুসলমানদের হাতে মার খেত তখন পিঠ বাঁচাতে ইসলাম কবুল করত। কিন্তু মুসলমানরা যখন তাদের উপর ভরসা করে তাদের এলাকা ছেড়ে চলে আসত তখন তাদের অনেকে ইসলাম থেকে ফিরে আবার মুরতাদ হয়ে যেত।

দীর্ঘ যাচাই-বাছাই শেষে কিছু লোককে সৈন্যসারি হতে বের করে দেয়া হয়। অবশিষ্ট সৈন্যদের চার ভাগে ভাগ করে প্রত্যেক অংশের জন্য পৃথক পৃথক সালার নিযুক্ত করা হয়। প্রতি দলে ৭ হাজার করে সৈন্য ছিল। অর্থাৎ নয়া বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল সর্বমোট ২৮ হাজার। বেশিরভাগ ঐতিহাসিক এই সৈন্যসংখ্যা লিখেছেন ৩০ হাজার। এক অংশের সালার হন হযরত আমর বিন আস (রা.)। দ্বিতীয় অংশের হযরত ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ান (রা.)। তৃতীয় অংশের হযরত শারাহবীল বিন হাসানা (রা.) এবং চতুর্থ অংশের সালার হন হযরত আবু উবায়দা ইবনুল যাররাহ (রা.)।

এই নয়া সালারগণ কয়েকদিন যাবত সৈন্যদের দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধের জন্য জরুরী প্রশিক্ষণ দেন। যুদ্ধের ময়দানে কীভাবে পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক রক্ষা করতে হয়, কীভাবে বিন্যাস ঠিক রাখতে হয়–এসবও ট্রেনিংয়ের অন্তর্গত ছিল।

✪

৬৩৪ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মোতাবেক ১৩ হিজরীর সফর মাসের প্রথম সপ্তাহে এই নবগঠিত বাহিনী সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করার নির্দেশ পায়। প্রত্যেক দলকে নির্দেশ দেয়া হয় পৃথক পৃথকভাবে রওনা হতে এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যাওয়ার জন্য। হযরত আমর বিন আস (রা.) নির্দেশ পান স্বীয় বাহিনী নিয়ে ফিলিস্তিনে যাবার জন্য। হযরত ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ান (রা.) রওনা হন দামেস্কের উদ্দেশে। তাবুকের রাস্তা দিয়ে তাঁকে যেতে বলা হয়। হযরত শারাহবীল (রা.)-এর লক্ষ্যস্থল ছিল জর্ডান। তাঁকে বলা হয় ইয়াযিদ (রা.) বাহিনীর পেছনে যেতে। হযরত আবু উবায়দা ইবনুল যাররাহ (রা.)-এর মঞ্জিল ছিল হিমসে। তাঁকেও তাবুকের পথ ধরে রওনা হতে বলা হয়।

"আল্লাহ তোমাদের সকলের সহায় ও সাহায্যকারী হোন" খলীফাতুল মুসলিমীন শেষ নির্দেশ দিতে গিয়ে বলেন "প্রত্যেক সালার তাঁর বাহিনীকে অপর বাহিনী হতে পৃথক ও দূরে রাখবে। রোমীয়দের সঙ্গে কোথাও যুদ্ধ বাঁধলে এক সালার অন্য সালারদের সাহায্যে ডেকে পাঠাবে। কোথাও চারদল মিলে যুদ্ধ করার প্রয়োজন দেখা দিলে তখন সকল বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হবেন হযরত আবু উবায়দা ইবনুল যাররাহ (রা.)।"

সর্বপ্রথম হযরত ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ান (রা.) স্বীয় বাহিনী নিয়ে মদীনা হতে রওনা হন। মদীনার মহিলারা এবং বাচ্চারাও তাদের বিদায় জানাতে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। মেয়েরা ছাদের উপর দাঁড়িয়ে বিদায়ী হাত নাড়াচ্ছিল। বৃদ্ধা মহিলারা হাত তুলে দোয়া করছিল। কিছু বৃদ্ধ লোকের চোখ এই জন্য অশ্রুতে ভরে যায় যে, তারা বার্ধক্যহেতু যুদ্ধ করার উপযোগী ছিলেন না।

হযরত ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ান (রা.) স্বীয় বাহিনীর আগে আগে যাচ্ছিলেন। ইয়াযিদের সঙ্গে হযরত আবুবকর (রা.) পায়ে হেঁটে চলছিলেন। ইয়াযিদ (রা.) ঘোড়ার পিঠ হতে নেমে পড়েন। আমীরুল মু'মিনীনের উপর্যুপরি অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি ঘোড়ায় আরোহণ করেন না। আমীরুল মু'মিনীন দুর্বল ছিলেন, তারপরেও তিনি সৈন্যদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলছিলেন। ইয়াযিদ (রা.) তাঁকে কয়েকবার অনুরোধ জানান ফিরে যেতে কিন্তু আবুবকর (রা.) তাঁর কথায় সায় দেন না। মদীনা হতে কিছু দূর গিয়ে হযরত ইয়াযিদ (রা.) থেমে যান।

"আমীরুল মু'মিনীন ফিরে না গেলে আমি এক কদমও সামনে অগ্রসর হব না" ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ান (রা.) বলেন।

"খোদার কসম আবু সুফিয়ান!" আমীরুল মুমিনীন বলেন "তুমি আল্লাহর রসূলের সুন্নত পালন হতে আমাকে থামিয়ে দিলে। তোমার কী মনে নেই যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিহাদমুখী কাফেলাকে বিদায় দিতে কাফেলার সঙ্গে সঙ্গে অনেক দূর পর্যন্ত যেতেন এবং দোয়া দিয়ে তাদের বিদায় জানাতেন? নবীজী বলতেন, "যে পা আল্লাহর রাস্তায় ধূলিমলিন হয় তাকে দোজখের আগুন স্পর্শ করবে না।"

ইতিহাস বলে, আমীরুল মুমিনীন সৈন্যদের সঙ্গে মদীনা হতে দু'মাইল পর্যন্ত চলে গিয়েছিলেন।

"আবু সুফিয়ান!" আমীরুল মু'মিনীন বলেন। "আল্লাহ তোমাকে বিজয় দান করুন এবং সাহায্য করুন। পথিমধ্যে নিজের বা সাথীদের উপর কঠোরতা করবে না। নিজে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে না পারলে অধীনস্থদের থেকে পরামর্শ নিবে। কঠোর ও তিক্ত ভাষা ব্যবহার করবে না।... ন্যায়-ইনসাফ আঁকড়ে থাকবে। জুলুম হতে দূরে থাকবে। কেননা জুলুম ও বে-ইনসাফী যারা করে আল্লাহ তাদের পছন্দ করেন না। এমন জাতি কখনও সফলও হয় না।... রণাঙ্গন হতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। কেননা, যারা যুদ্ধের প্রয়োজন ব্যতীত পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে তাদের প্রতি আল্লাহর ক্রোধ বর্ষিত হয়। ... দুশমনদের উপর বিজয়ী হলে মহিলা, বাচ্চা এবং বৃদ্ধদের উপর হাত তুলবে না। খাদ্যের প্রয়োজন ছাড়া অহেতুক কোন প্রাণীকে জবাই করবে না।"

ঐতিহাসিক ওয়াকিদী, আবু ইউসুফ, ইবনে খালদূন এবং ইবনুল আছীর (রহ.) আমীরুল মু'মিনীনের এই বক্তব্য উল্লেখ করেছেন। এসব ঐতিহাসিকের বরাত অনুযায়ী আমীরুল মু'মিনীন আবু বকর (রা.) ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ান (রা.)-কে বলেন "পথে তুমি অনেক খানকা ও আশ্রম দেখতে পাবে, সেখানে পাদ্রীরা অবস্থান করে। তারা দুনিয়াত্যাগী হয়। তাদের নিজ নিজ অবস্থায় ছেড়ে দিবে। খানকা ও আশ্রমগুলোর কোনও ক্ষতি করবে না। পাদ্রীদের উৎপীড়ন করবে না।... ক্রুশ পূজারীদের সঙ্গেও তোমার দেখা হবে। তাদের আলামত হলো, তাদের মাথার উপরিভাগের মধ্যস্থলে চুল থাকবে না, চুল মুণ্ডানো থাকবে। তাদের উপর তেমন হামলা করবে, যেমন রণাঙ্গনে করা হয়। যদি তারা ইসলাম কবুল করে অথবা কর আদায় করতে রাজি হয়, তবেই কেবল তাদের কিছু বলবে না। ...

আল্লাহর নাম স্মরণ রেখে লড়বে। সকল বিষয়ে ভারসাম্য বজায় রাখবে। গাদ্দারী করবে না। কেউ অস্ত্র সমর্পণ করলে তাকে অযথা হত্যা করবে না। এমন লোকদের বিকলাঙ্গও করবে না।"

এটা রসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিয়ম ও আদর্শ ছিল যে, কোনো বাহিনী যুদ্ধে গমন করলে কাফেলাকে বিদায় দিতে তাদের সঙ্গে পায়ে হেঁটে অনেক দূর পর্যন্ত যেতেন। সালারদের তাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে ওয়াকিফহাল করতেন এবং দোয়ার মাধ্যমে কাফেলাকে বিদায় জানাতেন।

এক একটি করে বাহিনী রণাঙ্গনের উদ্দেশে চলছিল। এবার তাদের বিরোধী পক্ষ ছিল অত্যন্ত শক্তিধর এবং দুর্ধর্ষ। সম্রাট হিরাকেল কেবল সম্রাটই ছিলেন না; বরং তিনি রণাঙ্গনের অভিজ্ঞ পরিচালক এবং সমর বিশেষজ্ঞও ছিলেন। তাই নব

গঠিত বাহিনী মদীনা ছেড়ে গেলে মদীনাবাসীদের মাঝে সুনসান নিরবতা নেমে আসে। এ সময় মুখ বন্ধ থাকলেও বক্ষ ছিল সচল। নব বাহিনীর সফলতা কামনায় প্রত্যেকটি হৃদয় ছিল সরব।

✪

এটা ছিল সেই সমর পরিকল্পনা যার জন্য আমীরুল মু'মিনীন ফায়সালা করেছিলেন যে, সমগ্র বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ ও নেতৃত্বের জন্য হযরত খালিদ (রা.)-এর চেয়ে উত্তম কোনো সালার নেই। মদীনা হতে আগত ২৮ হাজার সৈন্য মাত্র ১৫ দিনে সিরিয়ার সীমান্তবর্তী নিজ নিজ এলাকায় পৌঁছে গিয়েছিল।

হিমসে সম্রাট হিরাকেলের শাহী মহলের শান-শওকাত ঠিক তেমনই ছিল যেমন অন্যান্য সম্রাটদের শাহী মহলে থেকে থাকে। মাদায়েনের মহলের মত হিমসের মহলও সুন্দরী ও যুবতী নারী দ্বারা ভরপুর ছিল। নর্তকী-গায়িকাও ছিল অনেক। মহলে একজন সাম্রাজ্ঞীও ছিল। তবে সে যার সাম্রাজ্ঞী ছিল তার সাম্রাজ্ঞী হতে আরো অনেক প্রার্থীনি ছিল।

সম্রাট হিরাকেলের দরবারে এক আসামী ছিল। তার অপরাধ ছিল সে শাহী খান্দানের লোক ছিল না; বরং তার সম্পর্ক ছিল ঐ খান্দানের সঙ্গে যারা সম্রাটের নাম শুনেই সেজদায় লুটিয়ে পড়ত। আসামী তাদের একজন ছিল, যারা সম্রাটকে অন্নদাতা মনে করত।

ঐ আসামীর দ্বিতীয় অপরাধ এই ছিল যে, শাহী খান্দানের এক শাহজাদী তার আসক্ত ছিল। আর সে তার প্রেমাসক্ত এভাবে হয় যে, একবার শাহজাদী শিকারে গিয়েছিলেন। এ সময়ে লোকটির সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল। শাহজাদী তীর দ্বারা একটি হরিণকে সামান্য আহত করেছিলেন। শাহজাদী হরিণটি ধরতে তার পিছু অশ্ব ছুটিয়েছিলেন। কিন্তু হরিণ সামান্য আহত হওয়ায় সে ঘোড়ার ন্যায় দ্রুতবেগে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল।

ঘটনাটি ঐ আসামীর চোখে পড়ে। সে ঘোড়ায় আরোহী ছিল। হাতে ছিল বর্শা। লোকটি হরিণটির পেছনে ঘোড়া ছুটিয়ে দেয়। হরিণটি পালিয়ে যেতে চাইলে লোকটি তার পথ সংকুচিত করে এনে জ্যান্ত হরিণটিকে ঐদিকে নিয়ে যেতে চায় যেদিকে শাহজাদী দাঁড়িয়ে ছিল। শাহজাদী হরিণের লক্ষে তিন-চারটি তীর মারে কিন্তু সবকটিই লক্ষ্যচ্যুত হয়। ঐ সুদর্শন যুবক তার ঘোড়া এভাবে ছুটায় যে, ঘোড়া সোজা গিয়ে হরিণের চলার পথে এসে দাঁড়ায়। লোকটি হরিণ পাণে বর্শা ছুড়ে মারলে বর্শা হরিণের গায়ে গিয়ে বিদ্ধ হয়। এতে হরিণটি মাটিতে আছড়ে পড়ে!

শাহজাদী তার ঘোড়া নিয়ে ঘটনাস্থলে এলে যুবকটি ঘোড়া থেকে নিচে নেমে আসে এবং শাহজাদীর ঘোড়ার পায়ে গিয়ে সেজদা করে।

"আমি শাহজাদীর শিকারকে শিকার করার অপরাধ করে থাকলে আমাকে ক্ষমা করা হোক" লোকটি হাত জোড় করে বলে। "কিন্তু আমি হরিণটিকে শাহজাদীর সামনে এনেছিলাম, যাতে তিনি শিকার করতে পারেন।"

"তুমি সাহসী সৈনিক" শাহজাদী মুচকি হেসে বলে। "কী কাজ কর?"

"যে কাজে রুটি রোজগার হয় এমন প্রত্যেক কাজ করি" লোকটি জানায় "শুধু চুরি করি না এবং হারাম খাই না।"

"সম্রাট হিরাকেলের ফৌজে তোমার থাকা উচিত" শাহজাদী বলে" আমি তোমাকে মহল নিরাপত্তা বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করে নিব।"

প্রজা হওয়ায় তার মধ্যে এই দুঃসাহস ছিল না যে, সে শাহজাদীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করবে। শাহজাদী তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে এবং নিরাপত্তাকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত করে দেয়। লোকটি যখন শাহী লেবাস পায় এবং ঐ লেবাস পরে শাহী ঘোড়ায় আরোহণ করে তখন তার মধ্যের সুপ্ত প্রতিভা ও সুদর্শন চেহারা বেরিয়ে পড়ে। ফলে যুবকটি শাহজাদীর মনের মানুষ হয়ে যায়। শাহজাদী তাকে নিজের দেবতা বানিয়ে নেয়।

শাহজাদীর বিবাহ নিকটবর্তী ছিল। কিন্তু সে তার হবু বরের সঙ্গে অনীহা ভাব প্রদর্শন করা শুরু করে। হবু বর তার এক গোয়েন্দাকে আদেশ দেয়, সে যেন গোপনে শাহজাদীর উপরে চোখ রাখে এবং সে কোথায় ও কার কাছে যায় তার খবর রাখে।

এক রাতে শাহজাদীর হবু বর জানতে পারে, শাহজাদী শাহী মহলের বাগিচায় বসে আছে। বাগিচাটি ছিল শাহী মহলের অদূরে একটি নিরিবিলি সুন্দর জায়গায়। বাগিচায় ঝর্ণা ছিল, ছিল চারদিকে সবুজের গালিচা। গাছ-গাছালি ছিল, ছিল ফুল-ফলের টব। চাঁদনী রাত ছিল। শাহজাদী এবং তার প্রাণপ্রতিম প্রেমিক একজনের হাত অপরজনের হাতের মধ্যে রেখে মনের সুখে আলাপ করছিল। ইত্যবসরে পেছন হতে ভারী পায়ের আওয়াজ শোনা যায়। সম্বিত ফিরে পেয়ে তারা শাহী নিরাপত্তারক্ষীদের দ্বারা ঘেরাওয়ের মধ্যে নিজেদের আবিষ্কার করে। চারদিকে থেকে শাহী মুহাফিজরা তাদের ঘেরাও করে রেখেছিল।

শাহজাদীর প্রেমিক নিরাপত্তাকর্মীকে বন্দী করে জেলখানায় পুরা হয়। সকালে সম্রাট হিরাকেলকে ঘটনা শুনানো হয় এবং এ কয়েদীকে শিকলাবদ্ধ অবস্থায় সম্রাটের দরবারে আনা হয়। তার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ দায়ের হয়েছিল যে, সে এক শাহজাদীর শানে বেয়াদবী করেছে। অভিযোগ ভরা দরবারে উচ্চ আওয়াজে শুনানো হয়।

"সম্রাট হিরাকেলের সাম্রাজ্য সমগ্র দুনিয়াব্যাপী বিস্তৃত হোক" আসামী বলে। "শাহজাদীকে দরবারে ডেকে জিজ্ঞাসা করা হোক যে, আমি বেয়াদবী করেছি নাকি প্রেমে পড়েছি। ... আর প্রেম প্রথম আমার পক্ষ হতে হয়নি, বরং শাহজাদীর পক্ষ হতে হয়েছে।"

"একে নিয়ে যাও!" সম্রাট হিরাকেল গর্জে ওঠে বলেন। "রথের পেছনে তাকে বেঁধে দাও এবং ততক্ষণ রথ চালনা অব্যাহত রাখবে যতক্ষণ তার গোস্ত হাড় থেকে পৃথক না হয়।"

"সম্রাট হিরাকেল!" আসামী ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে "আপনি এক শাহাজাদীর প্রেম খুন করছেন।"

ইতোমধ্যে আসামীকে দরবার হতে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হতে থাকে আর তার গগণ বিদারী আর্তচিৎকার আকাশ-বাতাসে গুঞ্জরিত হতে থাকে। সে চিৎকার করে জুলুমের প্রতিবাদ জানাচ্ছিল। কিন্তু যা করেছে তার জন্য দয়া প্রার্থনা করে না।

"তোর শোচনীয় পরিণাম অতি নিকটবর্তী হিরাকেল!" আসামী চিৎকার করে বলছিল "নিজেকে এভাবে দেবতা মনে করিস না হিরাকেল! অপমান-গ্লানী তোর দিকে ধেয়ে আসছে।"

শাহজাদীর মনের মানুষকে প্রেমের অপরাধে একসময় রথের পেছনে বেঁধে দেয়া হয়। অশ্ব রথ নিয়ে ছুট দেয়। ইতোমধ্যে শাহী মহল থেকে আওয়াজ ওঠে "শাহজাদী নিজের পেটে তলোয়ার ঢুকিয়ে দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।"

জালেমের জুলুমের কারণে একই সময়ে দু'টি তাজা প্রাণ ঝরে যায়।

✪

শাহজাদীর আত্মহত্যার খবর সম্রাট হিরাকেলের দরবারে এক সময় পৌঁছে। খবরটি সম্রাটের মাঝে কোনো ভাবান্তর সৃষ্টি করে না। সম্রাট সিংহাসনে বসেন। ভরা দরবারে বিরাজ করছিল পিনপতন নিরবতা। সম্রাট নিরবে কিছু সময় সিংহাসনে বসে থেকে একটু পরে খাস কামরায় চলে যান। সম্রাট মাথা ঝুঁকিয়ে কামরায় পায়চারি করছিলেন। সম্রাজ্ঞী খাস কামরায় আসেন। সম্রাট অগ্নিদৃষ্টিতে তার দিকে তাকান।

"লক্ষণ শুভ নয়" সাম্রাজ্ঞী ধরা কণ্ঠে বলেন। "সকাল হতে না হতেই দু'টি খুন বয়ে গেল।"

"এখান থেকে কেটে পড়" হিরাকেল সাম্রাজ্ঞীকে বলেন। "আমি শাহী খান্দানের মানহানি সহ্য করতে পারি না।"

"আমি অন্য কিছু বলতে এসেছি"। সাম্রাজ্ঞী বলেন "সীমান্ত এলাকা হতে এক ঈসায়ী এসেছে। সে সারারাত সফরে ঘোড়ার পিঠে অতিবাহিত করেছে। তাকে কেউ দরবারে ঢুকতে দেয় নি। আমি বিষয়টি জানতে পেরে...।'

"সে কেন এসেছে?" হিরাকেল ঝাঁঝালো কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন "সে কি সীমান্ত এলাকা হতে কোনো খবর এনেছে?

"মুসলিম বাহিনী এগিয়ে আসছে" সাম্রাজ্ঞী বলেন।

"তাকে ভেতরে পাঠাও" হিরাকেল বলেন।

সাম্রাজ্ঞী চলে যাবার পর কিছুক্ষণের মধ্যে এক আধা বয়সী লোক কামরায় প্রবেশ করে। তার পোশাক এবং চেহারায় উড়ন্ত ধূলা-বালু জমে ছিল। লোকটি ভেতরে ঢুকেই সালাম দিতে নুয়ে পড়ে।

"তুমি মহল পর্যন্ত আসার দুঃসাহস কীভাবে করলে?" হিরাকেল বাদশাহী প্রতাপ মিশ্রিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন "তুমি কি আনীত সংবাদটি কোনো সালার কিংবা অন্য কোনো কর্মকর্তাকে দিতে পারতে না?"

"এটা অপরাধ হয়ে গেলে আমাকে ক্ষমা করবেন" আগত লোকটি বলে– "আমার আশংকা ছিল যে, এই খবরকে কেউ সত্য বলে মানবে না।"

"তুমি মুসলিম বাহিনীকে কোথায় দেখেছ?"

"হিমস হতে তিন দিনের দূরত্বে" লোকটি জবাবে বলে।

এ ছিল এক আরব ঈসায়ী। সে হযরত আবু উবায়দা ইবনুল যাররাহ (রা.)-এর বাহিনীকে সিরিয়ার সীমান্ত হতে কিছু দূরে দেখেছিল। সেদিন সন্ধ্যায় আরও দু'টি স্থান থেকে জানা যায় যে, মুসলিম বাহিনী অমুক অমুক স্থানে শিবির স্থাপন করেছে। চতুর্থ বাহিনীর সংবাদ তখনো আসেনি। রাতে হিরাকেল তার জেনারেল ও উপদেষ্টাদের ডেকে পাঠান।

"তোমরা কি জান সীমান্ত এলাকায় কী হচ্ছে?" হিরাকেল জিজ্ঞাসা করেন। "চৌকি তাদের অবস্থানের সংবাদ দেয়নি। সেখানে কী সবাই নাক ডেকে ঘুমায়? তোমরা কি এটা সহ্য করতে পার যে, আরবের কতিপয় লুটেরা তোমাদের সীমান্তবর্তী এলাকায় এসে যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ দিবে? তোমরা কি তাদের এক সালারকে স্বীয় শক্তি প্রদর্শন করনি? কিন্তু ভাগ্যক্রমে সে প্রাণ নিয়ে চলে গেছে। এখন তারা অধিক সৈন্যসহ এসেছে। তারা গণীমতের মালের পিয়াসী। এখনই প্রস্তুতি নাও। তাদের একটি লোক, একটি ঘোড়া অথবা একটি উটও যেন ফিরে যেতে না পারে।"

"সম্রাট হিরাকেল!" সিরিয়ার সর্বাধিনায়ক বলে "আপনি যেভাবে কথা বলছেন, ঠিক ততটা অনভিজ্ঞ তো নন আপনি। বিষয়টি অন্য কিছু হলে আমরা আপনার কথা সমর্থন করতাম। কিন্তু এটা সমর সংক্রান্ত ব্যাপার। আপনি জানেন পরাজয়ের পরে কী হয়?"

"আমি পরামর্শের সবক শুনতে চাই না" হিরাকেল বলেন। "এমন কী আছে যা আমি জানি না?"

"সম্রাট সব কিছু জেনে বুঝে এমন কথা বলবেন না, যেমনটি পারস্য সম্রাট জেনে বুঝে করেছিল"–রোমের অধিনায়ক বলে "তার সমরশক্তিও আমাদের মত ছিল। তাদের সঙ্গে আমাদেরও লড়াই হয়েছে। ইরাকের বিরুদ্ধে এরপর আবার সমরাভিযান পরিচালনা করার দুঃসাহস আপনিও করেননি। বর্তমানে ফারাজের ময়দানে আমাদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে পারসিকদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হতে হয়। আমরা ঈসায়ী গোত্রদেরও সঙ্গে রাখি। কিন্তু তারপরও খালিদ বিন ওলীদ আমাদের পরাজিত করেছে।"

"তবে কি তোমরা এই পরামর্শই দিতে চাও যে, মুসলমানদের ভয় করা উচিত?" হিরাকেল ক্রুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন।

"না, সম্রাট" অধিনায়ক বলে। "আপনি হিমসে বসে যেমন ভাষায় কথা বলছেন, ঠিক তেমনি সম্রাট উরদূশেরও মাদায়েনে বসে বলতেন। আমি আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, পারসিকদের পরিণতি দেখুন। মাদায়েনের শাহী মহল এখনও দাঁড়িয়ে আছে ঠিকই কিন্তু কবরের মত নিরব-নিস্তব্ধ। উরদূশের প্রথমদিকে মুসলমানদের আরবের বদ্দু এবং ডাকু বলতেন। আমি পারসিকদের পরাজয়ের তদন্ত বিশদভাবে করেছি। উরদূশেরের মুখ হতে শুধু এমন বাক্যই বের হত 'পিষে ফেল; কিন্তু তার যে জেনারেলই মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়তে গেছে সেই 'কচুকাটা' হয়েছে। মুসলিম বাহিনী তাদের ভূখণ্ড একের পর এক দখল করেছে। এমনকি এখন তাদের তীর মাদায়েনে পতিত হওয়ার উপক্রম হয়েছে।" ...

"সম্রাট হিরাকেল! আমি তথ্য নিয়ে জেনেছি যে, মুসলমানরা ধর্মীয় অনুপ্রেরণা ও শক্তি নিয়ে লড়ে; গণীমতের মালের লোভে যুদ্ধ করেনা। আমরা ভূখণ্ড দখল করার জন্য লড়াই করি। মুসলমানরা যুদ্ধ করাকে ইবাদত মনে করে। আমরা তাদের ধর্ম-বিশ্বাসকে সঠিক মনে করি বা না করি তাতে কী যায় আসে"? ...

"সম্রাটকে এটাও ভাবতে হবে যে, প্রতি রণাঙ্গনে মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা স্বল্প থাকে। তারা ধর্মীয় অনুপ্রেরণা এবং সমর নৈপুণ্যের জোরে লড়াই করে। ফারাজে আমরা স্বীয় বাহিনীসহ পারস্য ও ঈসায়ী সৈন্যদের এতদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে দিয়েছিলাম যে, মুসলমানদের মুষ্টিমেয় সৈন্যরা আমাদের সৈন্যদের মাঝে এসে হারিয়ে যেতে পারত কিন্তু মুসলমানরা এমন চাল চালে যে, আমাদের বিস্তৃতি সংকুচিত হয়ে যায় এবং আমরা তাদের হাতে চরম মার খাই।"

অন্যান্য জেনারেলরাও প্রধান সেনাপতির ভাষায় কথা বলে। যার দরুন হিরাকেল তার মত পাল্টান এবং মুসলিম বাহিনীকে শক্তিধর ও বিপদজনক মনে করে তৃণমূল থেকে যুদ্ধ প্রস্তুতির নির্দেশ দেন।

"কিন্তু আমি এটাকে নিজের জন্য অপমানজনক মনে করি যে, মুসলমানদের অভ্যুত্থান মাত্র কয়েক বছর হলেও তারা এখন বিশ্বের অন্যতম পরাশক্তি রোম সাম্রাজ্যকে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছে"–হিরাকেল বলেন "আমাদের শত বছরের পুরানো ইতিহাস রয়েছে। আমাদের মাযহাব দেবতানির্ভর মাযহাব। আসমান এবং যমিনে আমাদের দেবতাদের রাজত্ব চলে। এর বিপরীতে ইসলাম হলো মানব রচিত মাযহাব। তারপরও এ মাযহাবের দ্রুত প্রচার-প্রসারের কারণ আমার বুঝে আসছে না। আমি একটি নির্দেশই দিতে চাই, আর তা হলো, এই নয়া মাযহাবের অনুসারীদের এমনভাবে খতম করে দাও, যেন একজন লোকও ইসলাম ধর্মের নাম উচ্চারণের জন্য জীবন্ত না থাকে। এই মাযহাবের উত্থানকে আমাদের দেবতাদের মাযহাবের প্রতি চ্যালেঞ্জ বলে মনে হয় আমার।"

পরের দিনই হিরাকেল জানতে পারেন যে, মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে রোমীয় সৈন্যদের লড়াই হয়েছে এবং সে যুদ্ধে রোমীয়রা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে পিছু হটে গেছে।

এটা ছিল হযরত আমর বিন আস (রা.)-এর নেতৃত্বাধীন বাহিনী। তিনি তাবুক পেরিয়ে সামনে অগ্রসর হলে রোমীয় সৈন্যদের কয়েকটি বহর তাদের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। তারা ছিল সিরিয়ার আরব-ঈসায়ী সৈন্যদল। তাদের দায়িত্ব ছিল সীমান্ত পাহারা দেয়া। হযরত আমর (রা.) অত্যন্ত হুশিয়ার সালার ছিলেন। তিনি এমন চাল চালেন যে, নিজের বাহিনীর সবচেয়ে সামনের দলটিকে শত্রুর মুখোমুখী হওয়ার জন্য পাঠান এবং শত্রুদের ঘেরাওয়ের আওতায় আনার জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু সিরিয়ার আরব-ইসায়ী সেনাবহরটি নিজেদের পরিণতি বুঝতে পেরে সামান্য ক্ষয়-ক্ষতির পরে পিছপা হয়ে যায়।

বাধা দূর করে হযরত আমর বিন আস (রা.) ইলা নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছেন। হযরত ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ান (রা.)ও স্বীয় বাহিনীসহ তাঁর সঙ্গে এসে মিলিত হন। মদীনার দুই বাহিনী একত্রিত হতেই রোমকবাহিনী তাদের গতিরোধের জন্য সামনে চলে আসে। ঐতিহাসিকদের মতে, রোমের এই বাহিনীর সংখ্যা মুসলিম বাহিনীর মতই ছিল। এবার মুসলমানদের দুই সালার একত্রিত হয়েছিলেন। তারা রোম বাহিনীর সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। রোমীয়রা বিপুল বিক্রমে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য চেষ্টা করে কিন্তু শেষমেষ তারা টিকতে পারে না। প্রাণে রক্ষা পাওয়া সৈন্যদের নিয়ে পিছু সরে আসে।

হযরত ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ান (রা.) একদল অশ্বারোহীকে পলায়নপর রোমীয়দের পশ্চাদ্ধাবনে পাঠান। এতে রোমীয়দের মাঝে এমন আতঙ্ক সৃষ্টি হয় যে, তারা মুসলমানদের হাতে কচুকাটা হতে থাকে কিন্তু ঘুরে দাঁড়াবার হিম্মত করে না।

সম্রাট হিরাকেল স্বীয় বাহিনীর এভাবে পিছপা হওয়ার সংবাদ শুনে তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠেন। তিনি দ্বিতীয়বারের মত আবার জেনারেলদের তলব করেন এবং নির্দেশ দেন যে, বেশির থেকে বেশি সৈন্য সমবেত করে সিরিয়ার সীমান্তের বাইরে কোথাও মুসলমানদের সঙ্গে লড়াই করে তাদের সেখানেই খতম করা হোক।

মুসলিম সালারগণ যেখানে সেনাক্যাম্প স্থাপন করেছিলেন সেখানকার কিছু লোককে নিজেদের অনুগত করে নেন এবং তাদের প্রচুর পুরস্কার ও সম্মানের লোভ দেখান। যার ফলে তারা মুসলমানদের পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তি করতে সহজেই রাজি হয়ে যায়। কয়েক দিনের মধ্যেই এই গোয়েন্দারা কাঙ্ক্ষিত খবর নিয়ে আসে। গোয়েন্দা রিপোর্ট অনুয়ায়ী রোমীয়দের যে বাহিনী গড়ে তোলা হচ্ছিল তার সংখ্যা ১ লক্ষের কিছু বেশি ছিল। বিশাল এ বাহিনীর একাংশ আযনাদাইনের উদ্দেশে যাত্রা করেছিল। গোয়েন্দারা এ তথ্যও জানায় যে, রোমীয়রা এবার চূড়ান্ত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে আসছে। কীভাবে তাদের প্রস্তুতি চলছে গোয়েন্দারা তারও বিশদ তথ্য জানায়।

হযরত আবু উবায়দা ইবনুল যাররাহ (রা.)-কে আমীরুল মু'মিনীন এই নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, চার বাহিনীকে একত্রিত হয়ে যুদ্ধ করার প্রয়োজন দেখা

দিলে তাহলে সমগ্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হবেন হযরত আবু উবাইদা ইবনুল যাররাহ (রা.)। রোমীয়দের বিপুল সৈন্য সমবেত হওয়ায় প্রথম বারের মত মুসলমানদের চার বাহিনীকেও একত্রিত হওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। হযরত আবু উবায়দা (রা.) সমগ্র বাহিনী সমবেত করে পুরো বাহিনীর নেতৃত্ব নিজের হাতে তুলে নেন। কিন্তু তিনি সবাইকে পূর্ণাঙ্গভাবে একস্থানে সমবেত হতে দেন না। এর পাশাপাশি তিনি এক দ্রুতগামী দূতের হাতে একটি পত্র দিয়ে আমীরুল মু'মিনীনের উদ্দেশে পাঠিয়ে দেন। পত্রে তিনি বর্তমান অবস্থার পূর্ণ বিবরণ তুলে ধরেন এবং বিশেষ করে জানান যে, রোমীয়দের এবারের সৈন্যসংখ্যা এক লাখেরও বেশি।

এই ছিল ঐ পটভূমি যার প্রেক্ষিতে আমীরুল মু'মিনীন হযরত আবু বকর (রা.) হযরত খালিদ (রা.)-কে নির্দেশ পাঠান যে, তিনি যেন জলদি সিরিয়ার সীমান্তবর্তী ঐ স্থানে গিয়ে পৌঁছান, যেখানে মদীনার বাহিনী শিবির স্থাপন করে আছে। ঐ নির্দেশনায় এর কারণ হিসেবে লেখা ছিল, "সেখানকার মুজাহিদ বাহিনী বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে।"

আমীরুল মু'মিনীনের ঐ বার্তা হযরত খালিদ (রা.)-কে উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, আমীরুল মু'মিনীনের নির্দেশ অনুযায়ী তিনি স্বীয় বাহিনীকে দু'ভাগে ভাগ করেন। একাংশের নেতৃত্ব মুসান্না বিন হারেসার কাঁধে অর্পণ করেন। বাকী অর্ধেক সৈন্য নিয়ে তিনি সিরিয়ার উদ্দেশে দ্রুত রওনা হয়ে যান। তিনি যখন উদ্দিষ্ট স্থানের দূরত্ব অনুমান করেন তখন তা এত বেশি ছিল যে, সেখানে পৌঁছতে দীর্ঘ দিনের প্রয়োজন। তিনি আশংকা করেন, পথেই যদি এতদিন কেটে যায় তাহলে জানা নেই যে, এরই মধ্যে সেখানে কিছু ঘটে যায় কিনা। হযরত খালিদ (রা.) এটাও ভাল করে জানতেন যে, পারসিকদের তুলনায় রোমীয়রা অধিক শক্তিধর এবং যুদ্ধে ভাল। তিনি সব রাস্তা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন। সোজা এবং সহজ রাস্তাটি অত্যন্ত সুদীর্ঘ ছিল। হযরত খালিদ (রা.) সালারদের ডেকে পাঠান এবং তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করেন যে, লক্ষ্যস্থলে দ্রুত পৌঁছার জন্য কোনো রাস্তা তাদের জানা আছে কিনা। সালারদের কারো সংক্ষিপ্ত পথ সম্পর্কে জানা ছিল না।

"কোনো রাস্তা ছোট হলেও তা সফরের যোগ্য হবে না" এক সালার বলেন। "যদি কোনো এমন রাস্তার তথ্য পাওয়া যায়, যেখান দিয়ে এক-দু'জন চলতে পারে, তাহলে তাতে এটা সম্ভব হয় না যে, সে রাস্তা দিয়ে একটি বাহিনী চলবে।"

"আমি এক লোকের কথা জানি" আরেক সালার বলেন "তার নাম রাফে বিন উমাইরা। ... তিনি আমাদের গোত্রের মস্ত বড় যোদ্ধা। আমি তাকে দেখেছি যে, আল্লাহ তাকে এমন শক্তি দিয়েছেন যে, তিনি মাটির নিচের ভেদও বলে দিতে পারেন। তিনি এই মরুভূমি সম্পর্কে সম্যক অবহিত।"

হযরত খালিদ (রা.)-এর নির্দেশে রাফে বিন উমাইরাকে ডেকে পাঠানো হয়। তিনি উপস্থিত হলে গন্তব্যস্থল জানিয়ে জানতে চাওয়া হয় যে, সেখানে পৌঁছার সংক্ষিপ্ত কোনো পথ আছে কিনা।

"জমিন থেকে থাকলে রাস্তাও আছে" রাফে বলেন "এটা পথিকের হিম্মতের উপর নির্ভর যে, সে সকল রাস্তায় চলতে সক্ষম কিনা। আপনারা যে কোনও পথে গন্তব্যে যেতে পারেন কিন্তু কতক রাস্তা এমন থাকে যে পথে সাপও চলতে চায় না। আমি একটি রাস্তার সন্ধান দিতে পারি। কিন্তু এটা বলতে পারি না যে, সে পথ পাড়ি দিলে কতজন সৈন্য জীবিত থেকে গন্তব্যে পৌঁছবে। আমি এটাও জানি যে, সে পথে ঘোড়াও চলতে পারে না। সে পথ এত মরু বিয়াবানের যে, ঘোড়া তৃষ্ণা সহ্য করতে পারে না এবং ঘোড়ার পানের জন্য সাথে করে পানিও নেয়া যায় না।"

হযরত খালিদ (রা.) স্বরচিত পথের নক্সা রাফে-এর সামনে তুলে ধরেন এবং জিজ্ঞাসা করেন, কোন্ রাস্তার কথা তুমি বলছ?

"এ স্থানটির নাম করাকর" রাফে বিন উমাইরা নক্সার একস্থানে আঙ্গুল রেখে বলেন "এখানে একটি খর্জুর বিথীকা আছে, যা এত সবুজাভ ও মনোহরী, যে কোনো পথিক তার প্রেমে পড়ে যায়। এখানে থেকে একটি পথ বেরিয়ে "সেওয়ায়' গিয়ে মিলিত হয়েছে। সেওয়ায় পানির মজুদ এত বেশি যে, সমগ্র বাহিনী এবং বাহিনীর প্রাণীরাও তৃপ্ত হয়ে পান করতে পারে। কিন্তু এই পানি সে-ই পান করবে যে ব্যক্তি সেওয়া পর্যন্ত জীবিত থাকবে। উপরে সূর্যের প্রখরতা দেখুন। এমন অবস্থায় দিনে কতটুকু চলতে পারবেন? কতদূর চলা সম্ভব এটা আমি জানি না। এ পথে চলতে এত উটের প্রয়োজন যে, প্রত্যেক সৈন্য উটের পিটে চড়ে যাবে। ... ইবনে ওলীদ! আপনি মরুভূমির পুত্র জানি, কিন্তু এই মরুভূমি পাড়ি দিতে পারবেন না।"

রাফে বিন উমাইরা যে পথের সন্ধান দেন ঐতিহাসিকদের মতে তা ১২০ মাইলের ছিল। এই ১২০ মাইল পাড়ি দিলে অন্য রাস্তার তুলনায় গন্তব্যে কয়েকদিন পূর্বে পৌঁছা সম্ভব ছিল। হযরত খালিদ (রা.) এমন অধিনায়ক ছিলেন, যিনি সঙ্কটে পা দিয়ে তার গভীরতা মাপতেন। তাঁর মাথায় বর্তমানে শুধু এই

চিন্তাই ঘুরপাক খাচ্ছিল যে, মদীনার বাহিনী বিপদগ্রস্ত, তাদের আশু সাহায্য দরকার। সোজা রাস্তায় চললে গন্তব্যের দূরত্ব হয় ৭০০ মাইল। কিন্তু রাফে বর্ণিত পথে গেলে দূরত্ব অর্ধেকে নেমে আসে। অবশ্য রাফে জানিয়ে দেন যে, ঐ বিপদসংকুল পথে গেলে পাঁচ-ছয়দিন এমন কঠিন অবস্থা যাবে যে, তা সহ্য করা মানুষের পক্ষে তো দূরের কথা; ঘোড়াও তার তীব্রতা সহ্য করতে পারে না। ঐ দিনগুলোতে পানি তো মেলেই না উপরন্তু বড় সমস্যা হলো, তখন চলছিল মে মাস, যখন মরুভূমির বালু থাকে অগ্নির মত উত্তপ্ত।

"খোদার কসম, ইবনে ওলীদ!" এক সালার বলেন। "আপনি এত বড় বাহিনীকে ঐ রাস্তায় নিয়ে যাবেন না, যা শুধু ধ্বংস এবং মর্মান্তিক মৃত্যুর পথ।"

"যার মাথা ঠিক থাকে সে কখনও এ পথ পাড়ি দেয়ার সিদ্ধান্ত নিবে না" আরেক সালার বলেন।

"আমরা সেই পথেই যাব" হযরত খালিদ (রা.) কথাটি এভাবে মুচকি হেসে বলেন যে, কথাটির মধ্যে এক ধরনের গাম্ভীর্য ছিল।

"আমাদের উপর জরুরী হলো আপনার আনুগত্য করা" রাফে বিন উমাইরা বলেন "কিন্তু আরেকবার ভেবে দেখুন।"

"আমি সে নির্দেশই দিই যা আল্লাহ আমাকে দেন" হযরত খালিদ (রা.) বলেন। "সে হেরে যায় যার সংকল্প হয় দুর্বল। আল্লাহর সন্তুষ্টি আমাদের অর্জিত হয়েছে। এখন যদি আল্লাহর রাস্তায় কোনো মুসিবত আসে, তাহলে তা কেন বরদাশত করব না"।

আল্লামা তবারী (রহ.) এই ঘটনা ও আলোচনা বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। সালাররা যখন হযরত খালিদ (রা.)-এর এহেন দৃঢ় প্রত্যয় দেখেন তখন তারাও খুশি-খুশি লাব্বাইক বলেন। সালাদের মধ্যে একজন বলেন "ইবনে ওলীদ! আপনার প্রতি আল্লাহর দয়া ও করম হোক। আপনি যা ভাল মনে করেন তা করে যান। আমরা আপনার সঙ্গেই আছি।"

✪

হযরত খালিদ (রা.) সফর শুরু করার পূর্বে একটি নির্দেশ এই দেন যে, প্রত্যেক সৈন্য উটে চড়ে যাবে। ঘোড়াসমূহ আরোহী ব্যতিরেকে সৈন্যদের পেছন পেছন চলতে থাকবে। দ্বিতীয় নির্দেশ এই দেন যে, মহিলা এবং বাচ্চাদের মদীনায় পাঠিয়ে দেয়া হোক। হযরত খালিদ (রা.) সকল সালারদের জানিয়ে দেন, আপনারা প্রত্যেক সৈন্যকে এ বিষয়ে অবহিত করুন যে, তারা এমন রাস্তা

দিয়ে যাবে যে রাস্তা দিয়ে ইতোপূর্বে কোনো সৈন্য যায় নি। তাঁর এটা জানানোর উদ্দেশ্য ছিল, যেন সবাই মানসিকভাবে ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত থাকে। মে মাস উটের ব্যবস্থা করতে করতে কেটে যায়। ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দের জুন মাস মোতাবেক ১৩ হিজরীর রবিউস সানী মাস শুরু হয়। তখন মরুভূমি বারুদের মত জ্বলছিল। হযরত খালিদ (রা.) রওনা হওয়ার নির্দেশ দেন। তাঁর সঙ্গে মুজাহিদীন ছিল ৯ হাজার। যারা আত্মহত্যার সমতুল্য সফরে রওনা হয়েছিল।

করাকর পর্যন্ত সফর স্বাভাবিকভাবেই চলে। করাকর থেকে সেই সফর শুরু হয়, মুসলিম ঐতিহাসিক এবং ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ যাকে ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ও ভয়াবহ সফর বলে আখ্যায়িত করেছেন। মুসান্না বিন হারেসা করাকর পর্যন্ত হযরত খালিদ (রা.)-এর সঙ্গে যান। হীরায় তার ফিরে আসার প্রয়োজন ছিল।

করাকর থেকে যত পরিমাণ পানি সঙ্গে নেয়া সম্ভব ছিল মশকে করে তা নেয়া হয়। কলস ভরেও পানি নেয়া হয়েছিল। পরের দিন যখন সৈন্য যাত্রা করা শুরু করে তখন মুসান্না বিন হারেসা হযরত খালিদ (রা.) এবং তার সকল সালারদের সঙ্গে কোলাকুলি করেন। ইয়াকুবী এবং ইবনে ইউসুফ লিখেছেন, বিদায়ের এই সময়ে এসে মুসান্না বিন হারেসার মধ্যে কঠিন ভাবাবেগ সৃষ্টি হয়। তার মুখ থেকে কোনো শব্দ বের হয় না। চোখ দিয়ে দরদর করে অশ্রু ঝরছিল। তাঁর বিশ্বাস হচ্ছিল না, যে পথে তারা সফর করছে তাতে হযরত খালিদ (রা.) ও ৯ হাজার মুজাহিদকে দ্বিতীয়বার কখনো জীবন্ত দেখবেন। হযরত খালিদ (রা.) উটে চড়তে থাকলে রাফে বিন উমাইরা দৌড়ে আসেন "এখনও ভাবুন। রাস্তা বদলান। এতগুলো প্রাণ নিয়ে খেলবেন না।"

"ইবনে উমাইরা।" হযরত খালিদ (রা.) রাগত স্বরে বলেন– "আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুন! আমাকে আল্লাহর রাস্তা হতে বাধা দিওনা অথবা আমাকে সেই রাস্তার সন্ধান দাও, যা আমাকে মদীনার সৈন্যদের পর্যন্ত নিয়ে যাবে। এমন সংক্ষিপ্ত পথের কথা যদি না জান, তাহলে আমার সামনে থেকে সরে যাও এবং আমি যা বলি তা মান্য কর।"

রাফে হযরত খালিদ (রা.)-এর সামনে হতে সরে যান। তিনি উটের পিঠে চড়ে বসেন এবং সৈন্যদের পথচলা শুরু হয়। সর্বাগ্রে ছিল রাফে -এর উট। কেননা পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব ছিল তার।

মুসান্না ঠাঁই দাঁড়িয়ে মুজাহিদ বাহিনীর চলার দৃশ্য দেখতে থাকেন। তিনি এক পর্যায়ে সঙ্গীদের বলেন "আমীরুল মু'মিনীন যথার্থই বলেছেন যে, আর কোনো মা খালিদের মত সন্তান জন্ম দিবে না"।

যে মরুপ্রান্তর রাতে শীতল ছিল তা সূর্য উঠতেই উত্তপ্ত হতে থাকে। সূর্য যখন আরও উপরে ওঠে তখন জমিন হতে পানির রংয়ের অগ্নিশিখা উঠতে থাকে। পানির রংয়ের মরীচিকা ঝলমল করতে থাকে, যা পর্দার মত হয়ে প্রত্যেক সৈন্যের আগে আগে চলছিল। সামনে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। জুন মাসের সূর্য যখন মাথার উপরে আসে তখন সৈন্যরা একে অপরকে চিনছিল না। জমিন থেকে উঠা তাপের কম্পমান পর্দার মাঝে কম্পিত বা ঝুলানো পাতলা কাপড়ের মত অথবা তরঙ্গের মত প্রত্যেক সৈন্যকে হেলতে-দুলতে দেখা যাচ্ছিল।

মুজাহিদ বাহিনী একটি সমর সঙ্গীত সম্মিলিত কণ্ঠে গাইতে শুরু করে। হযরত খালিদ (রা.) তাদেরকে এ কাজে বাধা দেন। কেননা মুখ চালনার দ্বারা পিপাসা বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। উট কয়েকদিন যাবত পানি না খেয়ে সফর করতে পারে কিন্তু মানুষ পদাতিক হোক কিংবা আরোহী তারা কয়েক ঘণ্টার বেশি পিপাসা সহ্য করতে পারে না। প্রথম সন্ধ্যায় যখন যাত্রা বিরতি দেয়া হয় তখন সকলেই পানির উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। তাদের দেহ আগুনে জ্বলছিল। খাদ্যের স্থানও তারা পানি দ্বারা ভরে ফেলে।

✪

দ্বিতীয় দিন প্রত্যেক সৈন্য এই অনুভব করে যে, তারা আগে মরুভূমির মধ্য দিয়ে অনেকবার সফর করলেও এবারের মরুভূমি যেন মরুভূমি নয়; বরং সাক্ষাৎ জাহান্নাম, যার মধ্য দিয়ে তারা পথ চলছে। একে তো কঠিন তাপ, যা তাদের দহন করছিল দ্বিতীয়ত ছিল বালুর সোনালী ঝলক, যা তাদের চোখ খুলতে দিচ্ছিল না। বালুর সমুদ্র ছিল; না বরং বলতে হয় আগুনের সমুদ্র ছিল, সৈন্যরা যাতে সাঁতার কেটে চলছিল।

তৃতীয় দিন সফর এত ভয়ঙ্কর এবং কষ্টদায়ক হয়ে যায় যে, উচুঁ-নীচু এবং অসংখ্য টিলাবিশিষ্ট স্থান শুরু হয়ে গিয়েছিল। বালু এবং মাটির টিলা ও ঢিবিগুলো আগুনের প্রাচীরের মত হয়ে গিয়েছিল। প্রথমদিকে সৈন্যরা সরল পথে চলছিল। এবার একটু পর পরই ঘুরে চলতে হচ্ছিল। দেওয়ালের মত টিলাগুলো

মুজাহিদ বাহিনীকে দগ্ধ করছিল। এখানে সবচেয়ে বেশি আশঙ্কা ছিল ভয় পাওয়ার। দেয়াল সদৃশ কতক অগ্নি টিলার মাঝের স্থান এত সংকীর্ণ ছিল যে, উট দু'দিকে ঘষা খেতে খেতে পার হচ্ছিল। এখানে উটের ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা ছিল, কেননা সংকীর্ণ টিলাগুলো পার হতে গিয়ে তাদের শরীরে গরম বালির ছেঁক লাগছিল।

তৃতীয় সন্ধ্যায় যাত্রাবিরতি করলে সকল সৈন্যের মুখ খোলা ছিল। তারা পরস্পরে কথাও বলতে পারছিল না। সেদিন যাত্রাবিরতির পর সৈন্যরা পানি পান করলে এই ভয়ঙ্কর সত্য সামনে আসে যে, বাকী সফরের জন্য আর পানি নেই। পানির মজুদ পাঁচ দিনের জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তৃতীয় দিনেই তা শেষ হয়ে যায়। কেননা চলতি পথেও মুজাহিদগণ পানি পান করতেন।

চতুর্থ দিন কেয়ামতের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না। এক ফোঁটাও পানি নেই। পিপাসার একটি অবস্থা হয় দেহগত আর আরেকটি প্রভাব হয় মরুভূমির নিজের যা মাথাকে বিগড়ে দেয়। এটা হয় তখন যখন মরীচিকা চোখে ভাসে। পানি এবং খর্জুর বিথীকা দেখা যায়। শহর এবং সামুদ্রিক জলযান চোখে পড়ে এবং মুসাফির তাকে বাস্তব মনে করে। বালুর চমকের প্রতিক্রিয়াও বড় ভয়াবহ ছিল। এক সৈন্য জোরে বলে ওঠে "ঐ পানি দেখা যায় ... প্রথমে আমি পান করব"। আর সে লোকটি চলমান উট থেকে লাফিয়ে নেমে একদিকে দৌড় দেয়। তার দেখাদেখি তিন-চারজন মুজাহিদও তার পেছনে ছুটে যায়।

"তাকে আল্লাহর হাতে ন্যস্ত কর" রাফে বিন উমাইরা দূর থেকে বলেন। "মরুভূমি কুরবানী উসূল করা শুরু করেছে।.... তার পেছনে পড়ো না; সবার পরিণতি এক হবে। আর তা হলো মৃত্যু।"

একটু পরে এক মুজাহিদ বেহুঁশ অবস্থায় উট হতে পড়ে যায়। সে মাটিতে পড়ে উঠে দাঁড়ায় এবং উটের দিকে এগিয়ে আসার পরিবর্তে অন্য দিকে চলে যায়। কেউ তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে না। তার পেছনে না যাওয়ার একটি কারণ এটাও ছিল যে, সকলের চোখ ছিল বন্ধ। বালুর চমক এবং সূর্যতাপ তাদের চোখ খুলতে দিচ্ছিল না।

চতুর্থ দিন, যে দিন সৈন্যরা পানি ছাড়াই চলছিল। বাস্তব অর্থে তা ছিল জাহান্নামের একটি দিন। মনে হচ্ছিল, সেদিন সূর্য আরও নিচে নেমে এসেছে। প্রথমদিকে মানুষ বালুর চমক ও সূর্যতাপের প্রখরতায় চোখ বন্ধ রাখত, কিন্তু

এখন চাইলেও চোখ খুলছিল না। মরুভূমির জাহাজ খ্যাত উটও হেরে যাওয়ার উপক্রম হয়ে পড়ছিল। কোনো কোনো উট বিকট আওয়াজ করছিল। উট বসার জন্য সামনের দু'পা ভাজ করে আনে এবং এক পার্শ্বদেশ মাটিতে লাগিয়ে শুয়ে পড়ছিল। এতে তার আরোহী পড়ে যেত কিন্তু তার মধ্যে উঠার হিম্মত হত না। সৈন্যদের মধ্যে অনেকের চোখ বন্ধ ছিল এবং মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ফলে তাদের এই অনুভূতি ছিল না যে, তাদের কোনো সঙ্গী উট থেকে পড়ে গেল না উট নিজেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। যার দরুণ কেউ পড়ে গেলে তাকে উঠিয়ে নেওয়ার মত অবস্থা কারও ছিল না।

মরীচিকার শিকার লোকের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। স্বয়ং হযরত খালিদ (রা.)-এর অবস্থা এমন হয়ে গিয়েছিল যে, তাঁর কোন খোঁজ-খবর ছিল না যে, সৈন্যদের মাঝে কোন্ হালত চলছে। শুধুমাত্র দৃঢ়প্রত্যয় এবং অজেয় শক্তি তাদের জীবিত রেখেছিল। এদিকে অবলা জানোয়ার উট আপন মনে চলছিল। যদি উট থেমে যেত তাহলে এক সৈন্যের পক্ষেও এক কদম অগ্রসর হওয়া সম্ভব হত না।

সৈন্যদের সঙ্গে থাকা ঘোড়াগুলোর মুখ ঘা হয়ে গিয়েছিল। এবং জিহ্বা ঝুলে পড়েছিল। মুজাহিদদের জিহ্বাগুলোও পানিশূন্য হয়ে কাষ্ঠসদৃশ হয়ে গিয়েছিল। গলায় পিপাসার কাটা বিঁধছিল। এ কারণে তাদের মুখও হা হয়ে গিয়েছিল। তারা তখন লাশের মত হয়ে গিয়েছিল। উটের পিঠে নিজেকে ধরে রাখতে পারছিল না। এই কারণে আরোহীদের কেউ কেউ পড়ে যাচ্ছিল। তারা ক্রমে মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছে যাচ্ছিল। শরীরের আদ্রতা শুকিয়ে গিয়েছিল।

রাতে সৈন্যরা যাত্রাবিরতি করে। মুজাহিদরা সারারাত জেগে কাটায়। দেহে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিচ্ছিল। জিহ্বা এমনভাবে আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল, যেন মুখের মধ্যে কেউ কাষ্ঠখণ্ড রেখে দিয়েছে।

সফরের শেষ দিনের সূর্য উদিত হয়ে মুজাহিদ বাহিনীকে মৃত্যুর পয়গাম দিতে থাকে। কয়েকজন মুজাহিদ উটের উপর বেহুঁশ হয়ে যায়। ভাগ্য ভাল যে, তারা হেলে-দুলে পড়ে যায়নি। সৈন্যরা তখন একটি বাহিনীর মত যাচ্ছিল না। উট ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল। অনেক উট বেশ পেছনে রয়ে গিয়েছিল। কিছু উট ডান ও বামে সরে গিয়েছিল। চলার গতি আশংকাজনক হারে শ্লথ হয়ে পড়েছিল।

এটা ছিল পানি ছাড়া দ্বিতীয় দিন। পানি ছাড়া এভাবে দ্বিতীয় দিনেও বেঁচে থাকা একটি মোজেযা ছিল। কোন শক্তি তাদেরকে এভাবে জীবিত রেখেছিল? তা ছিল আল্লাহর ঐ পয়গাম যা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম

এনেছিলেন। মুজাহিদ বাহিনী মানবতার মুক্তির জন্য আল্লাহর এই পয়গাম পৃথিবীর কোনায় কোনায় পৌঁছানোর জন্য মরু অগ্নির মধ্য দিয়ে চলছিল। আল্লাহ তাদের বড় কঠিন পরীক্ষায় লিপ্ত করেছিলেন এবং তিনিই তাদের জীবিত রেখেছিলেন।

সূর্যাস্তের অনেক পূর্বে হযরত খালিদ (রা.) নিজের উট পথপ্রদর্শক রাফে-এর উটের নিকটে নিয়ে যান।

"ইবনে উমাইরা!" হযরত খালিদ (রা.) অনেক কষ্টে শব্দগুলো মুখ থেকে বের করেন "এখন কী আমাদের ঐ ঝর্ণার নিকটে থাকার কথা ছিল না, যার কথা বলেছিলে? সম্ভবত সওয়া এক মঞ্জিল দূরেই হবে।"

"আল্লাহ আপনাকে নিরাপদ রাখুন ওলীদের পুত্র!" রাফে বিন উমাইরা বলে। "আমি চোখ উঠা রোগে আক্রান্ত ছিলাম। এই মরুভূমি আমার চোখের জ্যোতি নষ্ট করে দিয়েছে। আমি এখন কীভাবে দেখব?"

"তুমি অন্ধ হয়ে গিয়েছ?" হযরত খালিদ (রা.) ঘাবড়ানো কণ্ঠে জানতে চান। "যা কিছু দেখার যোগ্যতা তোমার ছিল তা আমাদের কারো ছিল না। আমরা কি তবে পথ হারিয়ে ফেললাম?"

ঐতিহাসিক ওকীদী এবং আল্লামা তবারী (রহ.) লিখেন, রাফে বিন উমাইরার দৃষ্টিশক্তি লোপ পেয়েছিল। তবে সে কিছু গাইড লাইন মনে রেখেছিল। উল্লিখিত দুই ঐতিহাসিক রাফে-এর পূর্ণ কথা নিজেদের লেখায় এভাবে তুলে ধরেছেন।

"ইবনে ওলীদ!" রাফে বিন উমাইরা বলে। "আপনি লোকদের বলুন, তারা যেন একটি গাছ তালাশ করে, যার সারা গায়ে কাঁটা থাকবে এবং সেটা বেশি উঁচু গাছ হবে না। গাছটি দূর থেকে এমনভাবে দেখা যাবে, যেন একজন লোক বসে আছে। গাছটি ঐ দু'টিলার মাঝে থাকবে"।

প্রেরীত লোকজন বেরিয়ে পড়ে। তারা বহু সময় ঘুরে-ফিরে ফিরে এসে এই নিরাশার সংবাদ জানায় যে, টিলাদ্বয়ের মাঝে এবং ওদিক ওদিক বহুদূর পর্যন্ত তারা অনেক তালাশ করেছে কিন্তু এমন কোনো গাছ নজরে পড়েনি।

"ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" রাফে বিন উমাইরা বলে "বুঝে নিন, আমরা সকলেই মরে গেছি।" রাফে কিছুক্ষণ চিন্তা করে এবং পরে ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলে "আরেকবার যাও। আশা করি গাছ পেয়ে যাবে। বালুর মাঝে খোঁজ করবে।"

লোকজন আবার যায়। বর্শা এবং তলোয়ার বালুরাশির মধ্যে মেরে মেরে কাঙ্ক্ষিত গাছটি খুঁজতে থাকে। এক স্থানে তারা একটি বালুর ঢিবি দেখে। বালু সরালে তার নীচে মাথা মোড়ানো একটি গাছের দেহাবশেষ আবিষ্কৃত হয়। এটা ছিল কাঁটা গাছ।

"ঐ গাছটি উপড়ে ফেল" রাফে বলে "এবং ঐ স্থান থেকে মাটি খনন কর।"

মাটি কিছুদূর খনন করতেই পানির দেখা মেলে। পানি মাটির অভ্যন্তর হতে বের হয়ে নদীর মত বইতে থাকে। সৈন্যরা ঐ গর্তটি খনন করে বড় বানায়। এক পর্যায়ে তা একটি বড় পুকুরে পরিণত হয়। পানি আবিষ্কৃত হলে মুজাহিদ বাহিনী পানির উপর হামলে পড়ে। ওকিদী লিখেন, এই পানি এত বেশি ছিল যে, সমস্ত সৈন্য তা পান করে এবং উট- ঘোড়া পান করার পরও তা সমানবেগে উঠতে থাকে।

মুজাহিদ বাহিনী মশক ভরতে থাকে। তখন তাদের এই খেয়াল হয় যে, না জানি কত সৈন্য পেছনে রয়ে গেছে। পানি পান করে উটও তরুতাজা হয়ে যায় এবং সবার মধ্যে প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে আসে। সাথীদের কথা মনে হতেই কিছু মুজাহিদ উটে চড়ে পেছনের দিকে যায়। এ সময় তাদের চোখে ভয়াবহ দৃশ্য পড়ে। স্থানে স্থানে কোনো না কোনো মুজাহিদ বা কোনো উট কিংবা ঘোড়া বালুর উপরে বেহুঁশ হয়ে পড়ে উত্তপ্ত বালুতে পুড়ছিল। মুজাহিদরা তাদের মুখে পানি ঢেলে দেয় এবং চেতনা ফিরে এলে তাদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে। কিছু মুজাহিদ ইতোমধ্যে শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন। জীবিত সাথীরা তাদেরকে সেখানেই দাফন করে দেয়।

"ইবনে উমাইরা!" হযরত খালিদ (রা.) রাফে বিন উমাইরাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে বলেন। "তুমি পুরো বাহিনীকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করলে।"

"আল্লাহ রক্ষা করেছেন ইবনে ওলীদ!" রাফে বলে। "আমি এই ঝর্ণার এখানে মাত্র একবার এসেছিলাম। এটা ছিল ৩০ বছর পূর্বের কথা। আমি অল্প বয়সী বালক ছিলাম। আমার পিতা আমাকে সঙ্গে করে এনেছিলেন। এ ঝর্ণাটিকে বর্তমানে বালুরাশি ঢেকে ফেলেছিল কিন্তু আমার বিশ্বাস ছিল যে, অবশ্যই ঝর্ণাটি এখানে বিদ্যমান। এটা আল্লাহর রহস্য যে, ঝর্ণা বিদ্যমান ছিল।"

মুজাহিদদের গন্তব্যস্থল এখনও শেষ হয়নি। এটা ছিল পরীক্ষার একটি অংশ মাত্র। যা তারা উত্তীর্ণ হয়ে এসেছিল। তাদের আসল পরীক্ষা ছিল সামনে। সিরিয়ার সীমান্তবর্তী এলাকায় পৌঁছতে এখনও দু'মঞ্জিল বাকী ছিল। তবে তা কঠিন ছিল না। আসল সমস্যা এই ছিল যে, রোমীয়রা তাদের মোকাবেলা করে

সিরিয়ার সীমান্ত হতে দূরেই শেষ করে দেওয়ার জন্য এত বেশি সৈন্য সমবেত করেছিল, যাদের বিপরীতে মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা ছিল নিতান্তই অপ্রতুল, অনুল্লেখের মত।

✪

ইসলামী বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা তো পূর্ব হতেই কম ছিল। হযরত খালিদ (রা.) ৯ হাজার সৈন্যের যে মদদ নিয়ে যান, মরুভূমির অসহনীয় গরম ও শুষ্ক আবহাওয়া প্রতিটি সৈন্যের রক্ত চুষে নিয়েছিল। তাদের দেহে শক্তি বলতে কিছু ছিলনা। শরীর সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়েছিল। তাদের কিছু সংখ্যক লোক শহীদ হয়ে গিয়েছিল। মরুভূমির অগ্নিছোবল কতক সৈন্যকে ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলেছিল। আট-দশ দিনের জন্য তারা একেবারে বেকার হয়ে গিয়েছিল। অবশিষ্ট যারা ছিল তাদেরও চাঙ্গা হতে দু'তিন দিনের বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু অবস্থা ছিল এমন যে, বিশ্রামের কোনো সুযোগ ছিলনা। শত্রুরা সতর্ক এবং প্রস্তুত ছিল। এবারের শত্রু ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী ও দক্ষ।

তৎকালীন যুগে সিরিয়া ছিল রোম সাম্রাজ্যের অধীন। রোমের সৈন্য ছিল তৎযুগের অন্যতম পরাশক্তি। প্রসিদ্ধি ও দক্ষতায় তারা ছিল বিশ্বখ্যাত। তৎকালে দু'টি পরাশক্তি ছিল পারস্য বাহিনী ও রোম বাহিনী। দূর দূরান্ত পর্যন্ত এই দুই সাম্রাজ্যের সৈন্যদের সুখ্যাতি ও নাম-যশ ছিল। সৈন্য সংখ্যা যেমন ছিল প্রচুর, যুদ্ধাস্ত্রও ছিল তাদের বিশ্বসেরা। রোমের সেনাবাহিনী সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, তারা যে রাস্তা দিয়ে চলত সেখানকার বসত-বাড়ী বিরান হয়ে যেতে।

পারস্য সমরশক্তিকে মুসলমানরা অত্যন্ত স্বল্প সংখ্যক সৈন্য দ্বারা নিঃশেষ করে দিয়েছিল এবং ইরাকের অনেক ভূখণ্ড দখল করে নিয়েছিল। বর্তমানে মুসলমানরা অপর পরাশক্তিকে যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ দিচ্ছিল। রোমীয়রা একা ছিল না। তাদের মিত্র শক্তি গাসসান গোত্র বিরাট শক্তিধর ছিল। একবার রোমীয়রা যখন গাসসান গোত্রের উপর আক্রমণ করতে এসেছিল তখন গাসসান গোত্র একাই তাদের প্রতিহত করেছিল। সে যুদ্ধ কয়েকদিন বা মাসে শেষ হয়নি বরং গাসসানীরা এক সুদীর্ঘ কাল যাবৎ সমানে লড়েছিল। রোমীয়রা সিরিয়ার বিস্তৃত এলাকা কব্জা করে নিলেও গাসসানীরা লড়াই করতে থাকে। তারা রোমীয় বাহিনীর সীমান্তবর্তী চৌকিগুলোতে গেরিলা হামলা চালাতে থাকে এবং কখনও রোমের অধিকৃত ভূখণ্ডের অনেক ভেতরে গিয়ে হামলা করত।

গাসসানী এবং রোমীয়দের এই যুদ্ধ বংশানুক্রমে চলতে থাকে। পরিশেষে রোমীয়দের একথা মানতে বাধ্য হতে হয় যে, গাসসানী নিছক কোনো কবিলার

নাম নয়; বরং তারা একটি জাতি এবং তাদের পরাজিত করা যায় না। ফলে রোমীয়রা গাসসানীদের স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এবং সিরিয়ার কিছু এলাকা দিয়ে তাদেরকে এভাবে স্বায়ত্বশাসন দেয় যে, তাদের নিজেদের বাদশা থাকবে আর সে একটি পর্যায় পর্যন্ত রোম সম্রাটের অধীন হবে। এটা অনেকদিন পূর্বের ঘটনা। যুগ-পরিক্রমার সাথে সাথে গাসসানী গোত্র এমন পন্থা অবলম্বন করে যে, তাদের শাহী খান্দানকে রোমের শাহী খান্দান মনে করা হতে থাকে।

বর্তমানের জর্ডান এবং দক্ষিণ সিরিয়ায় গাসসানীদের রাজত্ব ছিল। তারাও রোমীয়দের মত সাম্রাজ্যের অধিকারী ছিল। তাদের সৈন্য সুসংগঠিত ও শক্তিধর ছিল। যুদ্ধাস্ত্রের দিক দিয়েও তারা ছিল উন্নত। তাদের রাজধানী ছিল বসরা।

মুসলমানরা রোমীয় এবং গাসসানীদেরকে যুদ্ধে আহ্বান জানিয়ে মারাত্মক বিপদের ঝুঁকি নিয়েছিল। সাধারণ সমরনীতি এই যে, আক্রমণকারী বাহিনীর সংখ্যা সে দেশের সৈন্যদের চেয়ে তিনগুণ না হলেও অবশ্যই দ্বিগুণ হতে হবে। কেননা যে বাহিনীর উপর হামলা করা হয় তারা কেল্লার অভ্যন্তরে থাকে। তারা তাজাদমও হয়। এর বিপরীতে আক্রমণ করতে আসা বাহিনী দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে আসে। ফলে তারা তাজাদম থাকে না। যে বাহিনীর উপর হামলা করা হয় তারা স্বদেশে থাকে, যেখানে তাদের রসদ ও মদদের ব্যবস্থা থাকে। পক্ষান্তরে আক্রমণ করতে আসা বাহিনী এসব সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকে। স্বদেশের এক একটি বাচ্চাও হামলাকারীদের দুশমন হয়ে থাকে।

মুসলমানরা যখন সিরিয়া আক্রমণ করতে যায় তখন তাদের সৈন্য ছিল সর্বমোট ৩৭ হাজার। ২৮ হাজার পূর্ব হতেই সেখানে বিদ্যমান ছিল। হযরত খালিদ (রা.) বাকী ৯ হাজার সৈন্য সাথে নিয়ে এসেছিলেন। এই ৯ হাজার সৈন্য তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ করার উপযুক্ত ছিল না। এই ৩৭ হাজার সৈন্য যাদের উপর আক্রমণ করতে গিয়েছিল তাদের সৈন্যসংখ্যা ছিল প্রায় দেড় লাখ। সকলেই ছিল তাজাদম এবং সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

পাঁচ দিনের ভয়াবহ সফর শেষে যখন মুজাহিদ বাহিনী ঝর্ণা হতে পানি পান করে, আহার করে, তখন তাদের উপর তন্দ্রা আচ্ছন্ন হওয়া কুদরতি বিষয় ছিল। সৈন্যদের আশা ছিল। তাদের কিছু দিন আরাম ও বিশ্রাম করার সুযোগ মিলবে। বিশ্রামের দরকারও ছিল তাদের, কিন্তু গন্তব্যে পৌঁছে তারা তাদের প্রধান হযরত খালিদ (রা.)-কে দেখেন যে, তিনি উটের পরিবর্তে ঘোড়ায় চেপে বসে আছেন। যার মর্মবাণী ছিল এটাই যে, মুহূর্তের জন্য বিশ্রামের সুযোগ হবে না।

ঐতিহাসিক ওকীদী লিখেন, হযরত খালিদ (রা.) হাল্কা ওজনের বর্ম পরিধান করেছিলেন। তিনি বর্মটি পরেছিলেন ঝর্ণার কাছে এসে পানি পানের সময়। বর্মটি ছিল ভণ্ড নবীর দাবীদার মুসাইলামা কাজ্জাবের। হযরত খালিদ (রা.) যখন তাকে পরাস্ত করেছিলেন তখন তার বর্ম খুলে নিজের কাছে রেখেছিলেন। এটা ছিল ধর্মান্তরিতের ফেৎনার উপর বিজয় অর্জনের স্মারক। সে যুদ্ধজয়ের আরেকটি নিশানা হযরত খালিদ (রা.)-এর কাছে ছিল। আর তা ছিল তার তলোয়ার। এটিও ছিল মুসাইলামা কাজ্জাবেরই। হযরত খালিদ (রা.) তলোয়ারটি নিজের কোমরে বেঁধে রেখেছিলেন।

ঐতিহাসিক ওকীদির তথ্য অনুযায়ী হযরত খালিদ (রা.)-এর মাথার উপরে শিকলবিশিষ্ট শিরস্ত্রাণ ছিল। শিরস্ত্রাণের উপরে ছিল পাগড়ী বাঁধা। পাগড়ীর রং ছিল লাল। শিরস্ত্রাণের নিচে যে টুপি তিনি পরেছিলেন তার রংও ছিল লাল। হযরত খালিদ (রা.)- এর হাতে কালো-সাদা রংয়ের পতাকা ছিল; যা কেবল এই কারণে সম্মানিত ছিলনা যে, এটা ছিল ইসলামী ঝাণ্ডা; বরং এই জন্য তা গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, এই ঝাণ্ডা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি রণাঙ্গনে নিজের সঙ্গে রাখতেন। যখন নবীজী হযরত খালিদ (রা.)-কে 'সাইফুল্লাহ' (আল্লাহর তরবাবী) উপাধিতে ভূষিত করেন, তখন তিনি এই ঝাণ্ডাটিও তাকে দিয়েছিলেন। ঝাণ্ডার নাম ছিল 'ইকাব'।

৯ হাজার মুজাহিদদের মধ্যে যেমনিভাবে সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন। তেমনি ছিলেন হযরত খালিদ (রা.)-এর পুত্র আব্দুর রহমানও। তার বয়স ছিল ১৮ বছর। এ বাহিনীতে আমীরুল মু'মিনীন হযরত আবু বকর (রা.) এর পুত্রও ছিল। তার নামও ছিল আব্দুর রহমান।

মুজাহিদ বাহিনী খানা-পিনা শেষে এদিক-ওদিক বসেছিল। তারা তাদের সর্বাধিনায়ককে ঘোড়ায় চড়ে নিজেদের মাঝে ঘুরতে-ফিরতে দেখে সবাই উঠে দাঁড়ায়। হযরত খালিদ (রা.) মুখে কিছু বলেন না। তিনি প্রত্যেক মুজাহিদের দিকে তাকান এবং মুচকি হাসেন। তাঁর মাথায় শিরস্ত্রাণ এবং গায়ে বর্ম দেখে এবং তাঁর হাতে নবীজীর ঝাণ্ডা দেখে মুজাহিদরা বুঝে যায় যে, তাদের সর্বাধিনায়ক যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। এতে মুজাহিদ বাহিনী কারো কিছু বলা ছাড়াই উঠে দাঁড়ায় এবং উট ছেড়ে সকলে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে যায়। তারা জেনে যায় যে, আল্লাহর তরবারী সামান্য সময়ের জন্যও খাঁপে যাবে না।

হযরত খালিদ (রা.)-এর প্রাণচাঞ্চল্যকর মুচকি হাসি পুরো বাহিনীর ক্লান্তি দূর করে দেয়। বাহিনী চলার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়।

"ওলীদের পুত্র! এই দেখুন!" এক লোক উল্লসিত কণ্ঠে বলছিল এবং দৌড়ে আসছিল "এই দেখুন, ওলীদের পুত্র! আল্লাহ তা'আলা আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। আমি এখন দেখতে পারি। আপনাকে আমি দেখছি।"

"নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদের উপর রহম-করম করেন" একটি কণ্ঠ বড় আওয়াজে বলে।

"আল্লাহ তা'আলা দয়ালু এবং দয়াবান" আরেকটি কণ্ঠ নারাধ্বনি দেয়। আগত লোকটি ছিল রাফে বিন উমাইরা, যিনি ভয়ঙ্কর মরুভূমিতে পথ চলতে মুজাহিদ বাহিনীর পথপ্রদর্শন করেছিলেন। তিনি চোখ উঠা রোগে আক্রান্ত ছিলেন। বালুর চমক এবং সূর্যতাপের প্রখরতায় তার দৃষ্টিশক্তি লোপ পেয়েছিল। কিন্তু দেহে ঝর্ণার পানি এবং চোখে পানির ঝাপটা পড়লে রাফে-এর দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসে। তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসায় হযরত খালিদ (রা.) খুব খুশি হন। এর একটি বড় কারণ এই ছিল যে, তাঁর বাহিনীর পথপ্রদর্শক এবং রণাঙ্গনের বীর যোদ্ধা চিরদিনের জন্য অন্ধ হয়েছিল। দ্বিতীয় আরেকটি কারণ এই ছিল যে, রাফে বিন উমাইরা হযরত খালিদ (রা)-এর জামাতা ছিলেন।

✪

মুজাহিদ বাহিনী ভয়ঙ্কর পাঁচ দিনের সফর শেষে ঝর্ণার পানি পেয়ে ও পান করে যখন নিজেদের বিধ্বস্ত অবস্থা কাটিয়ে ওঠে, তখন তারা আবার সম্মুখ পানে পরবর্তী মঞ্জিলের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করে দেয়। সামনের সফর সহজ ও আরামদায়ক ছিল। কিন্তু ঐ দুশমনের উপর বিজয় অর্জন করা কঠিন ছিল, যাদের সঙ্গে লড়াই করতে তারা চলছিল। এবারের দুশমন ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। সেখানে কেল্লাও ছিল। যুদ্ধস্থানটি ছিল তাদের রাজত্বের অধীন। মুসলমানরা ছিল খোলা ময়দানে এবং নিজেদের বাড়ী-ঘর থেকে অনেক অনেক মাইল দূরে। নিজেদের আহার ও পশুদের আহারের ব্যবস্থা তাদের নিজেদেরই করতে হত। এটা ছিল তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

হযরত খালিদ (রা.) যখন স্বীয় বাহিনী নিয়ে সিরিয়ার সীমান্ত এলাকার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তখন গাসসানী বাদশা জাবালা বিন আইহাম তার মন্ত্রীবর্গ ও সেনাপতিদের নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন যে, মুসলিম বাহিনী সীমান্তে এসে গেছে, তাদেরকে ওখানেই শেষ করে দিতে হবে। ইতোমধ্যে খালিদ বিন সাঈদকে রোমীয় সৈন্যরা পরাজিত করে ফেলেছিল এবং মদীনার ২৮ হাজার মুজাহিদ বাহিনী চার দলে বিভক্ত হয়ে সিরিয়ার সীমান্ত এলাকায় পৌঁছেছিল।

"আমরা রোমীয়দের পরাভূত করেছি" গাসসানী বাদশাহ জাবালা তার সভাষদ ও সালারদের বলছিলেন। "রোমীয়দের চেয়ে উন্নত এবং বীর যোদ্ধা আর কারা হতে পারে। আমরা সেই শক্তিশালী বাহিনীর কোমর ভেঙ্গে দিয়ে তাদের থেকে এই ভূখণ্ড ছিনিয়ে নিয়েছি, যার উপর আজ আমরা রাজত্ব করছি। তোমাদের সঙ্গে মুসলমানদের কোনো তুলনাই হয় না। এটা চিন্তা করোনা যে, মুসলমানরা পারসিকদের পরাস্ত করেছে এবং তাদের ঘুরে দাঁড়াবার যোগ্য রাখেনি। পারসিকরা ছিল ভীতু-কাপুরুষ। নিজেদের পিতৃ-পুরুষদের ইতিহাস ও গৌরবগাঁথা স্মরণ কর। যদি তোমরা নিজেদের মাঝে মুসলিম ভীতি ছড়িয়ে দাও, তাহলে আজ যে রোমীয় আমাদের ভাই হয়ে রয়েছে, তারাও তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। এতে করে তখন তোমরা দু'শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হবে। মুসলমানদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। তারা বেশি দিন তোমাদের সামনে দাঁড়াতে পারবে না।"

"গাসসান বাদশা!" এক বয়োবৃদ্ধ সেনাপতি বলে। "তাদের সংখ্যা কম হলে এর কারণ কী যে, পারস্যের নামকরা জেনারেলরা তাদের হাতে পরাস্ত ও পরাভূত হয়েছে? মুসলমানরা কী ফারাজ রণাঙ্গনে রোম ও পারস্যের সম্মিলিত বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেনি?"

"অবশ্যই করেছে" জাবালা বিন আইহাম বলেন "আমি তোমাদের কথা বলছি। যদি তোমরা মুসলমানদের তোমাদের তলোয়ারের নীচে রাখতে পার, তাহলে রোম ও পারসিকদের উপর তোমাদের বীরত্বের গভীর প্রভাব পড়বে। আর তোমরা ভাল করেই জান যে, এতে তোমাদের লাভ কী। আমার নির্দেশ হলো, সীমান্তের প্রত্যেক বসতিতে এই বার্তা পৌঁছে দাও যে, মুসলমানদের সৈন্য অথবা তাদের কোনো দল যদি কোনো দিক দিয়ে অতিবাহিত হয়, তাহলে তারা যেন তাদের উপর আক্রমণ করে এবং তাদের বেশির থেকে বেশি ক্ষতি করার চেষ্টা করে। প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যে গাসসানী মায়ের দুধ পান করেছে সে নিজ গোত্রের জন্য নিজের প্রাণ কুরবানী করবে, তবে তিন-চারজন মুসলমানের প্রাণ নিয়ে তারপর...। আমি নিজেকে ধোঁকা দিচ্ছি না। আমি ঐ মুসলমানদের দুর্বল মনে করছি না। যারা নিজেদের মাতৃভূমি ছেড়ে এত দূরে এসেছে। তারা তাদের ধর্ম ও আকীদা-বিশ্বাসের উপর ভর করে এসেছে। তাদের আকীদা হলো, তাদের ধর্ম সত্য, তারা আল্লাহর প্রিয় বান্দা এবং আল্লাহ তাদের সাহায্য করেন। যদি তোমাদের আকীদা-বিশ্বাস দৃঢ় হয় তাহলে তোমরা তাদের কচুকাটা করতে পারবে। গোত্রের বালকদেরও লড়াইয়ে নিয়ে আসবে। মহিলারাও যেন লড়াইয়ে

শরীক হয়। প্রত্যেকেই এই চেষ্টা করবে, মুসলমানরা যেন এখান থেকে এক দানা খাদ্যও না নিতে পারে। এক ফোঁটা পানিও সংগ্রহ করতে না পারে। তাদের উট-ঘোড়া যেন ঐ ঘাসের একটি পাতাও না খেতে পারে, যা তোমাদের জমিন উৎপন্ন করেছে।"

হযরত খালিদ (রা.)-এর পরবর্তী মঞ্জিল ছিল 'সেওয়া'। এই স্থান সম্পর্কে তাদের জানানো হয়েছিল যে, এলাকাটি সবুজাভ এবং শ্যামলিমাপূর্ণ। বাহিনী লোকালয়ের প্রথম বসতির কাছে এলে কম বেশি চল্লিশ অশ্বারোহী মুসলমানদের অগ্রভাগের উপর এমনভাবে হামলা করে যে, আক্রমণকারীদের ঘোড়া হঠাৎ টিলার পশ্চাৎদিক দিয়ে বের হয়, দ্রুত দৌড়ে আসে এবং মুজাহিদদের দেহপানে বর্শা ছুঁড়ে মারে। মুজাহিদরাও বীরযোদ্ধা ছিলেন এবং তাদের মত গেরিলা আক্রমণে পারঙ্গম ছিলেন। এই জন্য তাদের বড় ধরনের ক্ষয়-ক্ষতির শিকার হতে হয়নি। কিছু মুজাহিদ আহত হয় এবং তারা আক্রমণকারীদের মধ্যে হতে তিন-চারজনকে ঘোড়ার পিঠ থেকে ফেলে দিতে সক্ষম হন।

এরা ছিল গাসসানী বাহিনী, যারা প্রথম দর্শনেই মুসলমানদের এই বার্তা দিয়ে যায় যে, তারা লড়াই করতে জানে এবং তাদের মাঝে লড়াই করা এবং মৃত্যুবরণ করার প্রেরণাও আছে। হামলাকারীরা আক্রমণ করে দ্রুত সটকে পড়ে এবং এদিক সেদিক হারিয়ে যায়। কিছু দূরে গিয়ে তারা আবার ফিরে আসে। এবার মুসলমানরা পূর্ণভাবে প্রস্তুত ছিল। গাসসানীরা আবার আক্রমণ চালায়। তারা বর্শা ও তলোয়ারে সুসজ্জিত ছিল। মুসলমানরা তাদেরকে ঘেরাওয়ের মধ্যে আনতে চেষ্টা করে কিন্তু তারা বীরবিক্রমে লড়ে বেরিয়ে যায়। তাদের মাঝে জমে লড়াই করার মত মনোভাবই ছিল না।

মুসলমানদের পশ্চাৎ বাহিনীর উপরও গাসসানীরা আক্রমণ করে। এ আক্রমণের ধরনও ছিল গেরিলা প্রকৃতির। ঘোড়া হঠাৎ করে দৌড়ে আসত এবং দৌড়ের মাঝে আক্রমণ করে বেরিয়ে যেত। হযরত খালিদ (রা.) সৈন্যদের মধ্যসারিতে ছিলেন। সামনের ও পিছনের সৈন্যদের উপর আক্রমণের খবর জানতে পেরে তিনি পুরো বাহিনীর বিন্যাস নতুনভাবে করেন। কিন্তু সৈন্যদের বেশি দূর ছড়িয়ে দেয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় না। কেননা অঞ্চলটি সুগম ছিল না।

কিছুক্ষণ পর হযরত খালিদ (রা.)-এর সামনে কয়েকজন গাসসানী যুদ্ধবন্দীকে আনা হয়। তাদেরকে মুজাহিদরা ঘোড়ার পিঠ থেকে ভূপতিত করেছিল। তাদের থেকে যখন যুদ্ধবিষয়ক তথ্য লাভ করা হয়, তখন তারা অত্যন্ত দুঃসাহসিকতার সঙ্গে কথা বলে।

"তোমরা যে দিকেই যাও না কেন তোমাদের উপরে আক্রমণ হবে" এক বন্দী বলে।

"তোমাদের কে বলেছে যে, আমরা তোমাদের শত্রু?" হযরত খালিদ (রা.) জিজ্ঞাসা করেন।

"দুশমন না হলে এখানে এসেছ কেন?" এক কয়েদী জবাবে বলে।

ঐ কয়েদীরা এসব তথ্য দেয় না যে, তাদের সৈন্য কতজন এবং কোথায় কোথায় তারা অবস্থান করছে। তাদের থেকে এটা জানা যায় যে, সীমান্তবর্তী সমস্ত বসতিতে তাদের বাদশার এই নির্দেশ পৌঁছেছে যে, মুসলমানদের উপর হামলা করতে থাকবে, যাতে মুসলমানরা গাসসানী বাহিনীর সামনে এলেও তখন তারা ক্লান্ত-শ্রান্ত ও দুর্বল থাকে।

"এখান থেকে তোমাদের একদানা খাদ্যও মিলবে না" এক কয়েদী বলে–

"পানের জন্য এক ফোঁটা পানিও পাবে না।"

"তোমাদের উট এবং ঘোড়াও আমরা না খাইয়ে মারব" আরেক কয়েদী বলে। "তোমাদের পশু-প্রাণী আমাদের জমিন থেকে একটি পাতাও খেতে পারবে না।"

"মৃত্যু কি তোমাদের এখানে নিয়ে এসেছে?" আরেক কয়েদী বলে।

"যুদ্ধ করতে এলে খালিদ বিন ওলীদকে সঙ্গে নিয়ে আসতে" আরেক কয়েদী বলে।

"সে এলে তোমরা কী করতে?" হযরত খালিদ (রা.) জিজ্ঞাসা করেন।

"শুনেছি তার সামনে কোনো দুশমন সোজা দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না" কয়েদী জবাবে বলে। "শুনেছি সে বড়ই জালেম মানুষ। কয়েদীদের নিজ হাতে কতল করে।"

"যদি সে এত বড় জালেম হত তাহলে তোমরা এখন নিজ পায়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে না" হযরত খালিদ (রা.) বলেন। "তোমাদের মাথা তোমাদের কাঁধের উপর থাকত না।"

"সে কোথায়?" কয়েদী জানতে চায়।

"তোমাদের সামনে দাঁড়ানো" হযরত খালিদ (রা.) মুচকি হেসে বলেন। "আমি তোমাদের বীরত্বের প্রশংসা করছি। যে ধরনের হামলা তোমরা করেছ তা কেবল বাহাদুররাই পারে।"

সকল যুদ্ধবন্দী চুপ হয়ে যায় এবং তারা বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে হযরত খালিদ (রা.) কে দেখছিল।

"তোমরা কি আমার ব্যাপারে আশংকা কর যে, আমি তোমাদের কতল করব?" হযরত খালিদ (রা.) জিজ্ঞাসা করেন।

তাদের কেউ কোনো জবাব দেয় না।

"না" হযরত খালিদ (রা.) নিজেই নিজের প্রশ্নের উত্তরে বলেন। "তোমাদের হত্যা করা হবে না। ইতোমধ্যে তোমাদের আরও অনেক ভাই আমাদের হাতে বন্দী হয়েছে। কাউকেই কতল করা হবে না। কতল তাকেই কেবল করা হবে যে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসবে। ... তোমরা কি গাসসানী বাহিনীর লোক?

"না" এক কয়েদী জবাবে বলে। "আমরা এ বসতির লোক।"

"তোমরা আমার নাম কীভাবে জানলে?" হযরত খালিদ (রা.) জিজ্ঞাসা করেন।

"ইবনে ওলীদ!" মধ্যবয়সী এক লোক বলে। "আপনার নাম গাসসানের প্রতিটি শিশু পর্যন্ত জানে। গাসসানী সৈন্যরা আপনার সম্পর্কে অবগত। পারস্য বাহিনীকে পরাজিতকারী সেনাপতি সাধারণ মানের মানুষ হতে পারে না। কিন্তু ইবনে ওলীদ! এবার আপনার মোকাবেলা হবে গাসসান গোত্রের সঙ্গে।"

হযরত খালিদ (রা.) লোকটির সঙ্গে বাহাস করতে চান না। তিনি ঐ কয়েদীসহ সকল যুদ্ধবন্দীদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনা অব্যাহত রাখেন এবং তাদের থেকে কিছু তথ্য জেনে নেন। ঐতিহাসিক ওকীদী লিখেছেন, হযরত খালিদ (রা.) ভাবতেও পারেন না যে, গাসসানী এবং রোমীয়রা শুধু তার সম্পর্কেই অবগত নয়; বরং নামের পাশাপাশি তার সংশ্লিষ্ট কিছু ঘটনা ও কথাও তাদের পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। অনেকেই তাকে 'অসাধারণ ব্যক্তিত্ব' মনে করে।

হযরত খালিদ (রা.) সম্মুখপানে অগ্রসর হতে থাকেন। গাসসানী গোত্রের লোক আরও দু'এক স্থানে মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালায়। একটি হামলা ছিল গেরিলা ধরনের। কঠিন আক্রমণ ছিল। যেহেতু মুসলমানরা প্রস্তুত এবং সতর্ক ছিল তাই তাদের ক্ষয়-ক্ষতি বেশি হয় না। এবার হামলাকারীদের রক্তপাতের ঘটনা বেশি ঘটে। যুদ্ধবন্দীদের থেকে হযরত খালিদ (রা.) জানতে পারেন যে, তাদের উপর এভাবে হামলার মূল উদ্দেশ্য কী? তিনি চিন্তা করে দেখলেন, এভাবে যদি লড়াই চলতে থাকে, তাহলে মুজাহিদ বাহিনীর খানা-পিনার কোনো ব্যবস্থা হবে না। এতে মারাত্মক সংকট সৃষ্টি হবে।

মুজাহিদ বাহিনী জোহর এবং আসরের মধ্যবর্তী সময়ে 'সেওয়ার' নিকটবর্তী এক এলাকায় পৌঁছলে সেখানে বিস্তৃত একটি সবুজ-শ্যামল এলাকা দেখেন। অসংখ্য অগণিত ভেড়া, বকরী এবং চতুষ্পদ জন্তু চরছিল। এর অদূরেই ছিল

সেওয়া বসতি। মুজাহিদ বাহিনীর উপর হামলা হতে পারে এই চিন্তায় হযরত খালিদ (রা.) আগেভাগে নির্দেশ দেন যে, চারণভূমির সকল পশু ধরা হোক এবং সেগুলোকে খাওয়া ও দুগ্ধবর্তী প্রাণীগুলোকে দুধ দানের কাজে ব্যবহার করা হোক।

মুজাহিদ বাহিনী পশু-প্রাণী ধরা শুরু করলে বসতিওয়ালারা মুসলমানদের উপর আক্রমণ করে। গাসসানীদের ঘোড়া ছিল উন্নত, তাদের অস্ত্রও ছিল ভাল কিন্তু এবার তারা মুসলমানদের সামনে বেশিক্ষণ টিকতে পারে না। হযরত খালিদ (রা.) চারনভূমি দখল করে নেন। যখন তিনি পাশের বসতিতে যান, সেখানে লড়াই করার মত একজন মানুষও ছিল না। বৃদ্ধ, মহিলা এবং বাচ্চারা ছিল। মুসলমানদের দেখে তারা পালাতে শুরু করে। মহিলারা বাচ্চাদের কোলে নিয়ে আত্মগোপন করে অথবা পালাতে থাকে। হযরত খালিদ (রা.) এর নির্দেশ সবাইকে আনা হয় এবং তাদেরকে বলা হয় যে, তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হবে না। যদি বসতি হতে মুসলমান সৈন্যদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়; তাহলে পুরো বসতি বিরান করে দেয়া হবে।

✪

গোয়েন্দারা হযরত খালিদ (রা)-কে জানায়, কিছু দূর সামনে একটি কেল্লা আছে সেখানে ঈসায়ী সৈন্য রয়েছে। তাদের সালার হলো রোমীয়। এ তথ্যও তিনি পান যে, সেওয়ার পলায়নপর গাসসানীরা ঐ কেল্লায় আশ্রয় নিয়েছে।

কেল্লাটির নাম ছিল 'আরাক'। সূর্য ডুবে গিয়েছিল। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছিল। সূর্য অস্ত যেতেই কেল্লার দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এরপর কেল্লার সান্ত্রীরা যারা দেয়ালে চড়ে পাহারা দিচ্ছিল দূর থেকে ঘোড়ার আওয়াজ শুনতে পায়। সান্ত্রীরা "খবরদার! হুঁশিয়ার!" বলে আওয়াজ দিতে শুরু করে। কমান্ডার পাঁচিলের উপরে উঠে নিচের দিকে তাকায়। সে অনেক ঘোড়া দৌড়ে আসতে দেখে। ঘোড়াগুলো কেল্লার প্রধান ফটকে এসে থেমে যায়। তখনও অনেক ঘোড়া ও উট আসছিল।

"তোমরা কারা?" দরজার উপরে নির্মিত বুরুয হতে এক কমান্ডার জিজ্ঞাসা করে।

"আমরা গাসসানী" বাইরে থেকে এক অশ্বারোহী জবাব দেয়। "মুসলমানদের সেনারা আসছে। আমরা সেওয়াতে তাদের গতিরোধ করতে চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু আমরা তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারিনি। আমরা বসতিতে গেলে মুসলমানরা আমাদের জ্যান্ত রাখত না।

"তোমরা আশ্রয় নিতে এসেছ?"

"আশ্রয়ও নিব" এক গাসসানী অশ্বরোহী বলে। "এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়বও"।

"তোমাদের আমাদের বিশেষ প্রয়োজন।"

রোমীয় সালারকে ডাকা হয়। সে নিশ্চিত হওয়ার জন্য তাদেরকে কয়েকটি প্রশ্ন করে এবং তাদের জন্য কেল্লার দরজা খোলার ব্যবস্থা করে। তারা রোমীয় সালারকে বিস্তারিতভাবে জানায় যে, মুসলমানদের সংখ্যা কত এবং তারা বর্তমানে কোথায়?

পরের দিন প্রভাতেই হযরত খালিদ (রা.)-এর বাহিনী কেল্লায় গিয়ে পৌঁছে এবং কেল্লা অবরোধ করে নেয়। কেল্লায় থাকা ঈসায়ী বাহিনী কেল্লার দেয়ালে চলে আসে এবং সৈন্যদের একাংশকে কেল্লার বড় দরজা হতে কিছু দূরে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। এই অংশকে এই অবস্থার জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয় যে, দরজা ভেঙ্গে গেলে এ বাহিনী যেন মুসলমানদের ভেতরে আসতে না দেয় এবং নির্দেশ পেলে বাইরে গিয়ে মুসলমানদের উপরে আক্রমণ করবে। কেল্লার বাইরে থেকে থেকে যুদ্ধের আহ্বান এবং নারাধ্বনি চলছিল।

"কেল্লা আমাদের হাতে তুলে দাও" হযরত খালিদ (রা.)-এর নির্দেশে রাফে বিন উমাইরা উচ্চ আওয়াজে বলে। "অন্যথায় প্রত্যেক গাসসানী কতল হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাক। হাতিয়ার সমর্পণ কর। কাউকে বাইরে পাঠিয়ে দাও, যার সঙ্গে আলোচনা করে সন্ধির শর্তাবলী চূড়ান্ত হবে।"

"হে মুসলমানরা!" উপর হতে এক কমান্ডার দৃঢ় কণ্ঠে বলে "এই কেল্লা তোমাদের এত সহজে পদানত হবে না।"

ওকিদী লিখেন, কেল্লার অভ্যন্তরে একজন বয়োবৃদ্ধ আলেম ছিলেন। তিনি রোমীয় সালারকে ডেকে পাঠান। ঐ আলেমের যথেষ্ট মর্যাদা ও প্রভাব ছিল এবং গাসসানীরা তার নির্দেশ মানত ও তার প্রত্যেক কথাকে সঠিক বলে বিশ্বাস করত।

"এই বাহিনীর ঝাণ্ডার রং কি কালো?" আলেম জিজ্ঞাসা করেন।

"হ্যাঁ। পবিত্র পিতা!" রোমীয় সালার জবাবে বলে "তাদের ঝাণ্ডা চোখে পড়ছে, তা সাদা ও কালো রং বিশিষ্ট।"

"এই বাহিনীই কি মরুভূমির ঐ পথ অতিক্রম করে এসেছে, যেখান দিয়ে কখনও কেউ অতিবাহিত হয় নি" আলেম জানতে চান।

ঐতহাসিক ওকিদী, তবারী এবং ইবনে ইউসুফ লিখেন, দু'জন গোয়েন্দা ঐ আলেমকে জানায় যে, মুসলিম বাহিনী মরুভূমির ঐ অংশ পেরিয়ে এসেছে যেখানে উটও যায় না এবং সেখানে গেলে সাপও জীবিত থাকে না।

"এই বাহিনীর সালারের গড়ন কি উচ্চ ধরনের" বয়স্ক আলেম জিজ্ঞাসা করেন।

"তাঁর চোখ কি বড় বড় এবং কাঁধ প্রশস্ত?"

"সম্মানিত পিতা!" কেউ জবাবে বলে "গঠন তো সকলের চেয়ে উচ্চ এবং দেহও বলিষ্ঠ। তবে তাঁর কাঁধ সবচেয়ে প্রশস্ত।"

"তাঁর দাড়ি কি বেশি ঘন?" আলেম জিজ্ঞাসা করেন। "এবং তাঁর চেহারায় বসন্তের দাগ আছে?"

"হাঁ, সম্মানিত দরবেশ!" আরেক জন জবাবে বলে। "তাঁর দাড়ি অন্যদের তুলনায় বেশি ঘন এবং এই দাড়ির কারণে তার চেহারা খুব সুন্দর দেখা যায়। তার চেহারায় বসন্তেরও কিছু দাগ আছে।"

ঐ আলেম দরবেশ রোমীয় সালার এবং ঈসায়ী নেতৃবৃন্দের দিকে তাকান এবং কিছুক্ষণ চুপ থাকেন। এরপর তিনি নিজের মাথা ডান-বামে দু'বার নাড়ান।

"ইনি সেই ব্যক্তি যার মোকাবেলা করার হিম্মত তোমাদের কারোরই নেই।" আলেম বলেন।

"আপনি এমন ব্যক্তিত্ব যার সম্মান-মর্যাদা করা আমাদের সকলের দায়িত্ব তারপরও আপনি একি কথা বলছেন!" রোমীয় সালার বলেন "সে তো আমাদের বন্দী হবে, যার ব্যাপারে আপনি আমাদের ভয় দেখাচ্ছেন।"

"তুমি কী তাদের পরিণতি দেখনি, যারা তাঁর মোকাবেলা করেছে?" আলেম বলে।

"সে কী আসমানের কোনো দেবতা, যাকে পৃথিবীর কোনো মানুষ পরাভূত করতে পারবে না?" এক ঈসায়ী নেতা জিজ্ঞাসা করে।

"হে ঈসায়ী নেতা!" আলেম বলেন "চওড়া কাঁধের অধিকারী ও মুখে বসন্তের দাগ বিশিষ্ট যে লোক মদীনা হতে এসেছে তাঁর কাছে একটি ঝাণ্ডা আছে আর আমার কাছে আছে ইলম। তোমার কাছে না আছে ঝাণ্ডা, না আছে ইলম। তুমি রোমীয়ও নও, গাসসানীও নও। যা আমি দেখি তা তোমার চোখে পড়বে না। ... আর তুমি যে বলছ, সে আসমানের দেবতা কী না ... শোন রোমীয় সালার এবং তুমিও শোন হে ঈসায়ী নেতা! যে ব্যক্তি ঐ মরুভূমির মধ্য দিয়ে স্বীয়

বাহিনীকে জিন্দা নিয়ে আসতে পেরেছে যেখানকার বালু প্রথমে অন্ধ করে দেয়, এরপর শরীরকে শুষ্ক কাঠ বানায়, এরপর জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দেয়; সে মানুষ আসমানের দেবতাদেরও পরাজিত করতে পারে। ... আমি অপর কিছুই বলতে চাইনা এর বাইরে যে, এই কেল্লা তাঁর হাতে তুলে দাও। আর যদি লড়তে চাও হুঁশ-জ্ঞান ঠিক রেখে কাজ করবে। কিন্তু কথা হলো, বিবেক তোমার সঙ্গ দিবে না।"

✪

বয়োবৃদ্ধ আলেম ও দরবেশ যখন কেল্লাপিতা এবং ঈসায়ী নেতাদের বলছিলেন যে, তারা হযরত খালিদ (রা.)-এর মোকাবেলা করতে চাইলে যেন মাথা ঠিক রেখে করে, তখন কেল্লার অভ্যন্তর হতে মুসলমানদের আহ্বান শোনা যাচ্ছিল।

"দরজা খুলে দাও ... অস্ত্র সমর্পন কর ... আমরা কেল্লা পদানত করতে এসেছি... নিজেদের বাহিনী, মহিলা এবং বাচ্চাদের বাঁচাও।"

রোমীয় সালার ঈসায়ী নেতাদের সঙ্গে নিয়ে কেল্লার পাঁচিলের উপর আসে এবং সব দিকে ঘুরে ঘুরে দেখে। তাদের দৃষ্টিতে মুসলমানদের সংখ্যা এত বেশি মনে হয় না যে, তারা কেল্লা পদানত করে ফেলবে। কিন্তু তারা মুসলমানদের ঝাণ্ডা 'ইকাব' দেখছিল, যা দেখে তাদের ভেতরে ভেতরে এক ধরনের ভীতি অনুভব হতে থাকে।

"সমগ্র বাহিনী কি এই-ই?" রোমীয় সালার কাউকে জিজ্ঞাসা করে "এটা হতে পারে না।"

"সকল সৈন্য এই-ই" কেউ জবাবে বলে।

"তাদের উপর তীর বর্ষণ কর" রোমীয় সালার নির্দেশ দেয় "কাছে এলে বর্শা ছুঁড়ে মারবে।"

পাঁচিলের উপর হতে তীর বর্ষিত হতে থাকে।

"খোদার কসম! এই তীর আমাদের ঠেকাতে পারবে না" হযরত খালিদ (রা.) উচ্চ কণ্ঠে বলেন "এমন তীর আমাদের উপর অনেক বার বর্ষিত হয়েছে। তীরন্দাযদের সামনে পাঠাও। দরজার উপর আক্রমণ চালাও।... এবং সবাইকে জানিয়ে দাও যে, এটা হলো সিরিয়ার প্রথম কেল্লা। যদি আমরা প্রথম কেল্লায় হেরে যাই তাহলে পরাজয় আমাদের কপালের লিখন হয়ে যাবে।"

হযরত খালিদ (রা.)-এর দূত যখন কেল্লার চতুর্দিকে এই পয়গাম পৌঁছে দেয়, তখন তীরন্দায বাহিনী তীরবৃষ্টির মুখেও সামনে অগ্রসর হয় এবং এদিক-ওদিক নয়; বরং এক একজন লোককে টার্গেট করে তীর মারতে থাকে। সবচেয়ে বেশি তীরান্দায কেল্লার প্রধান ফটকে সমবেত হয়েছিল। তারা দরজার উপরে এবং বুরুযে তীর নিক্ষেপ করছিল। মুজাহিদ বাহিনীর স্বতঃস্ফূর্ততা এবং বীরত্বের অবস্থা এই ছিল যে, কয়েকজন মুজাহিদ দরজা পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং কুঠার দিয়ে দরজা ভেঙ্গে ফেলতে শুরু করে।

দরজা ছিল মজবুত। যা ভাঙ্গা এভাবে সহজসাধ্য ছিল না। কেননা উপর থেকে তীর এসে পড়ছিল। কিন্তু মুজাহিদদের এই বীরত্ব এবং নারাধ্বনি কেল্লাবাসীদের মনোবল ভেঙ্গে দেয়। তাদের মধ্যে কেল্লাস্থ আলেম ও দরবেশের কথার প্রভাবও ছিল।

"এখনও সময় আছে" হযরত খালিদ (রা.)-এর নির্দেশে উচ্চকণ্ঠের অধিকারী এক মুজাহিদ ঘোষণা দেয় "কেল্লা দিয়ে দিলে তোমরাই লাভবান হবে। আর যদি লড়াই করে কেল্লা দখল করতে হয়, তাহলে একজনও দয়া-অনুকম্পার আশা রাখবে না।"

কিছুক্ষণ পরেই কেল্লার উপর সাদা ঝাণ্ডা দুলতে থাকে। হযরত খালিদ (রা.) সালারদের নিকট দ্রুত দূত পাঠান এই কথা বলে যে, সবাই যেন লড়াই বন্ধ রাখে।

"বাইরে এসে কথা বল" মুসলমানদের পক্ষ হতে ঘোষণা দেয়া হয়।

কেল্লার দরজা খুলে যায়। রোমীয় সালার দু'তিন ঈসায়ী নেতাসহ বাইরে বেরিয়ে আসে এবং মদীনার ঐ সালারের সামনে এসে দাঁড়ায়, যার কাঁধ চওড়া, দাঁড়ি ঘন এবং যার চেহারায় বসন্তের গুটি গুটি দাগ ছিল।

"খোদার কসম! তোমরা বিজ্ঞলোক" হযরত খালিদ (রা.) রোমীয় সালারকে বলেন। "তুমি নিজের ভূখণ্ড এবং সৈন্যদের গণহত্যা থেকে হেফাজত করেছ। এখন তুমি আমার থেকে তেমন আশা রাখতে পার, যেমন এক বন্ধু অপর বন্ধু হতে রাখে। হযরত খালিদ (রা.) তাঁর প্রতি হাত বাড়িয়ে দেন। রোমীয় সালার মুসাহাফা করার জন্য হাত বাড়ায়।

"হাত নয়" হযরত খালিদ (রা.) বলেন "প্রথমে তলোয়ার।"

রোমীয় সালার নিজের কোমর হতে তলোয়ার খাঁপসহ খুলে হযরত খালিদ (রা.)-এর হাতে সমর্পণ করে। তার দেখাদেখি ঈসায়ী নেতারাও নিজেদের তলোয়ার খুলে হযরত খালিদ (রা.) সামনে ছুঁড়ে দেয়।

"এখন বলুন, হে মদীনার সালার!" রোমীয় সালার জিজ্ঞাসা করে "আপনার অন্য শর্ত কী? আমাদের যুবতী মেয়েরা এবং বাচ্চারা আপনার সৈন্যদের থেকে নিরাপদ থাকবে?"

"আমরা তোমাদের মেয়েদের তুলে নিতে আসিনি হে রোমীয় সালার!" হযরত খালিদ (রা.) বলেন "আমরা কর নিব। অন্য কোন শস্য বা উৎপাদিত বস্তুও নিব না। যদি তুমি আরও কতক্ষণ লড়াই করতে এবং আমরা জোরপূর্বক কেল্লা দখল করতাম, তাহলে আরাকের প্রতিটি ইট খুলে ফেলতাম এবং ভেতরে লাশের স্তূপ পড়ে থাকত। তুমি নিরাপদে এসেছ, আবার নিরাপদে ফিরে যাও। মেয়েদের, বাচ্চাদের এবং তাদের মাতাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাও। ... অন্তরে এ কথার বিশ্বাস রাখ যে, আমরা লুটতরাজ করতে আসিনি। আমরা কিছু দিতে এসেছি। এই হলো আমাদের আকীদা-বিশ্বাস; ইসলাম। এ ব্যাপারে ভেবে দেখার পরামর্শ রইল।"

ঐতিহাসিকরা লিখেন, রোমীয় সালার ও ঈসায়ী নেতারা ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় এসেছিল। ভয় এই ছিল যে, হযরত খালিদ (রা.) তাদের হত্যা করে ফেলবেন এবং কেল্লার অভ্যন্তরে কিছুই আস্ত রাখবেন না। কিন্তু হযরত খালিদ (রা.) কর ছাড়া অন্য কোনো শর্ত আরোপ করেননি। এখন রোমীয় সালার ও ঈসায়ী নেতারা ভীত ছিল না, বরং বিস্ময়াবিভূত ছিল। তাদের বিশ্বাস হচ্ছিল না যে, কোনো বিজেতা পরাজিতদের সঙ্গে এভাবে মন খুলে কথা বলতে পারে। তাদের উপর কঠোরতা শুধু এই করা হয় যে, কেবল সৈন্যদের কেল্লা হতে বের করে দেয়া হয়। বাকী সমস্ত লোকজন শান্তি ও নিরাপত্তার সঙ্গে সেখানেই অবস্থান করতে থাকে।

হযরত খালিদ (রা.) সেখান থেকে স্থানীয় পথপ্রদর্শক পেয়ে যান। আরাকের পরে দু'টি এলাকা ছিল। সাখানা এবং কদামা। হযরত খালিদ (রা.) আরাক অধিকার করে নিয়েছিলেন কিন্তু স্বীয় বাহিনীকে শহরের বাইরে তাঁবু স্থাপন করে রাখেন। রাতে হযরত খালিদ (রা.) স্বীয় সালারদের সঙ্গে বড় আবেগী ভাষায় আল্লাহর শোকর আদায় করেন। সন্ধ্যার পূর্বেই কেল্লাপতি অস্ত্র সমর্পণ করেছিল।

ঐতিহাসিকগণ লিখেন, সিরিয়ার সীমান্ত এলাকার কাছে পৌঁছে হযরত খালিদ (রা.)-এর চাল-চলনে কিছুটা পরিবর্তন এসে গিয়েছিল। তিনি লাল রংয়ের পাগড়ী মাথায় বেঁধে রাখতেন। মুসায়লামা কাজ্জাবের তলোয়ার তাঁর কাছে থাকত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রদত্ত পবিত্র ঝাণ্ডা তাঁর তাঁবুতে স্থাপন করা থাকত এবং বেশিরভাগ সময় দেখা যেত যে, হযরত খালিদ (রা.) ঐ পবিত্র ঝাণ্ডার দিকে অনিমেষ লোচনে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

সফররত অবস্থাতেও যখন ঐ ঝাণ্ডাকে দেখতেন, তখন দীর্ঘ সময় ধরে তাঁর দৃষ্টি ঝাণ্ডার দিকে নিবদ্ধ থাকত। সম্ভবত এই চিন্তা তাঁকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল যে, তিনি মাতৃভূমি হতে অনেক দূরে একটি শক্তিধর রাষ্ট্র বিজয় করতে এসেছেন। কিন্তু তার কথাবার্তা এবং মুচকি হাসির মাঝে উন্নত ও তাজা মনোবল সুস্পষ্ট প্রতিভাত হচ্ছিল।

রাতে হযরত খালিদ (রা.) তাঁর সালারদের ডেকে পাঠান।

"নিঃসন্দেহে আল্লাহ গফুরুর রহীম" হযরত খালিদ (রা.) বলেন। "জয়-পরাজয় তাঁরই হাতে। আমরা আল্লাহর নামেই লড়ি। জান তাঁর নামেই কুরবানী করি। ... আমার বন্ধুগণ! কীভাবে শুকরিয়া জ্ঞাপন করবে আল্লাহ তা'আলার, যিনি এখানে আসার পূর্বেই তোমাদের ভীতি ইসলামের দুশমনদের মনে গেঁথে দিয়েছেন। খবরদার! অহঙ্কার করবে না। একথা ভুলবে না যে, আমাদের সঙ্গে ঐ ঝাণ্ডা আছে, যা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের সঙ্গে সঙ্গে রাখতেন। এটা শুধু ঝাণ্ডাই নয়; এটা আমাদের রসূলের পবিত্র আত্মার স্মারক, যা আমাদের সঙ্গে আছে। ...

"তোমরা ধৈর্যধারণ করেছ, কষ্ট বরদাশত করেছ এবং এমন বীরত্বগাঁথা রচনা করেছ, যা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মদের দিক-নির্দেশনা দিতে আলোকবর্তিকা হবে। আমাদের আরও দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে, আর সেই দৃষ্টান্তই ইসলামকে জীবিত রাখবে।"

এ জাতীয় আরও কিছু কথা বলে হযরত খালিদ (রা.) পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে নির্দেশনা দান করেন। তিনি দুই বাহিনীর সালারদের বলেন, তারা যেন সামনের দু'টি এলাকা অধিকার করতে রওনা হন। একটি হলো সাখানা আর অপরটি হলো কদামা। হযরত খালিদ (রা.) তাদের বলেন যে, এক একটি সৈন্যদল দ্বারাই তাদের ঐ দু'টি বসতি করায়ত্ত করা চাই। গোয়েন্দা তথ্য অনুযায়ী বসতি দু'টি ছোট ছোট কেল্লা অথবা কেল্লা সদৃশ ইমারতের সমষ্টি ছিল।

"আরাকের বিজয় বসতিদ্বয়ের বিজয়কে কঠিন বানিয়ে ফেলেছে" হযরত খালিদ (রা.) সালারদের বলেন "আরাকের পরাজিত সৈন্যরা সেখানে পৌঁছে গেছে। ঈসায়ী এবং রোমীয়রা আরাক পরাজয়ের প্রতিশোধ অবশ্যই নিবে। তোমাদের কঠিন বাধার মুখোমুখী হতে হবে। কখনো পিছপা হবে না। আমি সাহায্য প্রস্তুত করে রাখব। আল্লাহ তা'আলা আমাদের এই ঘাঁটি প্রদান করেছেন। আমি তোমাদের সাহায্যে পৌঁছে যাব। আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে আছেন।"

হযরত খালিদ (রা.) সালার হযরত আবু উবায়দা ইবনুল যাররাহ (রা.)-এর নামে একটি পত্র লেখান এবং একজন দূতকে পত্রটি দিয়ে বলেন, ফজরের নামায পড়েই তুমি রওনা হয়ে যাবে এবং এ বার্তা আবু উবায়দাকে দিয়ে আসবে।

হযরত আবু উবায়দা (রা.) ঐ ২৮ হাজার মুজাহিদদের একাংশের সালার ছিলেন, যাদের আমীরুল মু'মিনীন হযরত আবু বকর (রা.) তৈরি করে সিরিয়া বিজয়ের জন্য পাঠিয়েছিলেন। ঐ সেনাদলকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছিল এবং প্রতিটি দল সিরিয়ার সীমান্ত এলাকায় একে অন্যের থেকে দূরে বিভিন্ন স্থানে পৌঁছে গিয়েছিল। সালার আবু উবায়দা (রা.) যাবিয়া অঞ্চলে ছিলেন। হযরত খালিদ (রা.) তাঁর বরাবর পত্র প্রেরণ করেন এই মর্মে যে, তিনি যেন সেখানেই থাকেন এখন যেখানে আছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত হযরত খালিদ (রা.)-এর পক্ষ হতে তাঁকে কোনো নির্দেশ না দেয়া হয় সে যেন কোনো পদক্ষেপ না নেয়।

"আর আমি তাদমুর যাচ্ছি" হযরত খালিদ (রা.) তাঁর সালারদের বলেন "তাদমুর একটি কেল্লার নাম। সেটা পদানত করা সহজ হবে না। এই জন্য সেটা জয় করার দায়িত্বে আমি নিজেই থাকব। ... আমার বন্ধুগণ! জানা নেই, জীবিত অবস্থায় একে অপরের সঙ্গে আমাদের আর সাক্ষাৎ হবে কিনা। মনে রাখবে, আমরা আল্লাহর দরবারে একত্রিত হলে না আল্লাহর সামনে লজ্জিত হব, না একে অপরের সামনে।"

✪

হযরত খালিদ (রা.) এর সঙ্গে যে মুজাহিদ বাহিনী ছিল তাদের সংখ্যা পুরো ৯ হাজার ছিল না। এই সৈন্যদেরকেই তিনি তিনভাগে ভাগ করেন। প্রত্যেক দলের দায়িত্ব ছিল এক একটি এলাকা বিজয় করা। হযরত খালিদ (রা.) স্বীয় বাহিনীকে এভাবে বিভক্ত করে মারাত্মক এক ঝুঁকি নিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর আল্লাহর সত্তা ও রসূলের ইকাবের (ঝাণ্ডার) উপর এত আস্থা ছিল যে, তিনি মারাত্মক চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও এ ঝুঁকি গ্রহণ করেন।

প্রভাত হতেই হযরত খালিদ (রা.) তাদমুর অভিমুখে রওনা হয়ে যান। দুই সালারও নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে সাখানা এবং কদামার উদ্দেশে রওনা হন।

হযরত খালিদ (রা.) তাদমুরে পৌঁছেই কেল্লা অবরোধ করে ফেলেন। এখানেও ঈসায়ীদের সৈন্য ছিল। হযরত খালিদ (রা.) নারাধ্বনি দিয়ে কেল্লার উপর চড়াও হন। তিনি বারবার ঘোষণা দেন যে, কেল্লাটি তাঁর হাতে সোপর্দ করা হোক। দেখা যায়, কেল্লার প্রতিরোধে লড়াইকারীদের মাঝে কোনো আন্তরিকতা ও প্রেরণা ছিল না।

কিছুক্ষণ না যেতেই কেল্লার দরজা খুলে যায় এবং ঈসায়ী নেতা বাইরে বেরিয়ে আসে। তারা হযরত খালিদ (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করে, তিনি কোন শর্তসাপেক্ষে সন্ধি করতে চান?

"কর আদায় করবে" হযরত খালিদ (রা.) বলেন "এবং এখান দিয়ে মুসলমানদের যে বাহিনী যাবে তাদের খাদ্য-পানীয়ের ব্যবস্থা তোমাদের জিম্মায় থাকবে। কেল্লার অভ্যন্তরে তাদের থাকার প্রয়োজন হলে তোমরা তাদের থাকার জন্য স্থান করে দিবে।"

"আপনাদের সৈন্যরা লুটতরাজ করবে না তো?" এক ঈসায়ী নেতা জানতে চায়।

"কর দানের বিনিময়ে তোমাদের ইজ্জত, তোমাদের জান-মালের হেফাজতের জিম্মাদারী আমাদের হবে" হযরত খালিদ (রা.) বলেন। "অন্য কোনো বাহিনী তোমাদের উপর হামলা করলে মুসলমানরা তোমাদের সাহায্যে পৌঁছে যাবে। তোমরা শুধু গাসসানী ও রোমীয়দের সঙ্গ দিবে না।"

"ইবনে ওলীদ!" এক নেতা বলে। "আমরা আপনার ব্যাপারে যেমন শুনেছি তেমনিই পেলাম। এখন থেকে আপনি আমাদেরকে বন্ধু হিসেবে পাবেন।"

ঈসায়ীদের সর্বোচ্চ নেতা হযরত খালিদ (রা.)-কে উন্নত জাতের একটি ঘোড়া উপহার হিসেবে প্রদান করে। ঘোড়াটি খুবই মূল্যবান ছিল।

এটা ছিল দ্বিতীয় কেল্লা, যা হযরত খালিদ (রা.)-এর পদতলে এসে লুটিয়ে পড়েছিল আর হযরত খালিদ (রা.) কৃতজ্ঞতা জানাতে আল্লাহর দরবারে সেজদাবনত হন।

✪

ওদিকে সাখানা এবং কদামায় একটি মোজেযা ঘটে যায়। উভয় বাহিনীর সালারদের মাঝে তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছিল। একটি আশংকা এই ছিল যে, তারা শত্রু দেশের বেশি গভীরে চলে যাচ্ছিল। দ্বিতীয় আশংকা ছিল, আরাক থেকে সৈন্যরা চলে গিয়েছিল। তাদের এই এলাকায় থাকা এবং সেখানকার লোকদের নিয়ে মোকাবেলা করতে আসা অনিবার্য ছিল। সবচেয়ে বড় আশংকা যা ছিল, তা হলো, উভয় সালারের কাছে মাত্র একটি করে বাহিনী ছিল।

উভয় বাহিনী প্রায় একই সময় নিজ নিজ গন্তব্যে পৌঁছে। উভয় সালার নিজে নিজে সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছিলেন যে, মোকাবেলা যদি বেশি সংখ্যক সৈন্যের সঙ্গে হয় তাহলে তারা একস্থানে থেকে লড়াই করবে না; বরং স্থান পরিবর্তন করে করে লড়বে এবং শত্রুদের বিক্ষিপ্ত হয়ে যেতে বাধ্য করবে। তারা এটাও চিন্তা করে রাখেন যে, কোনো অবস্থাতেই হযরত খালিদ (রা.)-এর কাছে সাহায্য চাইবেন না। কেননা, তিনিও এক কেল্লায় হামলা করতে গেছেন।

ঈমানী জযবা তাদের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় থাকার কারণে তারা স্বল্প সৈন্য নিয়েও শত্রুদেশের অভ্যন্তরে ঢুকে যায়। তারা স্বীয় জান-মাল আল্লাহর রাস্তার কুরবানী করে দিয়েছিল। নিজেদের স্ত্রী, পিতা-মাতা, ভাই-বোনের কথা ভুলে গিয়েছিল। তাদের মাথায় একটি কথাই ছিল, আর তা হলো, কুফরকে খতম করে আল্লাহর পয়গাম পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে। তাদের অন্তরে আল্লাহর নাম এবং নবীজীর প্রেম ছিল। যুদ্ধের ব্যাপারে তাদের মাঝে কোনো ভুল বুঝাবুঝি কিংবা দ্বিধা-সংশয় ছিল না। জিহাদ ছিল তাদের ইবাদত। তারা একমাত্র আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করত। বর্তমানে তারা এমন স্থানে এবং এমন অবস্থায় গিয়ে পৌঁছেছে যে, সেখানে একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই ছিলেন তাদের রক্ষাকারী।

এক সালার সাখানার কাছাকছি ও অপর সালার কদামার কাছাকাছি পৌঁছলে উভয় স্থানে একই দৃশ্য চিত্রিত হয়। সেখানে লোকেরা বাইরে বেরিয়ে আসে। ক্রমেই তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। সালাররা এই দৃশ্য দেখে তাদের বাহিনী দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে দেন। তাদের এভাবে বেরিয়ে আসাকে সালারগণ প্রতারণা বলে মনে করেন। তারা অস্ত্রসজ্জিত ছিল না। তাদের মহিলা এবং বাচ্চারাও বেরিয়ে এসেছিল। সকলে হাত উপরে তুলে নাড়াচ্ছিল।

সালারদ্বয় সৈন্যদের অবরোধের মত ছড়িয়ে দেন। তাদের দৃষ্টি ঐ স্থানে নিবদ্ধ ছিল, যা দেখতে ছোট ছোট কেল্লার মত ছিল। সালারদের আশংকা হচ্ছিল যে, তারা সামনে অগ্রসর হলে কেল্লাসদৃশ স্থান থেকে তাদের উপর তীরবর্ষণ করা হবে।

এই ভেবে সালারদ্বয় থেমে থেমে অগ্রসর হচ্ছিলেন। উভয় বসতির লোকজন ছিল আরব ঈসায়ীরা। তাদের মধ্য হতে ৪/৫ জন সাদা দাড়ি বিশিষ্ট মুরুব্বী পর্যায়ের লোক অগ্রসর হয়। কাছে এসে তারা অভ্যর্থনা জানানোর মত নিজেদের হাত প্রসারিত করে।

"আমরা আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি" সাদা দাঁড়িওয়ালা এক ঈসায়ী বলে "আসুন ... বন্ধুদের মত আসুন। আমরা আপনাদের নিরাপত্তা দিচ্ছি।"

"আর যদি আমাদের প্রতি একটি তীরও নিক্ষিপ্ত হয় তাহলে এই বসতির ধ্বংস অনিবার্য মনে করবে" সালার বলেন।

"বাড়ী-ঘরের দরজা খোলা" বয়োবৃদ্ধ ঈসায়ী বলে "বসতির একটি বাচ্চাও ভেতরে নেই। দেখুন, কারো হাতে ধনুক নেই, নেই বর্শা ও তলোয়ার।"

"আরাক থেকে যেসব সৈন্য এসেছে তারা কোথায়?" সালার জিজ্ঞাসা করে।

"কিছু আছে, কিছু চলে গেছে" এক বয়স্ক ঈসায়ী বলে "তারাই আমাদের জানিয়েছে যে, আপনাদের সৈন্যরা লুটপাট করে না। যুবতী ও কুমারী নারীদের প্রতি হাত তোলে না। আর আপনারা এমন শর্তে মিত্রতা স্থাপন করেন, যা বহন করা কারো উপর ভারী হয় না।"

"আর যে আমাদের শর্ত কবুল করে না তার পরিণাম অন্য কিছু হয়" সালার বলেন।

"হে মদীনার সালার!" ঈসায়ী নেতা বলে "বলুন, আপনাদের শর্ত কী?"

"তাই যা তোমাদের পিঠ বহন করতে পারবে এবং কোমর ভাঙ্গবেনা" সালার বলেন "কর। ... আমরা নিজেরাই একথা লিখব, যে ব্যক্তি কর আদায়ে সক্ষম নয় তার থেকে কিছু নেয়া হবে না।"

"আর কিছু?"

"মুসলমানদের সৈন্যবাহিনী অথবা কোনো কাফেলা যদি এ পথ দিয়ে যায়, তাহলে এই বসতিওয়ালাদের দায়িত্ব হবে, যেন তাদের উপর হামলা না করা হয়" সালার বলেন "যদি তারা এখানে অবস্থান করতে চায়, তাহলে তাদের প্রাণীদের দানা-পানির ব্যবস্থা করা বসতিওয়ালাদের যিম্মাদারী হবে। তাদের এমন কোনো প্রয়োজন যদি দেখা দেয়, যা বহন করা তোমাদের সামর্থ্যের বাইরে নয়, তা তোমরা বহন করবে। আমাদের কোনো সৈন্য বসতির কোনো ঘরে প্রবেশ করবে না। তোমাদের ইজ্জত ও জান-মালের নিরাপত্তার দায়িত্ব আমাদের থাকবে। রোমীয়, গাসসানী কিংবা পারসিকদের পক্ষ হতে তোমাদের প্রতি কোনো ধমক এলে কিংবা তোমাদের উপর তারা হামলা করলে তার জবাব আমরা দিব।"

উভয় বসতিতে একই ঘটনা ঘটে। সে যুগে সৈন্যদের মাঝে এই প্রথা চালু ছিল, কোনো বসতি অধিকার করলে সেখানে ব্যাপক লুটতরাজ করা হত। কোনো মহিলা তাদের হাত থেকে রেহাই পেতনা। যে এলাকা তাদের সামনে মাথা নত করত তাদের সঙ্গে বিজয়ী ফৌজ আরও জঘন্য আচরণ করত। কিন্তু এই দৃষ্টান্ত মুসলমানরা কায়েম করে, যে বন্ধুত্বের হাত বাড়ায় তাকে নিজের আশ্রয়ে নিয়ে নেয় এবং তার ইজ্জত হেফাজত করাকে নিজেদের কর্তব্য মনে করে। এরই প্রভাবে কাফের বসতিগুলো মুসলমানদের সঙ্গে বন্ধুত্বের চুক্তিতে আবদ্ধ হচ্ছিল।

হযরত খালিদ (রা.) যখন জানতে পারেন যে, সাখানা এবং কদামার অধিবাসীরা আনুগত্য মেনে নিয়েছে। তখন তিনি সেখানকার প্রশাসক নিযুক্ত করে উভয় দলকে নিজের কাছে ডেকে নেন।

হযরত খালিদ (রা.) সামনে আগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেন। সামনে করয়াতাইন এলাকা ছিল। সেখানকার অধিবাসী অন্য স্থানের তুলনায় বেশি ছিল। হযরত খালিদ (রা.) এলাকার কাছাকাছি পৌঁছে সৈন্যদের থামিয়ে দেন এবং দুই সহঅধিনায়ককে বলেন যে, তারা যেন বসতিতে গিয়ে সন্ধি এবং চুক্তির কথা বলে। সহ অধিনায়কদ্বয় তখনও স্থান ছেড়ে যায়নি ইতোমধ্যে বসতির ডান-বাম থেকে মুসলমানদের উপর হামলা হয়।

এই হামলা যদিও অনাকাঙ্ক্ষিত ছিল না তবে অবশ্যই আকস্মিক ছিল। হযরত খালিদ (রা.) সৈন্যদের একত্রিত নয়; বরং যুদ্ধবিন্যাসেই রেখেছিলেন। কেননা, তারা শত্রুর রাজত্বে ছিলেন। তিনি এক দু'টি দল পেছনে রেখে এসেছিলেন। হামলা শুরু হতেই হযরত খালিদ (রা.) পশ্চাৎ বাহিনীকে সামনে পাঠিয়ে দেন।

হামলাকারীদের মধ্যে বসতির লোক ছিল বেশি। কিছু সংখ্যক ছিল নিয়মিত সৈন্য। এই সৈন্যরা আরাক এবং তাদমুর থেকে এসেছিল। সবাই মিলে লোকসংখ্যা যদিও বেশি ছিল কিন্তু তাদের লড়াইয়ের ধরন ছিল স্বতন্ত্র। এটা নিয়মিত সৈন্যদের ধরন ছিল না। হযরত খালিদ (রা.)-এর যুদ্ধচালের সামনে বড় বড় অভিজ্ঞ সালাররাও টিকতে পারতনা। ফলে অল্প সময়ে মুজাহিদরা হামলাকারীদের এত চাপিয়ে আনে যে, তাদের জন্য পালানোও অসম্ভব হয়ে যায়।

যেহেতু এটা যুদ্ধ ছিল এবং মুসলমানদের উপর নিয়মিত হামলা করা হয়েছিল তাই হযরত খালিদ (রা.) সমররীতি অনুযায়ী নির্দেশ প্রদান করেন। মুসলমানরা বসতির উপর হামলা করে এবং গনীমতের মাল সংগ্রহ করে। অনেককে বন্দীও করে এবং সামনে অগ্রসর হয়। এবার হযরত খালিদ (রা.) পূর্বের চেয়ে বেশি সতর্ক ছিলেন। যতই তারা সামনে যাচ্ছিলেন শত্রুর সঙ্গে বেশি বেশি দেখা হচ্ছিল।

বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে নয় মাইলের মত সামনে আগ্রর হলে মুজাহিদরা দেখে যে, একস্থানে অসংখ্য পশু-প্রাণী বিচরণ করছে। হযরত খালিদ (রা.) প্রাণীগুলো করায়ত্ত করার নির্দেশ দেন। এটা ছিল হাওয়ারীনদের এলাকা। মুজাহিদরা প্রাণী ধরা শুরু করলে হাজার হাজার মানুষ তাদের উপর আক্রমণ করে। আক্রমণকারীরা সবাই ছিল ঈসায়ী। আল্লাহ জানে, গাসসানীদের বেশ বড় একটি দল তাদের সাহায্য করতে কোথা থেকে যেন চলে আসে। আক্রমণ ছিল প্রচণ্ড। হামলাকারীরা অমিততেজে লড়ছিল। তাদের একটিই শ্লোগান ছিল– "মুসলমানদের কেটে ফেল ... একজনও যেন জীবন নিয়ে পালাতে না পারে।"

হযরত খালিদ (রা.)-এর প্রতুৎপন্নমতিত্ব, উপস্থিত বিচক্ষণতা এবং মুজাহিদদের দৃঢ়তা তাদের এ যুদ্ধেও বিজয়ী করে। কিন্তু মুজাহিদদের শরীরে কিছুটা শক্তিসামর্থ্য যা ফিরেছিল এ যুদ্ধে তা নিঃশেষ হয়ে যায়।

কোনো ইতিহাসে মুজাহিদদের শহীদ ও আহতদের সংখ্যা পাওয়া যায় না। তাদের উপর যে হামলা হয়েছিল, তাতে নিঃসন্দেহে কিছু মুজাহিদ শহীদ হয়েছিল। কিছু মারাত্মক আহত হয়ে সারাজীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে যায়। শহীদদের সংখ্যা শত্রুদের তুলনায় কম হতে পারে। এটা বলা যে, একজনও শহীদ হয়নি–ঠিক নয়। এভাবে মুজাহিদদের সংখ্যা দ্রুতই কম হতে থাকে এবং সাহায্যের কোনো আশা ছিল না। তারপরও মুজাহিদরা বাঁধ ভাঙ্গা ঢলের মত এগিয়ে যাচ্ছিল।

✪

হযরত খালিদ (রা.) শিকলবিশিষ্ট ঐ শিরস্ত্রাণ, যার উপরে তিনি লাল পাগড়ী বাঁধতেন– শুধু রাতেই মাথা হতে খুলতেন। রাতে সৈন্যরা বিশ্রাম নিতে থাকলে হযরত খালিদ (রা.) মুজাহিদদের মাঝে ঘোরাফেরা করতেন। তার মুচকি হাসিতে জাদুর মত প্রভাব ছিল। তা মুজাহিদদের মনোবল এবং জযবা চাঙ্গা করত।

হাওয়ারীনের লোকদের পরাজিত করে হযরত খালিদ (রা.) সেখানে মাত্র একরাত অবস্থান করেন এবং সকালেই দামেস্ক অভিমুখে রওনা হয়ে যান।

সিরিয়া এবং লেবাননের মাঝে পাহাড়ের একটি দীর্ঘ সারি ছিল। এর একটি অংশ সিরিয়ার অভ্যন্তরে ছিল। দামেস্ক হতে প্রায় ২০ মাইল দূরে দুই হাজার ফুট উচুঁতে একটি গিরিপথ ছিল, তার নাম ছিল 'ছানিয়াতুল ইকাব।' হযরত খালিদ (রা.) এই নাম দিয়েছিলেন। দামেস্ক পানে রওনা হওয়ার সময় হযরত খালিদ (রা.)-এর বাহিনী প্রায় এক ঘণ্টার জন্য এখানে অবস্থান করে এবং হযরত খালিদ (রা.) তাঁর ঝাণ্ডা 'ইকাব' এখানে স্থাপন করেছিলেন।

ঐতিহাসিকগণ লিখেন, হযরত খালিদ (রা.) এখানে অবস্থান করে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত দামেস্কপানে চেয়ে থাকেন। তার দৃষ্টি সীমানায় সবুজ-শ্যামল এলাকা ছিল। মরুভূমির এই মুজাহিদ সবুজ-শ্যামল এত বিশাল এলাকা দেখে বিস্ময় প্রকাশ করছিলেন।

দামেস্ক হতে ১১ কি ১২ মাইল দূরে 'মারজে রাহেত' নামে একটি শহর ছিল। এখানকার সকল অধিবাসী ছিল গাসসানী। তাদের রাজধানী বসরায় এই খবর পৌঁছেছিল যে, মুসলমানরা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছে আর ঈসায়ীরা অসহায়ভাবে তাদের সামনে অস্ত্র সমর্পণ করছে।

গাসসানী বাদশা জাবালা রাগে ফেটে পড়ে। পারস্যদের মত সে-ও বারবার বলছিল যে, এই হীন মুসলমানদের কীভাবে সাহস হলো তার রাজত্বের এলাকায় প্রবেশ করার। সে তার গোয়েন্দা পাঠিয়ে জেনে নেয় যে, মুসলমানরা কোন দিক থেকে আসছে এবং তাদের সৈন্যসংখ্যা কত? সে সর্বশেষ এই তথ্য পায় যে, হযরত খালিদ (রা.) দামেস্ক হতে কিছু দূরে রয়েছেন। তিনি মারজে রাহেত হয়ে দামেস্ক পৌঁছবেন।

"মারজে রাহেত!" জাবালা গাসসানী বলে এবং চিন্তায় পড়ে যায় এরপর উত্তেজিত হয়ে বলে "মারজে রাহেত ... সে সময়ে সেখানে মেলা বসে না?"

"মেলা শুরু হয়েছে" কেউ জবাবে বলে।

জাবালা তখনই তার সালারদের ডেকে পাঠায়। সালাররা এলে তাদের কিছু দিক-নির্দেশনা দেয় এবং বলে যে, এ নির্দেশনা যেন এখন থেকেই কার্যকর করা হয়। এটা ছিল একটি জাল, যা জাবালা খালিদ বাহিনীর উদ্দেশে মারজে রাহেতের মেলায় পেতেছিল।

"তারা ঈসায়ী ছিল যারা মুসলমানদের সামনে মাটিতে হাঁটু লাগিয়েছে" জাবালা বলে। "মুসলমানরা এই ভেবে খুশি মনে আসছে যে, তাদের পথিমধ্যে যারাই আসবে, তারা আনুগত্য কবুল করবে। রোমীয়দেরকে গাসসানীরা ছেড়ে কথা কয় না তারা আরব বদ্দুদের আনুগত্য মেনে নেবে! আমরা মারজে রাহেতেই তাদের নিঃশেষ করে দিব।"

হযরত খালিদ (রা.) মারজে রাহেতের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলেন। মেলার অনুষ্ঠান তাদের নজরে পড়ছিল। অনেক বড় মেলা ছিল। এটা গাসসানীদের কোনো আনন্দানুষ্ঠান ছিল। হাজার হাজার মানুষ সমবেত ছিল। খেলাধুলা হচ্ছিল। ঘোড়াদৌড় এবং উটের দৌড়ও চলছিল। কোথাও নাচ হচ্ছিল কোথাও গান চলছিল। একটি বিস্তৃত ময়দান ছিল, যা ছিল লোকে পরিপূর্ণ। মানুষের সংখ্যা ২০ হাজারের মত ছিল।

হযরত খালিদ (রা.)-এর সৈন্যরা যখন মেলার আরো কাছে আসে তখন আনন্দানুষ্ঠানের লোকেরা দেখতে দেখতে সৈন্যরূপ ধারণ করে যুদ্ধ-বিন্যাসে চলে আসে। অশ্বারোহীরা এক প্লাটুন সৈন্য হয়ে যায়। প্রত্যেক লোক তলোয়ার বা বর্শা দ্বারা সুসজ্জিত ছিল। মহিলা এবং বাচ্চারা দৌড়ে বসতিতে চলে যায়। ভীড় করে থাকা লোকজন যারা সৈন্যের রূপ পরিগ্রহ করেছিল এভাবে ডানে-বামে ছড়িয়ে পড়তে থাকে যেন তারা মুজাহিদ বাহিনীকে ঘেরাওয়ের আওতায় আনতে চায়।

মুজাহিদ বাহিনী তাদের পশ্চাৎ হতে ঘোড়সওয়ারদের দৌঁড়ে আসতে শুনতে পায়। সেদিকে তাকালে দেখা যায় গাসসানীদের একটি অশ্বারোহী দল তলোয়ার বর্শা উঁচিয়ে তুফানের মত ধেয়ে আসছে। এটাই ছিল সেই জাল যা জাবালা বিন আইহাম হযরত খালিদ (রা.)-এর জন্য বিছিয়ে রেখেছিল। তাদের সংখ্যা ছিল মুসলমানদের তিনগুণ। মুজাহিদরা ক্লান্তও ছিল। পাঁচ দিন তারা মরুভূমির সফরের পর বিরামহীন অগ্রযাত্রা এবং যুদ্ধ করে আসছিল।

গাসসানী বাদশা ঠিকই চিন্তা করেছিল যে, মুসলমানরা নিশ্চয় সফরের বিন্যাসে আসছে। তাদের যুদ্ধ বিন্যাসে বিন্যস্ত হতে কিছুটা সময় লাগবে। এ সময়ের মাঝে তাদের উপর এমনভাবে হামলা করা হবে যে, যাতে তারা সামলানোর সুযোগ না পায়। সে মুসলমানদের সংখ্যার স্বল্পতার বিষয়টিও নজরে রেখেছিল এবং এই বিশ্বাস রেখেছিল, মুসলমানরা মেলায় উপস্থিত লোকদের মেলার সাধারণ লোক মনে করে অপ্রস্তুত থাকবে।

গাসসানীদের জানা ছিল না যে, হযরত খালিদ (রা.) একজন অভিজ্ঞ সেনাপতি ছিলেন। আকস্মিক আক্রমণের অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল। তাঁর এই অনুভূতি পুরো মাত্রায় ছিল যে, তিনি যতই শত্রুদেশের অভ্যন্তরে ঢুকছেন হামলা এবং গেরিলা আক্রমণের আশংকা তত বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এই জন্য তিনি সৈন্যদের এমনভাবে বিন্যস্ত করে রাখেন, যেন তাদের প্রতি হঠাৎ আক্রমণ হলেও তারা হামলার মোকাবেলা করতে পারে।

মুসলমানদের পশ্চাৎ হতে গাসসানীদের যে অশ্বারোহী বাহিনী তুফানের মত ধেয়ে আসছিল তা মুসলমানদের কুপোকাত করার জন্য যথেষ্ট ছিল। হযরত খালিদ (রা.)-এর দৃষ্টি ঐ অশ্বারোহী দলটির প্রতি নিবদ্ধ ছিল আর তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ শান্ত ও স্থির। পরিস্থিতির চাপে মুসলিম বাহিনী সংকুচিত হয়ে যায়। এ সময় হযরত খালিদ (রা.) উচ্চ আওয়াজে নারাধ্বনি দেন, মুজাহিদরা বজ্রধ্বনির মত তার জবাব দেয়। এর সাথে সাথে তিনি উচ্চ আওয়াজে কিছু নির্দেশনাও দান করেন।

"খোদার কসম! আমরা এ ধাক্কা অচিরেই সামলে নিব" হযরত খালিদ (রা.) অত্যন্ত উঁচু আওয়াজে বলেন "আল্লাহর নামে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে অস্ত্র ধর।"

গাসসানীদের অশ্বারোহী বাহিনীটি খুবই দ্রুতগতিতে নিকটে আসছিল। তাদের পশ্চাৎ এবং ডান দিক হতে আরেকটি অশ্বারোহী দলের আবির্ভাব হয়। অনেক ঘোড়া একত্রে পাল্লা দিয়ে দৌঁড়ে ছুটে আসছিল। তাদের মুখ ছিল গাসসানী অশ্বারোহী ইউনিটের দিকে।

"পেছনে তাকিয়ে দেখ" এক গাসসানী অশ্বারোহী চিৎকার করে বলে। "এরা মুসলমান অশ্বারোহী মনে হচ্ছে।"

পশ্চাৎ হতে আগত অশ্বারোহী ইউনিট মুসলমানদেরই ছিল। এরা ছিল মুসলমানদের পেছনের অংশ। এই অশ্বারোহীরা গাসসানী অশ্বারোহীদের ঘেরাও করে ফেলেছিল। গাসসানীরা এভাবে পশ্চাৎ হামলার জন্য প্রস্তুত ছিল না। তাই তাঁদের বাহিনী ছত্রভঙ্গ হতে হতে থেমে যায়। এদিকে হযরত খালিদ (রা.) তার সঙ্গে থাকা বাহিনীকে আক্রমণের নির্দেশ দেন। এতে গাসসানীরা ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে সংকুচিত হতে থাকে। পরে তারা এমনভাবে সংকুচিত হয় যে, তাদের ঘোড়া ডানে-বামে বা আগে-পিছে যাবার জায়গা পায় না।

এর পাশাপাশি হযরত খালিদ (রা.) উষ্ট্রারোহী তীরন্দায মুসলিম বাহিনীকে মেলায় ছদ্মাবরণে আসা সৈন্যদের প্রতি তীর ছোঁড়ার নির্দেশ দেন। আরেক দলকে শত্রুপক্ষের পার্শ্ব বাহিনীর উপর হামলা করার জন্য পাঠান। তারা গাসসানীদের সম্মুখ দলের উপর প্রচণ্ড হামলা চালায়।

এটা ছিল মেধা ও জযবার লড়াই। গাসসানী পদাতিক সৈন্যদের ভরসা ছিল অশ্বারোহী দলটির উপর, যারা তখন মুসলিম অশ্বারোহীদের তলোয়ারে কচুকাটা হচ্ছিল অথবা প্রাণ বাঁচাতে পালিয়ে যাচ্ছিল।

হয়রত খালিদ (রা.)-এর চেষ্টা ছিল, দুশমনদের পশ্চাতে যাওয়া। যাতে শত্রুরা পালিয়ে শহরে না যেতে পারে। হযরত খালিদ (রা.)-এর নির্দেশে গাসসানীদের তাঁবুতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। তাঁবুগুলো মেলার জন্য স্থাপিত ছিল। অগ্নিশিখা গাসসানীদের কলজে কাঁপিয়ে দেয়। এটা দেখে তাদের মনোবল সম্পূর্ণ ভেঙ্গে যায় যে, তারা মুসলমানদের জন্য যে জাল পেতেছিল তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে গেছে। বরং উল্টো মুসলমানদের জালে তারাই জড়িয়ে পড়েছে। গাসসানীদের পা নড়বড়ে হতে থাকে। তাদের প্রাণহানি এত বেশি পরিমাণ হয় যে, নিজেদের রক্ত দেখে তারা নিজেরাই ভীত হয়ে পড়ে। পরিশেষে উপায় না দেখে তারা পালাতে শুরু করে। হযরত খালিদ (রা.) বারবার এ ঘোষণা করাচ্ছিলেন যে, তোমাদের শহর বাঁচাতে চাইলে কেউ শহরে যাবে না, সকলে শহরের বাইরে থাক।

সন্ধ্যা পর্যন্ত হযরত খালিদ (রা.) ঐ শহর হতে মালে গনীমত এবং অনেক কয়েদী জমা করে ফেলেছিলেন। শহরে সেসব মহিলাদের কান্নার রোল উঠেছিল, যুদ্ধে যাদের স্বামী, ভাই, পিতা এবং পুত্র নিহত হয়েছিল।

হযরত খালিদ (রা.) রাতে হযরত আবু উবায়দা ইবনুল যাররাহ (রা.)- এর প্রতি এই মর্মে পত্র লিখে পাঠান যে, তিনি যেন বসরার নিকবর্তী এলাকায় হযরত খালিদ (রা.)-এর সাথে এসে মিলিত হন। বসরা ছিল গাসসানীদের রাজধানী। গাসসানী এবং রোমীয়রা সম্মিলিতভাবে বসরার প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিশ্চিত করছিল। মুজাহিদদের আরেকটি বড় পরীক্ষা এখনও বাকী ছিল।

✪

যারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তা'আলা প্রেরিত রাসূল হিসেবে মানেনা এবং আল্লাহ তা'আলাকে এক ও শরীকহীন মনে করে, তারা এখনও পর্যন্ত সমরশক্তিকে সংখ্যার কম-বেশি এবং অস্ত্রের উন্নতা ও অনুন্নতা দ্বারা পরিমাপ করছিল। তারা এ প্রশ্নের কোনো সদুত্তর পাচ্ছিল না যে, মুসলমানরা কীভাবে এবং কোন্ শক্তি বলে লাগাতার বিজয় অর্জন করছে। কিন্তু স্বীয় বাহিনী এবং ঘোড়ার আধিক্য ও উন্নততর অস্ত্রের কারণে তাদের এমন দম্ভ ছিল যে, তারা ভাবতেই পারে না, মানুষের মাঝে অন্য কোনো শক্তিও থাকতে পারে।" আর সে শক্তি হলো আকীদা ও মাযহাবের সত্যতা। গাসসানী বাদশা জাবাল বিন আইহাম বসরায় অত্যন্ত অধৈর্যের সঙ্গে এই খবরের অপেক্ষায় ছিল যে, মারজে রাহেতে তার ধোঁকা সফল হয়েছে এবং মুসলমানরা গাজর-মূলার মত কাটা পড়েছে। সে ধরেই নিয়েছিল যে, মুসলমানরা পরাজিত হয়েছে। শেষ তথ্য হিসেবে সে জেনেছিল যে, মুসলমানদের জন্য মেলারূপে ফাঁদ তৈরি করা হয়েছে এবং মুসলমানেরা অতি দ্রুত সে ফাঁদের দিকে ছুটে আসছে।

জাবালার ধরন-প্রকৃতিই বদলে গিয়েছিল। গত রাতে সে তার মহলে আনন্দ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। সে অনুষ্ঠানে মদের অসংখ্য বোতল খালি হয়েছিল। জাবালা বিন আইহাম মদে সন্তরণ করে নেশায় উড্ডীন যুবক হয়ে গিয়েছিল। তার আচরণ বার্ধক্যকে উপহাস করছিল। সে এটা দেখেছিল না যে, হেরেমের যুবতী মেয়েরা তার যৌনলুপ্ততায় ভেংচি কাটছিল এবং তাদের মধ্য হতে কেউ কেউ কয়েদখানা হতে বের হয়ে পছন্দের পুরুষ বাছাই করে নিয়ে মহলের বাগিচায় অদৃশ্য হয়ে যায়।

স্বয়ং জাবালার নেশার ঘোর এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, উক্ত অনুষ্ঠানে এক সুন্দরী ও যুবতী নারী তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করতে গেলে সে ঐ মেয়েটিকে ধরে ফেলে এবং তাকে নিজের বাহুতে বেষ্টন করে তার সঙ্গে দুর্বল যৌনাচার করছিল। মেয়েটি তার হাত থেকে উদ্ধার পেতে ছটফট করছিল।

"তোমার এত দুঃসাহস?" জাবালা মেয়েটিকে তার বেষ্টনী থেকে পৃথক করে এক টানে সামনে এনে দাঁড় করায় এবং কঠিন রাগের সঙ্গে বলে "এমন কোন নারী আছে যে আমার শরীর অপছন্দ করতে পারে?"

"তোমার ভাগিনী!" মেয়েটি কাঁদ কাঁদ কণ্ঠে চিৎকার করে বলে "তোমার বোনের মেয়ে।"

জাবলা বিন আইহাম এ কথা শুনে জোরে হেসে ওঠে।

"বিজয়ের খুশির নেশা শরাবের নেশা থেকেও ঝাঁঝালো হয়" জাবালা বলে। তার স্বর কাঁপছিল "কাল যখন আমার নিকট সংবাদ আসবে যে, মুসলমানরা পরাস্ত হয়েছে এবং তাদের কেউ প্রাণ নিয়ে পালাতে পারেনি, তখন আমার অবস্থা আরও খারাপ হয়ে যাবে।"

তার ভাগিনী কাঁদতে কাঁদতে অনুষ্ঠানস্থল থেকে বেরিয়ে যায়।

এক পর্যায়ে ঐ ক্ষণ এসে যায় যখন জাবালা মুসলমানদের উপর নিজের বিজয়ের খবর শোনার জন্য মুখিয়ে ছিল। সে পায়চারী করছিল আর মনে মনে ভাবছিল, এতক্ষণ খবর পৌঁছে যাবার কথা ছিল। এক সময় সে পায়চারি ছেড়ে বাগানে গিয়ে বসে। এক মধ্য বয়স্কা চাকরানী তশতরীতে মদের পাত্র এবং পেয়ালা নিয়ে তার দিকে যাচ্ছিল। ওদিক দিয়ে দারোয়ান দ্রুতগতিতে তার কাছে এসে পৌঁছে।

"কেউ এসেছে কী?" জাবালা অস্থির হয়ে দারোয়ানের কাছে জানতে চায় "কেউ মারজে রাহেত থেকে এসেছে?"

"দূত এসেছে" দারোয়ান থমথমে গলায় বলে। "সে আহত।"

"তাকে পাঠাও" জাবালা সোৎসাহে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলে "দূত বিজয়ের খবর এনেছে। তাকে জলদি আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।"

চাকরানী তশতরী হাতে তার নিকটে দাঁড়িয়ে ছিল। ওদিক থেকে এক আহত ব্যক্তি আসছিল।

"বল, তুমি বিজয়ের সুসংবাদ এনেছ" জাবালা বিন আইহাম বলে। আহত দূত কিছুই বলে না। সে নিকটে আসে। তার পোশাক রক্তে রঞ্জিত ছিল। তার মাথা ছিল পট্টি বাঁধা।

"তুমি কি আহত হওয়ায় কথা বলতে পারছ না?" জাবালা বড় গলায় জিজ্ঞাসা করে।

"বলতে পারি" দূত বলে। "কিন্তু যে খবর এনেছি তা নিজ মুখে আপনাকে শোনানোর সাহস নেই আমার।"

"কী বলছ?" জাবালার আওয়াজ ক্ষীণ হয়ে আসে "মুসলমানরা কি পাতা ফাঁদে পা দেয়নি? ... পা দিয়ে বেরিয়ে গেছে?"

"হাঁ!" দূত পরাজিত কণ্ঠে বলে "তারা বেরিয়ে গেছে।... তারা এমন জাল পেতেছিল যে, উল্টো আমরা তাদের ফাঁদে পড়েছিলাম।... আমাদের বাহিনী শেষ হয়ে গেছে। মারজে রাহেত তারা লুটে নিয়েছে।"

জালাবা বিন আইহাম তশতরী হতে সূরাপাত্র উঠায়। চাকরানী তাতে মদ ঢেলে দেয়ার জন্য মদের পেয়ালা নিয়ে সামনে এগিয়ে যায়। জাবালা সূরাপাত্র তুলে তীব্রবেগে তা দূতের দিকে ছুঁড়ে মারে। দূত নিকটেই দাঁড়িয়ে ছিল। সূরাপাত্র তার মাথায় গিয়ে আঘাত করে। দূত চক্কর খেয়ে পড়ে যায়। জাবালা চাকরানীর হাত থেকে মদের পেয়ালা কেড়ে নিয়ে তার মুখে ছুঁড়ে মারে এবং লম্বা লম্বা পা ফেলে হনহন করে সেখান থেকে চলে যায়।

গাসসানী বাদশার মহল জুড়ে মাতম শুরু হয়। মারজে রাহেতের পলায়নপর গাসসানী সৈন্য বসরায় আসতে থাকে এবং বসরা মাতমের শহরে পরিণত হয়। আসল মাতম তাদের বাড়ী-ঘরে চলছিল, যাদের পুত্র, ভাই এবং পিতা ঐ ফাঁদের শিকার হয়ে মারা গিয়েছিল, যা হযরত খালিদ (রা.)-এর মুজাহিদ বাহিনীর জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছিল।

এই মাতমের সঙ্গে সঙ্গে এক চাঁপা ভীতিও এসেছিল। এই চাঁপা ভীতি তাদের প্রত্যেক ঘরে ঘরে পৌঁছে গিয়েছিল।

"তাদের তীর বিষ মিশ্রিত হয়। সেই তীর কারো সামান্য লাগলেই সে মারা যায়।"

"তাদের ঘোড়া ডানাবিশিষ্ট। বাতাসের সঙ্গে কথাবার্তা বলে।"

"এই মুসলমানদের রসূল যাদুকর ছিল। এসব তারই জাদুর ফসল।"

"তাদের সামনে লাখ লাখ সৈন্যও দাঁড়াতে পারে না।"

"শুনেছি তারা বড়ই নরম দিলওয়ালা। যারা তাদের সামনে আত্মসমর্পণ করে তাদেরকে বুকে টেনে নেয়।"

"যে শহরে তাদের যুদ্ধ হয়, সে শহরের প্রতিটি ইট পর্যন্ত তারা খুলে নেয়।"

"কাউকে জিন্দা ছাড়ে না। যোদ্ধাদের ধরে নিয়ে যায়।"

থমথমে কণ্ঠের এমন আওয়াজও শোনা যায় "তাদের ধর্ম সঠিক বলে মনে হয়। তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে মানে। এটাই তাদের শক্তি। জ্বিনদের দ্বারাও লড়াই করে।"

এ ধরনের অনেক মন্তব্য চলছিল সারা শহরে। যা স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, তারা মুসলমানদের ভয়ে দারুণ ভীত ছিল। আর সে ভীতি ব্যাপকভাবে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল।

"তোমরা বসরাকেও বাঁচাতে পারবে না।" জাবালা বিন আইহাম প্রতাপমাখা কণ্ঠে তার সালারদের উদ্দেশে বলছিল "তোমাদের কাপুরুষতা দেখে আমি রোমীয়দের সাহায্যের জন্য ডেকেছি। তোমরা মুসলমানদের পরাজিত করতে পারলে আমি রোমীয়দের বুকের উপর লাফ দিতাম। তাদের উপর আমার প্রতাপ বসে যেত। কিন্তু তোমরা আমার নাম ডুবিয়ে দিয়েছ। ফলে আমি বাধ্য হয়ে আমার রাজ্য হেফাজত করতে রোমীয়দের সাহায্য প্রার্থনা করেছি।

জাবালা এভাবে তার সালারদের ধমকাচ্ছিল, ইত্যবসরে খবর আসে যে, মুসলমানদের একটি দল বসরা পানে ছুটে আসছে।

"এত জলদি?" জাবালা ঘাবড়ানো কণ্ঠে বলে "মারজে রাহেত থেকে তারা এত তাড়াতাড়ি বসরা পর্যন্ত কীভাবে এল? রোমীয় সালারকে বিষয়টি জানাও।"

হযরত খালিদ (রা.)-এর সফলতার সংবাদ শুনে জাবালা বিন আইহামের সাহায্যে যে রোমীয় সৈন্য এসেছিল তারা বসরার বাইরে শিবির স্থাপন করে অবস্থান করছিল। রোমীয়দের সালার মুসলমানদের আগমনের খবর শুনে সৈন্যদেরকে প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দেয়। এই বাহিনীতে আরব ঈসায়ীরাও ছিল।

যে বাহিনী বসরার উদ্দেশে ধেয়ে আসছিল তা হযরত খালিদ (রা.)-এর বাহিনী ছিল না। তারা ছিল অপর এক মুসলিম সালার শুরাহবীল বিন হাসানা (রা.)-এর সৈন্য। যাদের সংখ্যা ছিল চার হাজার। যে মুসলিম বাহিনীকে সিরিয়া বিজয় করার জন্য পাঠানো হয়েছিল তারা ছিলেন তাদের অংশবিশেষ। খলীফাতুল মুসলিমীন এর নির্দেশনা অনুযায়ী সালার হযরত আবু উবায়দা (রা.) সৈন্যদের অন্য অংশকেও একত্রিত করে নিজের কমান্ডের অধীনে নিয়ে নিয়েছিলেন।

বসরায় হযরত শুরাহবীল (রা.)-এর আক্রমণের পটভূমি এই ছিল যে, খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত আবু উবায়দা (রা.) বরাবর একটি পত্র লিখেছিলেন ঃ

"আমি খালিদকে এই দায়িত্ব দিয়েছি যে, সে রোমীয়দের উপর আক্রমণ করবে। তোমার দায়িত্ব হলো তার আনুগত্য করা। কোনো কাজ তার নির্দেশের বিপরীত করবে না। আমি তাকে তোমার আমীর নিযুক্ত করেছি। আমার ভাল করে জানা আছে যে, দ্বীনী ব্যাপারে তুমি খালিদ হতে অগ্রগণ্য এবং তোমার মর্যাদা বেশি। কিন্তু সমর বিষয়ক যে অভিজ্ঞতা খালিদের আছে তা তোমার নেই। আল্লাহ্ আমাদের সকলকে সীরাতে মুস্তাকীমের উপর চলার তাওফিক দান করুন।"

হযরত খালিদ (রা.)-কে সকল বাহিনীর সর্বাধিনায়ক বানানো হয়। যে সময় হযরত খালিদ (রা.) তাঁর পথে আগত বাধা অপসারণ করে সিরিয়া অভিমুখে আসছিলেন, তখন হযরত আবু উবায়দা (রা.) যুদ্ধবিহীন বসেছিলেন। হযরত খালিদ (রা.) যখন মারজে রাহেত ময়দানেও শত্রু বাহিনীকে পরাজিত করেন তখন হযরত আবু উবায়দা (রা.) তাঁর সালারদের ডেকে পাঠান। এ সময় হযরত আবু উবায়দা (রা.) এর বাহিনী ইয়ারমুকের উত্তর-পূর্বে হাওরান নামক স্থানে ছিলো। তার অধীনে দুইজন সালার ছিলেন। হযরত শুরাহবীল (রা.) এবং হযরত ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ান (রা.)।

"বন্ধুগণ!" হযরত আবু উবায়দা (রা.) উভয় সালারকে সম্বোধন করে বলেন "আমরা আল্লাহ্ তা'আলার ঐ সাহায্যের কীভাবে শুকরিয়া আদায় করব, যা তিনি হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা.)-এর পথে আগত প্রত্যেক শত্রুবাহিনীর উপরে অব্যাহত রেখেছেন। তোমরা কি চিন্তা করে দেখেছ যে, আমরা ইবনে ওলীদের কোনো কাজেই আসছি না? তিনি যতই সামনে অগ্রসর হচ্ছেন, তার সমস্যা ও বাধা তত ভয়াবহ হচ্ছে। তার সাথে থাকা বাহিনী ক্লান্ত হয়ে নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে। সামনে দামেস্ক এবং বসরা। গাসসানী, ঈসায়ী এবং রোমীয়রা। এই শত্রুরা কি এটা ভাবছে না যে, মুসলমানদের আরো এগিয়ে আসার সুযোগ দেয়া হোক এবং যখন তারা লাগাতার যুদ্ধে অবসন্ন হয়ে পড়বে ও তাদের সৈন্যসংখ্যা হ্রাস পাবে, তখন তাদের কোনো স্থানে ঘিরে ফেলে নিশ্চিহ্ন করা হবে?"

"রোমীয়রা এমন চিন্তা অবশ্যই করে থাকবে" সালার হযরত ইয়াযিদ (রা.) বলেন। "রোমীয়রা যুদ্ধবাজ জাতি এবং তাদের সালাররা অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ।"

"খোদার কসম! আমি রোমীয়দের এমন সুযোগ দিব না" হযরত আবু উবায়দা (রা.) উত্তেজিত কণ্ঠে বলেন "তোমরা কি এতদূর থেকে হলেও ইবনে ওলীদের কোনো সাহায্য করতে পার? ... অবশ্যই করতে পার।"

"আপনি যা চিন্তা করেছেন তা আমাদের বলুন আবু উবায়দা!" হযরত শুরাহবীল বিন হাসানা (রা.) বলেন "আল্লাহ্ তার মদদগার ও সাহায্যকারী।"

"ইবনে ওলীদের সামনে দামেস্ক ও বসরা নামীয় দু'টি স্থান, যেখানে গাসসানী ও রোমীয়রা তাদের সৈন্য বিপুলভাবে সমবেত করে রেখেছে "হযরত আবু উবায়দা (রা.) বলেন "সর্বাধিনায়ক হযরত খালিদ বসরায় আসার পূর্বে আমাদের উচিত বসরায় হামলা করা। এতে এই লাভ হবে যে, রোমীয় ও গাসসানীরাও তাজাদম ও সতেজ থাকবে না।... ইবনে হাসানা!" হযরত আবু উবায়দা (রা.) শুরাহবীল (রা.)-কে বলেন "আমি এই দায়িত্ব তোমাকে অর্পণ করতে চাই। চার হাজার সৈন্য যথেষ্ট হবে।"

হযরত আবু উবায়দা (রা.) সালার শুরাহবীল বিন হাসানা (রা.)-কে দিক-নির্দেশনা দিয়ে বসরার উদ্দেশে পাঠিয়ে দেন।

✪

তখন হযরত খালিদ (রা.) মারজে রাহেত হতে অবসর হয়েছিলেন এবং তিনি হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর নামে এই বার্তা দিয়ে দূত পাঠিয়ে দিয়েছিলেন যে, হযরত আবু উবায়দা (রা.) যেন স্বীয় বাহিনী নিয়ে বসরার নিকটবর্তী কোথাও তাঁর সঙ্গে এসে মিলিত হন। হযরত খালিদ (রা.) মারজে রাহেত এলাকা হতে বের হয়ে পথিমধ্যে দুই-চার দিন অবস্থান করছিলেন।

হযরত শুরাহবীল (রা.) চার হাজার মুজাহিদ নিয়ে বসরায় পৌঁছে যান। রোমীয়রা বসরার বাইরে শিবির স্থাপন করে অবস্থানরত ছিল। রোমীয় সালার মনে করে যে, এটা হযরত খালিদ (রা.)-এর বাহিনী। কিন্তু পরে তার গোয়েন্দারা এসে জানায় যে, এ বাহিনীর সালার অন্য কেউ।

ঐতিহাসিক লিখেন, ঐ রোমীয় বাহিনীর সালার মনে করে যে, এরা হচ্ছে মূল বাহিনীর অগ্রবর্তী বাহিনী এবং পুরো বাহিনী পেছনে আসছে। সে মোটেও মানতে পারছিল না যে, এই কয়জন সৈন্য এত বড় শহর অবরোধ করতে আসতে পারে। বসরা ছিল কেল্লা পরিবেষ্টিত শহর।

হযরত শুরাহবীল (রা.) কেল্লার কাছাকাছি পশ্চিম দিকে ক্যাম্প স্থাপন করেন এবং স্বীয় বাহিনীকে কয়েক দলে ভাগ করে কেল্লার বিভিন্ন দিকে নিযুক্ত করে দেন।

এভাবে দু'দিন গত হয়ে যায়। রোমীয় এবং গাসসানীরা কেল্লার পাঁচিলের উপরে উঠে মুসলমানদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে। হযরত শুরাহবীল (রা.) কেল্লার চারপাশে ঘুরে ঘুরে কিছু কার্যক্রম চালু রেখেছিলেন। শত্রুরা কেল্লার পাঁচিল হতে অনেক দূরে দূরেও দেখতে পাচ্ছিল। তাদের আশা ছিল, পেছনে সমগ্র বাহিনী আসছে। গোয়েন্দা মারফৎ আর কোনো খবর তাদের কাছে পৌঁছাবার কোনো উপায় ছিল না। কেননা কেল্লা ছিল অবরুদ্ধ।

সালার হযরত শুরাহবীল (রা.)-এর সম্পর্কে এটা বলে রাখা জরুরী যে, তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটতম সাহাবী ছিলেন। যে সকল সাহাবায়ে কেরাম নবীজীর ওহী লিখতেন, হযরত শুরাহবীল (রা.) ছিলেন

তাদের অন্যতম। এ কারণে তাকে 'কাতেবে রসূল' বলা হত। হযরত শুরাহ্বীল (রা.)-এর যুহদ ও তাকওয়ার বিষয়টি তো প্রসিদ্ধ ছিলই, পাশাপাশি তিনি সমরশাস্ত্র এবং রণাঙ্গনে নেতৃত্বদানের অভিজ্ঞতাও রাখতেন। বলা হয় যে, তিনি সমরশাস্ত্র হযরত খালিদ (রা.) হতে ইয়ামামা যুদ্ধে অতঃপর অগ্নিপূজারীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধ বিগ্রহ হতে শিখেছিলেন। বসরা অবরোধের সময় তার বয়স হয়েছিল ৭০ বছরের কিছু কম। প্রেরণা ও জযবার দিক দিয়ে তিনি ছিলেন নওজোয়ান। তাঁর অশ্বছুট ও তরবারী চালনা ছিলো যুবকদের মত।

অবরোধ তৃতীয় দিনে গড়ায়। ইতোমধ্যে আর কোনো সৈন্য আসার কোনো আলামত না দেখে রোমীয়রা নিশ্চিত হয়ে যায় যে, মুসলমানদের সংখ্যা ততটাই যতটা কেল্লা অবরোধ করে রেখেছে। যদি অতিরিক্ত সৈন্য আসার হত তাহলে এতদিন চলে আসত। সুতরাং রোমীয় সেনাপতি তার নেতৃত্বাধীন ১২ হাজার সৈন্যকে কেল্লার বাইরে বের করে। মুসলমানদের সংখ্যা ছিল মাত্র চার হাজার।

রোমীয় সৈন্যরা বাইরে বের হলে হযরত শুরাহ্বীল (রা.) অত্যন্ত দ্রুত স্বীয় বাহিনীকে একত্রিত করে যুদ্ধ বিন্যাসে বিন্যস্ত করেন। এভাবে উভয় বাহিনী মুখোমুখী হয়ে যায়।

"হে রোমীয়রা!" হযরত শুরাহ্বীল (রা.) সামনে এসে উচ্চ কণ্ঠে বলেন "খোদার কসম! আমরা পালিয়ে যাবার জন্য আসিনি। তোমাদের প্রথম পরাজয়ের কথা স্মরণ কর। তোমরা প্রতি রণাঙ্গনে আমাদের চেয়ে বেশি ছিলে। তারপরেও তোমরা প্রাণহানী হতে বাঁচতে পারনা কেন? আমাদের মেনে নাও এবং তোমাদের শহর আমাদের হাতে তুলে দিয়ে শহরবাসীকে রক্ষা কর।"

"আমরা পরাজিত হতে কেল্লার বাইরে আসিনি।" রোমীয় সালার সামনে এগিয়ে এসে জবাবের সুরে বলে "তোমরা ফিরে যাও এবং প্রাণ নিয়ে জীবিত থাক। তোমরা যাদের ইতোপূর্বে পরাজিত করেছিলে তারা অন্য কেউ ছিল। সে ঘটনা এখন অতীত। বর্তমান নিয়ে ভাব।"

"খোদার কসম! আমরা যুদ্ধ হতে পিছপা হব না" হযরত শুরাহ্বীল (রা.) ঘোষণা করেন। "কিন্তু আমি তোমাদের শেষবারের মত আরেক বার ভাবার সুযোগ দিচ্ছি। এগিয়ে এসো এবং আমাদের শর্ত শুনে নাও।"

দু'পক্ষের সালারের মাঝে কিছুক্ষণ সমর ভাষায় কথাবার্তা হয়। এক পর্যায়ে রোমীয় সালার মুসলমানদের শর্তের ব্যাপারে আলাপ করতে সিদ্ধান্ত নেয়। তাদের সেনাপতি এগিয়ে আসে। ওদিক দিয়ে হযরত শুরাহ্বীল (রা.)-ও সম্মুখপানে এগিয়ে আসেন।

"বলুন মুসলমান সালার" রোমীয় সালার বলেন "আপনার শর্ত বলুন।"

"ইসলাম কবুল করে নিন" হযরত শুরাহবীল (রা.) বলেন "এটা না মানলে কর দিতে রাজি হোন। এটাও মানতে অপারগ হলে লড়াই করার জন্য প্রস্তুত হোন।"

"আমরা আমাদের ধর্মত্যাগ করব না" রোমীয় সালার বলে। "আমরা করও দিব না। লড়াই করার জন্য আমরা প্রস্তুত। এ কথা বলেই রোমীয় সালার মুসলমানদের উপর হামলা শুরু করতে তার বাহিনীকে নির্দেশ দেয়।

রোমীয়দের সংখ্যা ছিল মুসলমানদের তিনগুণ। হযরত শুরাহবীল (রা.) স্বীয় চার হাজার সৈন্যকে পূর্ব হতেই সমর বিন্যাস অনুযায়ী সারিবদ্ধ করে রেখেছিলেন। স্বীয় বাহিনীর স্বল্পতার বিষয়টিও তার মাথায় ছিল। তাই তিনি তার বাহিনীর উভয় পার্শ্বের সৈন্যদের ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, যাতে শত্রুরা তাদের বেষ্টন করে না নিতে পারে।

রোমীয়রা ছিল যুদ্ধবাজ। তাদের সালার ছিল দক্ষ এবং অভিজ্ঞ। সে মুসলমানদের বেষ্টণ করতে চেষ্টা করছিল। লড়াই চলছিল ঘোরতর। হযরত শুরাহবীল (রা.) দূতদের ডানে বামে নির্দেশনা দিয়ে পাঠাচ্ছিলেন এবং মুজাহিদদের নারাধ্বনি দিয়ে চাঙ্গাও করছিলেন। মুজাহিদরা নিজেদের ঐতিহ্য ও ইতিহাস অনুযায়ী বীর বিক্রমে লড়ছিল। কিন্তু প্রতিপক্ষ ছিল ১২ হাজার। তাদের সালার সৈন্যদের দ্রুত ডানে-বামে ছড়িয়ে দিচ্ছিল।

হযরত শুরাহবীল (রা.) তাঁর বাহিনীর ডানে-বামে দেখলে তাদের পরিস্থিতি তাঁর কাছে বড়ই ভয়ানক মনে হয়। এমন পরিস্থিতি পিছু হটার দাবী করে। কিন্তু হযরত শুরাহবীল (রা.)-এর বজ্র নারাধ্বনিতে মুজাহিদদের জযবা আরও বেড়ে যায়। তারা পিছু হটা বুঝতেন না। তাদের মাথায় পাগলামী চেপে বসেছিল। নতুন শক্তিতে তারা আরও চার-পাঁচ ঘণ্টা লড়ে যায়।

কিন্তু মুসলিম বাহিনীর শেষ রক্ষা হয় না। এক পর্যায়ে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যে, হযরত শুরাহবীল (রা.) আত্মরক্ষার চেষ্টা করছিলেন। শত্রুরা মুজাহিদ বাহিনীকে বেষ্টণ করে ফেলেছিল। পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল মুজাহিদ বাহিনীর সংকুচিত হওয়ার ও চেপে যাওয়ার।

"ভেতর পানে চেপে এসো না" হযরত শুরাহবীল (রা.) দূতদের মাধ্যমে তাঁর দুই পার্শ্ব বাহিনীর কমান্ডারের উদ্দেশে বার্তা পাঠান। "বাইরে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করো।"

হযরত শুরাহবীল (রা.)-এর চাল ব্যর্থ হতে থাকে। অবশ্যই মুসলমানদের জযবা রোমীয়দের চেয়ে বেশি ছিল কিন্তু রোমীয়রা সংখ্যায় এত বেশি ছিল যে, মুসলমানদের উপর তাদের বিজয়ী হওয়া সম্ভবপর ছিল।

"আল্লাহর পূজারীগণ!" হযরত শুরাহবীল (রা.) উচ্চ কণ্ঠে বলেন "বিজয় অথবা মৃত্যু ... বিজয় অথবা মৃত্যু ... বিজয় অথবা মৃত্যু। ... আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও। আল্লাহর রাস্তায় জান দিয়ে দাও। ... আল্লাহর মদদ আসবে ইনশাল্লাহ।"

মুসলমানদের জন্য এটা জীবন-মরণ লড়াইয়ে রূপ নিয়েছিল। হযরত শুরাহবীল (রা.)-এর উচ্চকিত ঘোষণায় মুজাহিদগণ উচ্চ আওয়াজে কালেমায়ে তৈয়্যেবা পাঠ করতে শুরু করে। এতে তাদের অনেক শক্তি হাসিল হয়। কিন্তু ইতোমধ্যে রোমীয়রা তাদের প্রায় গ্রাস করে ফেলেছিল। মুসলমানরা মরণ কামড় দিতে শুরু করেছিল। তাদের জোশ ও প্রেরণায় যেন বিদ্যুতের সংযোগ ঘটেছিল।

রোমীয় সৈন্যরা মুসলমানদের ঘিরতে ঘিরতে তাদের পশ্চাতে চলে এসেছিল। এবার মুসলমানদের কচুকাটা হওয়া নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল।

রোমীয়রা যখন মুসলমানদের পেছনে চলে গিয়ে তাদের ঘেরাও সম্পন্ন করে ঠিক তখন রোমীয়রা তাদের পশ্চাতে তুফানের গতিতে ঘোড়া ছুটে আসার আওয়াজ শুনতে পায়। তারা ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকালে হাজার হাজার অশ্বারোহী বাহিনী তাদের পানে ছুটে আসতে দেখে। মূল বাহিনীর সামনে দু'জন আরোহী ছিলেন; তাঁদের হাতে তলোয়ার ছিল। তাঁদের একজনের মাথায় যে পাগড়ী বাঁধা ছিল তার রং ছিল লাল- তিনি ছিলেন হযরত খালিদ (রা.)।

হযরত খালিদ (রা.) স্বীয় বাহিনী নিয়ে বসরা পানে আসছিলেন। তার পথিমধ্যে দামেস্ক পড়েছিল। কিন্তু তিনি দামেস্ক না গিয়ে বসরার পথ ধরেন। তিনি প্রথমে বসরা বিজয় করতে চাচ্ছিলেন। এটা আল্লাহর ইশারায় হয়েছিল। আল্লাহ কাতেবে রসূলের আওয়াজ এবং দোয়া কবুল করেন। হযরত খালিদ (রা.) যখন কোথাও রওনা হতেন সেদিকে অনেক পূর্বে গোয়েন্দা পাঠিয়ে দিতেন। বসরার পানে চলার পূর্বেও তিনি আগে গোয়েন্দা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

হযরত খালিদ (রা.) বসরা হতে প্রায় এক মাইল দূরে ছিলেন। ইত্যবসরে তাঁর এক উষ্ট্রারোহী গোয়েন্দা উটকে খুব দ্রুত চালিয়ে হযরত খালিদ (রা.)-এর কাছে ফিরে আসে। গোয়েন্দা জানায় যে, এক মুসলিম বাহিনী বসরার বাইরে রোমীয়দের ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে গেছে।

"কে ঐ সালার?" হযরত খালিদ (রা.) বলতে বলতে অশ্বারোহী বাহিনীকে ঘোড়ায় পদাঘাত করতে এবং বর্শা ও তলোয়ার নাঙ্গা করার নির্দেশ দেন।

হযরত খালিদ (রা.)-এর সঙ্গে অপর যে অশ্বারোহী আগে আগে চলছিলেন তিনি ছিলেন খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত আবু বকর (রা.)-এর পুত্র আব্দুর রহমান। তিনি আল্লাহু আকবার নারাধ্বনি তোলেন।

রোমীয়রা মোকাবেলার কথা ভাবে না। তাদের সালাররা ব্যস্ত হয়ে পড়ে। পার্শ্ব বাহিনীকে পেছনে সরিয়ে আনে এবং সমস্ত সৈন্যকে কেল্লার মধ্যে নিয়ে যায়। এ পন্থা অবলম্বন না করলে তাদের কচুকাটা হওয়া নিশ্চিত ছিল। রোমীয়রা কেল্লার মধ্যে ঢুকতে থাকলে মুসলমানরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে এবং কতক রোমীয়দের খতম করে দেয়।

কেল্লার দরজা বন্ধ হয়ে যায়। হযরত খালিদ (রা.) রাগান্বিত ছিলেন। তিনি একটি নির্দেশ এই দেন যে, মুসলিম সৈন্যদের যারা আহত কিংবা নিহত হয়েছে তাদের সৎকার কর এবং দ্বিতীয় নির্দেশ এই দেন যে, সমস্ত সৈন্যকে একত্রিত করা হোক। অতঃপর তিনি হযরত শুরাহবীল (রা.)-কে ডেকে পাঠান।

"ওলীদের পুত্র!" হযরত শুরাহবীল (রা.) এসেই হযরত খালিদ (রা.) কে বলেন "খোদার কসম! আপনি আল্লাহর তলোয়ার। আপনি আল্লাহর মদদ হয়ে এসেছেন।"

"কিন্তু আপনি একি করলেন ইবনে হাসানা!" হযরত খালিদ (রা.) রাগতস্বরে বলেন। "আপনি কি জানতেন না যে এটা শত্রুদের একটি মজবুত কেল্লা এবং এখানে অসংখ্য সৈন্য আছে? আপনি এই স্বল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে এই কেল্লা জয় করতে পারতেন?

"আমি আবু উবায়দার হুকুম তামিল করেছি মাত্র ইবনে ওলীদ!" হযরত শুরাহবীল (রা.) বলেন।

"আহ্ উবায়দা!" হযরত খালিদ (রা.) আফসুস করে বলেন। "আমি তাকে সম্মান করি। তিনি পরহেযগার এবং মুত্তাকী। কিন্তু যুদ্ধের চাল তিনি ভাল করে বুঝেন না।"

ঐতিহাসিক ওকীদী লেখেন, হযরত আবু উবায়দা (রা.)-কে সকলেই বিশেষত হযরত খালিদ (রা.) বুযুর্গ ও শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্ব মনে করতেন। কিন্তু এখানে যে ধাঁচে লড়াই চলছিল, তার জন্য হযরত আবু উবায়দা (রা.) উপযুক্ত ছিলেন না। ঐতিহাসিকরা আরও লিখেন, হযরত আবু উবায়দা (রা.) যথার্থ জযবা ও মনোবলে কারও চেয়ে কম ছিলেন না। তিনি খুব দ্রুততার সঙ্গে অভিজ্ঞতা অর্জন করছিলেন। বসরার উপর তাঁর হামলা দুঃসাহসিক পদক্ষেপ ছিল।

হযরত খালিদ (রা.) কেল্লার বাইরে নিজের এবং হযরত শুরাহবীল (রা.)-এর সৈন্যসংখ্যার হিসেব কষছিলেন। তিনি এটা জানারও চেষ্টা করছিলেন যে, কেল্লার অভ্যন্তরে শত্রুসৈন্য কত? মুসলমানদের হাতে কয়েকজন রোমীয় ধৃত হয়েছিল, যারা আহত ছিল। হযরত খালিদ (রা.)- এর বাহিনী এসে যাওয়ায় মুসলিম বাহিনীর সর্বমোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ১৩ হাজারের কাছাকাছি। কিন্তু রোমীয়, গাসসানী ও ঈসায়ীদের সংখ্যা ছিল দ্বিগুণের চেয়েও বেশি।

"তোমরাও ভয়ে পালিয়ে এসেছ?" কেল্লার অভ্যন্তরে গাসসানী রাজা জাবালা বিন আইহাম রোমীয় সেনাপতির উপর রাগ ঝাড়ছিল "তুমি কি কেল্লার অভ্যন্তরের সৈন্যদের এবং শহরের লোকদের মনোবল ভেঙ্গে দাওনি?"

"না!" রোমীয় সেনাপতি বলে। "আমি বাইরে বেরিয়ে মুসলমানদের উপর হামলা করেছি। যদি আমি তাদের পশ্চাতে থাকা আমার সৈন্যদের সরিয়ে না আনতাম তাহলে পশ্চাৎ হতে আগত মুসলমান সালার তাদের কচুকাটা করত। সে বাহিনীর সংখ্যা আমার জানা ছিল না। আমি মাত্র একদিন অপেক্ষা করব। হতে পারে তাদের অতিরিক্ত সৈন্য আসছে। আমি তাদের বিশ্রাম নেয়ার সুযোগ দিব না।

"তাহলে তাদেরকে কেল্লা অবরোধ করার সুযোগ দাও" জাবালা বলে- "তাদেরকে কেল্লার চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ার অবকাশ দাও। এরপর তুমি কেল্লা হতে এত দ্রুত বের হবে যে, তারা যেন ছড়িয়ে থাকা বাহিনী গুছিয়ে আনার সুযোগ না পায়। ... এবং শহরে ঘোষণা করে দাও যে, ঘাবড়ানোর কোনো কারণ নেই। শত্রুদেরকে কেল্লার বাহিরেই শেষ করে দেয়া হবে।"

কেল্লার অভ্যন্তরে বিরাট হৈ চৈ চলছিল। শহরের লোকদের মাঝে ভীতি ও অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছিল। রোমীয় সৈন্যদের বাহিরে গিয়ে লড়াই করা এবং আবার ভেতরে চলে আসাটা শহরে লোকদের জন্য ত্রাসের কারণ ছিল। মুসলিম সৈন্যদের সম্পর্কিত এক ধরনের ভীতি ও ত্রাস শহরে পূর্বের থেকেই বিদ্যমান ছিল।

ঐতিহাসিকদের তথ্যমতে রোমীয়রা এই ভেবেছিল যে, মুসলমানদের বিশ্রাম নেয়ার সুযোগ দেয়া হবে না। কিন্তু তাদের জানা ছিলনা যে, মুসলমানরা আরামে অভ্যস্থ নয়। তাদের শুধু এতটুকু অবকাশ দরকার যে, আহতদের সামলাবে এবং শহীদের লাশ দাফন করবে।

পরদিন প্রভাতে সূর্য উঠতে না উঠতেই রোমীয় সৈন্যরা কেল্লার বাইরে চলে আসে এবং দরজা বন্ধ হয়ে যায়। হযরত খালিদ (রা.) সৈন্যদের যুদ্ধ বিন্যাসে সাজিয়ে ফেলেন। কেল্লার বাইরে উন্মুক্ত ছিল।

হযরত খালিদ (রা.) চিরায়ত নিয়মানুযায়ী তার বাহিনীকে তিন অংশে বিভক্ত করেন। মধ্যম বাহিনীর কমান্ড নিজের হাতে রাখেন। এবার যেহেতু হযরত শুরাহবীল (রা.)-এর সৈন্যরা থাকায় তার সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল তাই তিনি মধ্যম বাহিনীকে হেফাজত করতে তাদের সামনে একটি দল রাখেন। এই দলের কমান্ড খলীফাতুল মুসলিমীন, হযরত আবু বকর (রা.)-এর পুত্র হযরত আব্দুর রহমান (রা.)-এর হাতে ছিল। এক পার্শ্ব বাহিনীর কমান্ডার ছিলেন রাফে ইবনে উমাইরা আর দ্বিতীয় পার্শ্ব বাহিনীর দায়িত্বে ছিলেন সালার জিরার বিন আযওর।

যুদ্ধের সূচনা মুসলমানদের নারাধ্বনির মাধ্যমে হয়। রোমীয় সালার মধ্যম বাহিনীর আগে আগে আসছিল। হযরত আব্দুর রহমান বিন আবু বকর (রা.) বয়সে যুবা ছিলেন। হযরত খালিদ (রা.) তার বাহিনীকে সামনে এগিয়ে যাবার নির্দেশ দিতেই হযরত আবদুর রহমান (রা.) সোজা রোমীয় সালারের দিকে এগিয়ে যান। লড়াই শুরু হওয়ার পূর্বেই তার দৃষ্টি ঐ রোমীয় সেনাপতির প্রতি নিবদ্ধ ছিল।

হযরত আব্দুর রহমান (রা.) ঘোড়া ছুটিয়ে দেন এবং তরবারি উঁচু করে রোমীয় সালারের দিকে এগিয়ে যান। কিন্তু তিনি নিকটে গিয়ে তাকে পেছনে রেখে সম্মুখপানে এগিয়ে যান। রোমীয় সেনাপতি ঘোড়া ঘুরিয়ে আব্দুর রহমানের

পেছনে যান। হযরত আব্দুর রহমান (রা.) ঘোড়া ঘুরাতে ঘুরাতে রোমীয় সেনাপতির পেছনে আসা দেখেন। রোমীয় সেনাপতি প্রথমে আক্রমণ করে, যা থেকে আব্দুর রহমান (রা.) বেঁচে যান। তলোয়ারের আওয়াজ তার মাথার কাছ দিয়ে ফিরে যায়।

এবার আব্দুর রহমান (রা.) পেছনে ছিলেন। রোমীয় সেনাপতি ঘোড়া ঘুরাচ্ছিল। আব্দুর রহমান (রা.) তলোয়ারের জোরালো আঘাত করেন। এ আঘাত থেকে রোমীয় সেনাপতি বেঁচে গেলেও তার ঘোড়ার জিন কেটে যায় এবং আঘাত ঘোড়ার গায়েও লাগে। এতে ঘোড়ার শরীর হতে রক্তধারা বইতে থাকে এবং ঘোড়া রোমীয় সেনাপতির কাবু হতে বের হতে চায়।

রোমীয় সেনাপতি অভিজ্ঞ যোদ্ধা ছিল। সে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ঘোড়াকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং সেই সঙ্গে আক্রমণও চালায়। হযরত আব্দুর রহমান (রা.) প্রতিটি আক্রমণ ফিরিয়ে দেন। এরপর তিনি যখন ঘোড়ার পাদানিতে দাঁড়িয়ে আক্রমণ করেন তখন রোমীয় সেনাপতি ঘাবড়ে যায়। তার পরিহিত বর্ম ও শিরস্ত্রাণ এবারও তাকে রক্ষা করলেও নিজের একটি পাকে সে রক্ষা করতে পারে না। হাঁটুর উপরে মারাত্মক আহত হয়। পরিস্থিতি তাকে পালাতে বাধ্য করে। সে পালানোর পথ খুঁজতে থাকে। তার নিজের প্রাণের চিন্তা ছিল কী ছিল না কিন্তু তার এই আশঙ্কা ছিল যে, সে যদি আহত অবস্থায় জমিনে পড়ে যায় তাহলে তার সমস্ত সৈন্য পালাতে থাকবে। এই ভেবে সে স্বীয় বাহিনীর মাঝে আত্মগোপন করার চেষ্টা করতে থাকে। হযরত আব্দুর রহমান (রা.) তার পশ্চাদ্ধাবন ছাড়েন না। কিন্তু তাকে হাতের নাগালে পান না এবং স্বীয় বাহিনীর চোখ থেকেও সে আড়ালে চলে যায়।

হযরত খালিদ (রা.) রোমীয়দের উপর এভাবে হামলা করেন যে, সালার রাফে ইবনে উমাইরা এবং সালার জাররার বিন আযওরকে নির্দেশ দেন যে, তারা যেন বাইরে থেকে ডান- বাম হতে রোমীয়দের উপর কঠিন ও তীব্র হামলা চালায়। মুজাহিদরা 'কঠিন' এর অর্থ বুঝতেন। ঐতিহাসিকদের বিবরণে এই হামলা এত তীব্রতর ও কঠিন ছিল যে, যেন মুজাহিদরা সম্পূর্ণ তাজাদম এবং তাদের সংখ্যা দুশমনের দ্বিগুণ। উভয় সালারের বাহিনী পাগলের মত আক্রমণ করে চলছিল।

ঐতিহাসিক ওকীদী এবং ইবনে কুতাইবা লিখেন, সালার জাররার জোশ ও প্রেরণায় বর্ম খুলে ফেলেন। যদিও বর্মটি হালকা-পাতলা ছিল কিন্তু সময়টি জুলাই মাসের প্রথমদিকে হওয়ায় গরমের ভর মৌসুম ছিল। হযরত জাররার গরমে অতিষ্ট হয়ে এবং সাচ্ছন্দে লড়াই করতে বর্ম খুলে ফেলেছিলেন। তিনি তার বাহিনীকে আক্রমণ করার নির্দেশ দেন। তার ঘোড়া শত্রুপক্ষের নিকটে পৌঁছার আগেই তিনি গায়ের জামাও খুলে ছুড়ে ফেলেন। এভাবে তার দেহের সম্মুখভাগ সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে যায়।

এমন ঘোরতর যুদ্ধে বর্ম পরা জরুরী ছিল এবং মাথার হেফাজত আরও জরুরী ছিল। কিন্তু জাররার বিন আযওর প্রাণ বাজী রেখেছিলেন। সালারকে এই অবস্থায় দেখে তার বাহিনীর মাঝে তীব্র জোশ সৃষ্টি হয়। জাররার শত্রুদের আহ্বান করতেন এবং তারা এগিয়ে এলে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছিলেন। তার সামনে যেই আসে কচুকাটা হয়ে যায়। তিনি সালার থেকে সিপাহীতে পরিণত হয়েছিল।

রাফে বিন উমাইরা রোমীয়দের অপর পার্শ্ব বাহিনীর উপর হামলা করেছিলেন। তার আক্রমণ এত মারাত্মক ছিল যে, শত্রুদের মনে ত্রাস সৃষ্টি হয়ে যায়।

হযরত খালিদ (রা.) যখন দেখেন যে, জাররার এবং রাফে রোমীয় উভয় পার্শ্ব বাহিনীর উপর তেমনভাবে হামলে পড়েছে যেভাবে তিনি চেয়েছিলেন এবং তাদের আক্রমণে শত্রুদের পার্শ্ববাহিনী মধ্যের দিকে সংকুচিত হয়ে আসছে তখন হযরত খালিদ (রা.) সামনের দিক থেকে আক্রমণ শুরু করেন।

ত্রিমুখী চাপে রোমীয়রা পিছু হটতে থাকে। কিন্তু পেছনে কেল্লার পাঁচিল ছিল। এটা মূলত শহর রক্ষাকারী ছিল। তাদের জন্য পিছু হটার জায়গা ছিল না। মুজাহিদরা তাদেরকে প্রাণভরে মারতে ও কাটতে থাকে।

"দরজা খুলে দাও" পাঁচিলের উপর থেকে কেউ চিৎকার করে বলে।

কেল্লার দরজা খুলে যায় এবং রোমীয় সৈন্যরা কেল্লার মধ্যে ঢুকতে থাকে। চলমান অবস্থায় কেল্লার মধ্যেই কেবল তাদের আশ্রয় ছিল। মুসলমানরা চাপ অব্যাহত রাখে এবং রোমীয়রাও দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিরোধ করতে থাকে। এর মধ্য দিয়ে যে যখন সুযোগ পেত কেল্লার মধ্যে চলে যেত।

✪

যে সব রোমীয় সৈন্য কেল্লার মধ্যে আশ্রয় নিচ্ছিল তাদের সংখ্যা মূল সংখ্যার অর্ধেকও ছিল না। তাদের অর্ধেক সৈন্য হযরত খালিদ বাহিনীর সঙ্গে বুঝাপড়া করছিল। তারা উন্নত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও জানবায সিপাহী ছিল। কঠিন চাপে পড়েও তারা পিছু হটার কথা ভাবছিল না। এদিকে হযরত খালিদ (রা.) তাদেরকে পিছু হটিয়ে দিতে প্রাণপণ চেষ্টা করছিলেন।

হযরত খালিদ (রা.) বীরত্ব ও নির্ভীক নেতৃত্বের এই দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন যে, তিনি ঘোড়া থেকে নেমে পড়েন এবং সাধারণ সিপাহীর মত পায়ে হেঁটে লড়তে থাকেন। এর প্রতিক্রিয়া মুজাহিদ বাহিনীর উপর এভাবে পড়ে যে, তারা ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। এটা তাদের ঈমান ও ইশকে রসূলের নৈপুণ্য ছিল যে, লাগাতার সফর ও যুদ্ধে ক্লান্ত-শ্রান্ত দেহে নবজীবন এবং সতেজতা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। এটা কোনো অত্যুক্তি নয় যে, মুসলমানরা রূহানী শক্তিতে লড়ছিল।

হযরত খালিদ (রা.) এই চেষ্টায় ছিলেন যে, তিনি রোমীয়দের ঘেরাও করে ফেলবেন। কিন্তু রোমীয়রা জীবন মরণের যুদ্ধ লড়ছিল। তারা কুলিয়ে উঠতে না পেরে এই পলিসি গ্রহণ করে যে, তারা আক্রমণ করা বাদ দিয়ে আক্রমণ ঠেকাতে ঠেকাতে ডানে বামে পিছে হটতে থাকে। তারা অবরুদ্ধ হওয়া থেকে বাঁচতে চারদিক ছড়িয়েও পড়ছিল। পরিশেষে তারাও পালিয়ে কেল্লার অপর দরজা দিয়ে গায়েব হয়ে যাচ্ছিল।

হযরত খালিদ (রা.) উচ্চ আওয়াজে নির্দেশ দেন "তাদের পিছুপিছু কেল্লার মধ্যে চলে যাও।" কিন্তু পাঁচিলের উপর হতে তীরের ঝাঁক আসতে থাকে। বর্শাও আসতে থাকে। তাই বাধ্য হয়ে মুজাহিদ বাহিনীকে পেছনে সরে আসতে হয়। এভাবে বেঁচে যাওয়া রোমীয়রা কেল্লার মধ্যে চলে যায় এবং কেল্লার দরজা বন্ধ হয়ে যায়।

বাইরে রোমীয় ও তাদের সম্মিলিত বাহিনীর লাশ বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে ছিল। আহতরা ছটফট করছিল। আহত ঘোড়াগুলো ভীত-সন্ত্রস্তভাবে লাগামহীন হয়ে এদিক-ওদিক দৌড়াদৌড়ি করছিল। কতক অশ্বারোহীর পা রেকাবিতে আটকা পড়েছিল আর ঘোড়া তাদের টেনে-হিঁচড়ে ফিরছিল। এতে আরোহী রক্তস্নাত লাশে পরিণত হচ্ছিল।

লড়াই শেষ হয়ে গিয়েছিল। মুজাহিদ বাহিনী বিজয়সূচক শ্লোগান দিচ্ছিল। বিজয় তখনও পরিপূর্ণ হয়নি। দুশমনের ক্ষয়ক্ষতি অনেক হলেও তারা কেল্লাবন্দী হয়ে গিয়েছিল। বিজয় পরিপূর্ণ করার জন্য কেল্লা পদানত করা জরুরী ছিল। হযরত খালিদ (রা.) আহত মুজাহিদদের খোঁজ খবর নেয়ার নির্দেশ দেন এবং দূতকে বলেন, সকল সালারকে ডেকে আনতে।

হযরত খালিদ (রা.) এক অশ্বারোহীকে তার দিকে আসতে দেখেন। তাকে অন্যদের থেকে কিছুটা ভিন্ন মনে হচ্ছিল। এর এক কারণ এই ছিল যে, তার দেহ দীর্ঘকায় ছিল এবং শরীর ছিল হালকা-পাতলা। আরবরা সাধারণত এমন পাতলা লিকলিকে হয় না। এই অশ্বারোহী সম্মুখপানে কিছুটা ঝুঁকাও ছিল। তার দাড়ি ঘন ছিল না এবং লম্বাও ছিল না। দাঁড়িগুলো লোকটি কৃত্রিমভাবে কালো করে রেখেছিল।

লোকটিকে এ কারণে ভিন্ন প্রকৃতির মনে হচ্ছিল যে, হযরত খালিদ (রা.) তাকে লড়াই করতে দেখেছিলেন এবং তার লড়াইয়ের ধরণ কিছুটা ভিন্নতর ছিল। সকলের দৃষ্টি আগন্তুকের প্রতি নিবদ্ধ এই কারণেও ছিল যে, তার হাতে হলুদ বর্ণের ঝাণ্ডা ছিল। এটা সেই ঝাণ্ডা ছিল যা খয়বার যুদ্ধে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের সঙ্গে রেখেছিলেন।

হযরত খালিদ (রা.) দূর হতে আগন্তুক অশ্বারোহীকে চিনতে পারেননি। গরমের তেজ ছিল প্রচুর। তিনি মাথায় কাপড় বেঁধে রেখেছিলেন, যার কারণে তার অর্ধেক চেহারা ঢাকা ছিল। হযরত খালিদ (রা.)-এর কাছে এসে লোকটি মুচকি-হাসি দিলে হযরত খালিদ (রা.) দেখেন যে, তার সামনের তিনটি দাঁত ভাঙ্গা।

আগন্তুক অশ্বারোহী হযরত আবু উবায়দা ইবনুল যাররাহ (রা.) ছিলেন। মারজে রাহেত হতে হযরত খালিদ (রা.) তার প্রতি বার্তা পাঠান যে, তিনি যেন বসরার বাইরে কোথাও তার সঙ্গে এসে মিলিত হন। হযরত আবু উবায়দা (রা.) হাওয়ারিন নামক স্থানে তাঁবু স্থাপন করে অবস্থান করছিলেন। এখান থেকেই তিনি হযরত শুরাহবীল (রা.)-কে চার হাজার মুজাহিদ দিয়ে বসরায় আক্রমণ করিয়েছিলেন। তার কাছে হযরত খালিদ (রা.)-এর দূত বিলম্বে পৌঁছেছিল। হযরত আবু উবায়দা (রা.) বার্তা পেয়ে তখন বসরায় পৌঁছেন, যখন হযরত খালিদ (রা.) রোমীয়দের সঙ্গে কঠিন যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। মুজাহিদ বাহিনীকে যুদ্ধলিপ্ত দেখে হযরত উবায়দা (রা.)-ও তলোয়ার বের করেন এবং যুদ্ধে শরীক হয়ে যান।

হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর বয়স তখন ৫৫ বছরের কাছাকাছি ছিল। তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশিষ্ট সাহাবীদের একজন ছিলেন। তার দাদা তৎকালীন যুগের প্রসিদ্ধ সার্জন ছিলেন। এ কারণে তিনি নিজের নাম ধারণ করেছিলেন আবু উবায়দা ইবনুল যাররাহ। তার মূল নাম ছিল আমের বিন আব্দুল্লাহ ইবনুল যাররাহ। কিন্তু তিনি আবু উবায়দা নামে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। হালকা-পাতলা এবং কিছুটা কুঁজো হওয়া সত্ত্বেও তার চেহারায় গাম্ভীর্যের ছাপ ছিল। তিনি জ্ঞানী ছিলেন। রণাঙ্গনে যদিও তিনি উল্লেখযোগ্য কোনো কীর্তি রেখে যেতে পারেন নি কিন্তু বিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন উঁচু মাপের।

হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর সামনের দাঁত ওহুদ যুদ্ধে ভেঙ্গে গিয়েছিল। সে যুদ্ধে নবীজী আহত হয়েছিলেন। নবীজীর শিরস্ত্রাণের শিকলের দু'টি কড়া নবীজীর চেহারা মুবারকে এমন গভীরভাবে গেঁথে গিয়েছিল যে, হাত দ্বারা তা টেনে বের করা যাচ্ছিল না। হযরত আবু উবায়দা (রা.) সে কড়া দু'টি নিজের দাঁত দ্বারা টেনে বের করেছিলেন। এতে তিনি সফল হলেও তার সামনের দু'টি বা তিনটি দাঁত ভেঙ্গে গিয়েছিল।

ইবনে কুতাইবা লিখেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু উবায়দা (রা.)-কে অত্যন্ত মহব্বত করতেন। নবীজী একবার বলেছিলেন, "আবু উবায়দা আমার উম্মতের আমীন।" এ কারণে মানুষ আবু উবায়দাকে 'আমীনুল উম্মত' বলত।

তৎকালীন সময়ের ঐতিহাসিক তথ্য-উপাত্ত থেকে জানা যায় যে, হযরত খালিদ (রা.) যখন আবু উবায়দা (রা.)-কে বসরার ময়দানে দেখেন তখন তার মনে এই আশঙ্কা জেগেছিল যে, আবু উবায়দা হয়ত তার সেনাপতিত্ব মেনে নিবেন না। যদিও খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত আবু উবায়দা (রা.)-কে এই লিখিত নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, যখন খালিদ সিরিয়ার রণাঙ্গনে পৌঁছবে, তখন সে-ই হবে সকল দলের সর্বাধিনায়ক। কিন্তু হযরত খালিদ (রা.) জানতেন যে, সমাজে হযরত আবু উবায়দা (রা.) এর যে সম্মান ও মর্যাদা ছিল তা তার ছিল না। হযরত খালিদ (রা.) নিজেও হযরত আবু উবায়দা (রা.)-কে অত্যন্ত সমীহ করতেন।

এই সমীহ বোধের কারণেই বসরার রণাঙ্গনে হযরত খালিদ (রা.) তাকে নিজের দিকে আসতে দেখে নিজেই দৌড়ে তার দিকে এগিয়ে যান। আবু উবায়দা (রা.) ঘোড়া হতে নামতে থাকেন।

"না ইবনে আব্দুল্লাহ।" –হযরত খালিদ (রা.) আবু উবায়দা (রা.)-কে বলেন– ঘোড়া হতে নামবেন না। আমি এই উপযুক্ত নই যে, 'আমীনুল উম্মত' আমার জন্য ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়বেন।"

হযরত আবু উবায়দা (রা.) ঘোড়ার পিঠে সওয়ার থাকেন এবং সেখান থেকেই নুইয়ে হযরত খালিদ (রা.)-এর দিকে দুই হাত বাড়িয়ে দেন। হযরত খালিদ (রা.) সমীহের সাথে মুসাফাহা করেন।

"আবু সুলাইমান!" হযরত আবু উবায়দা (রা.) হযরত খালিদ (রা.) কে বলেন–"আমীরুল মুমিনীনের বার্তা আমি পেয়ে গেছি। সেই পত্রে তিনি তোমাকে আমাদের সকলের সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করেছেন। আমি এতে খুব খুশি। কোনো সন্দেহ নেই যে, সমর বিষয়ে যতটুকু জ্ঞান তুমি রাখ তা আমার মধ্যে নেই।"

"খোদার কসম ইবনে আব্দুল্লাহ!"–হযরত খালিদ (রা.) বলেন–"আমীরুল মু'মিনীনের হুকুম তামিল করা আমার উপর ফরয; নতুবা আমি আপনার বর্তমানে সিপাহসালার কখনো হতাম না। আপনার যে মর্যাদা তা আমার নেই।"

"এমন কথা বলো না আবু সুলাইমান!" হযরত আবু উবায়দা (রা.) বলেন–"হযরত আবু বকর (রা.) একেবারে সঠিক ফায়সালা করেছেন। আমি তোমার অধীনে তোমার নির্দেশে এখানে এসেছি। আল্লাহ তোমাকে গাসসানী এবং রোমীয়দের উপর বিজয় দান করুন।"

✪

হযরত খালিদ (রা.) বসরা অবরোধ করার নির্দেশ দেন। গাসসানী ও রোমীয়দের লাশ যেখানে পড়েছিল সেখানেই পড়ে থাকে। উপরে শকুনের পাল উড়ছিল এবং গাছে গাছে বসছিল। মুজাহিদ বাহিনী শহীদদের লাশ সযত্নে উদ্ধার করছিলেন। তাদের সংখ্যা ছিল ১৩০।

হযরত খালিদ (রা.) কেল্লার চারপাশে ঘোড়া ছুটিয়ে এমন স্থান আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেন, যেখান দিয়ে কেল্লা ভাঙ্গা যেতে পারে। পাঁচিলের উপর থেকে তীর আসছিল। কিন্তু মুসলমানরা তার আওতা থেকে দূরে ছিল।

কেল্লার ভেতরের পরিবেশ ছিল গুমোট এবং নৈরাশ্যজনক। জাবালা বিন আইহাম এবং রোমীয় সেনাপতি চুপ করে থেকে একে অপরের মুখ দেখছিল। "তুমি একেবারে হিম্মত হারিয়ে ফেলেছ?" জাবালা বিন আইহাম রোমীয় সালারকে জিজ্ঞাসা করে।

"আপনি কোথায় হিম্মত হারাননি?" রোমীয় সালার পরাজয়ের রাগ জাবালার উপরে ঝাড়ে এবং বলে–"মুসলমানদের পথিমধ্যে সর্বপ্রথম আপনারা এবং ঈসায়ীরা এসেছিল, কেউ মুসলমানদের ঠেকাতে পারেন নি। মারজে রাহেতেও আপনার সৈন্যরা ব্যর্থ হয়। আপনি আমাকে এবং আমার সৈন্যদের সমূলে নিঃশেষ করতে চান? বাইরে বেরিয়ে দেখুন। কতজন সৈন্য আমাদের সঙ্গে রয়েছে? বহু সৈন্য রণাঙ্গনেই মারা গেছে। আমাকে জানানো হয়েছে যে, আমাদের অনেক সিপাহী এবং কমান্ডার আজনাদাইনের দিকে পালিয়ে গেছে। কেল্লার মধ্যে অনেক কম সৈন্য এসেছে। পাঁচিলের উপরে উঠে বাইরের দিকে তাকান এবং লাশের হিসেব করুন, তাহলে বুঝতে পারবেন, আমাদের সঙ্গে আর কত সৈন্য আছে।"

বাহির থেকে মুসলমানদের আহ্বান শোনা যাচ্ছিল।

"রোমীয় সালার যেন বাইরে এসে সন্ধির আলোচনা করে।"

"রোমীয়রা! কেল্লা আমাদের হাওলা করে দাও।"

"আমরা নিজেরা কেল্লা পদানত করলে আমাদের থেকে রহমের আশা থাকবে না।"

এর পাশাপাশি হযরত খালিদ (রা.)-এর নির্দেশে মুজাহিদ বাহিনী কেল্লার দরজা ভাঙ্গার জন্য এগিয়ে যেতে থাকে। কিন্তু উপর থেকে নিক্ষিপ্ত তীরের ঝাঁক তাদেরকে সফল হতে দেয় না। তারা এক স্থান থেকে দেয়াল ভাঙ্গার চেষ্টাও করে, কিন্তু তাতেও সফল হয় না।

শহুরে লোকদের মধ্যে আতংক বিরাজ করছিল। তারা মুসলমানদের আহ্বান শুনছিল। তারা জানত যে, বিজয়ী সেনারা শহুরে লোকদেরকে কেমনভাবে ধ্বংস করে। মুসলমানরা বলছিল, কেল্লা নিজেরা ছেড়ে দিলে শহরের অধিবাসী ও তাদের ঘর-বাড়ী নিরাপদ থাকবে।

জাবালা বিন আইহাম এবং রোমীয় সালার তাদের কক্ষ থেকে বাইরে বের হয় না। শহরের লোকজন প্রতিটি ক্ষণ ভয় ও উদ্বেগের মধ্যে অতিবাহিত করছিল।

"মুসলমানদের সঙ্গে সন্ধি করুন" সমবেত জনতা বলছিল। "আমাদের বাঁচান। কেল্লা তাদের দিয়ে দিন। আমাদেরকে গণহত্যা করবেন না।"

জাবালা বিন আইহাম এবং রোমীয় সেনাপতি তিন-চারদিন কোনো ফয়সালা দেয় না। হযরত খালিদ (রা.) অবরোধের নামে সৈন্যদেরকে বিশ্রামের সুযোগ দেন। তারা শহীদদের জানাযা পড়ে তাদের দাফন করে দেয়।

পরিশেষে একদিন কেল্লায় সাদা পতাকা উড়তে দেখা যায়। একটু পরেই কেল্লার দরজা খুলে যায় এবং রোমীয় সালার বেরিয়ে আসে। সে এসে সন্ধির দরখাস্ত করে। হযরত খালিদ (রা.) তাদের উপর এই শর্তারোপ করেন যে, তারা কর আদায় করবে। রোমীয় সালার হযরত খালিদ (রা.)-কে কেল্লা হাওলা করে। এটা ছিল ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্য জুলাইয়ের ঘটনা।

রোমীয় ও গাসসানীরা কেল্লা ছাড়তে থাকে।

হযরত শুরাহবীল (রা.) দেখেছিলেন যে, রোমীয় সৈন্যরা আজনাদাইনের দিকে পালিয়ে যাচ্ছে। এ দৃশ্য দেখে তিনি আজনাদাইনে একজন গোয়েন্দা পাঠিয়ে দেন। উক্ত গোয়েন্দা ফিরে এসে জানায় যে, রোমীয় সৈন্যরা আজনাদাইনে সমবেত হচ্ছে এবং ধারণা করা হচ্ছে সেখানে ৯০ হাজার সৈন্য সমবেত হবে।

"আমাদের পরবর্তী গন্তব্য হবে আজনাদাইন"– হযরত খালিদ (রা.) বলেন।

✪

নেপোলিয়ান সে সমস্ত ব্যক্তিত্বদের অন্যতম যারা নিজ নিজ যুগে ইতিহাসের পাতা পরিবর্তন করে দিয়েছে এবং বিশ্বকে কাঁপিয়ে তুলেছে। ফ্রান্সের ইতিহাস রচয়িতা জেনারেল হিকমিরান নেপোলিয়ান হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রা.) সম্পর্কে বলেছেন–

"যদি মুসলমানদের সেনাপতি অন্য কেউ হত তাহলে মুসলিম বাহিনী আজানাদাইনের উদ্দেশে যাত্রাই করত না।"

নেপোলিয়ানের যুগ হযরত খালিদ (রা.)-এর যুগের প্রায় ১২০০ বছর পরের ছিল। ইতিহাসের এই প্রবাদ পুরুষ ইতিহাসের নামকরা কয়েকজন জেনারেলের সমর নেতৃত্ব, তাদের সফলতা ও অসফলতা এবং তাদের সৈন্যদের পরিচালিত কার্যক্রম গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন।

৬৩৪ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে বসরার বিজয়ের পর হযরত খালিদ (রা.) তার বাহিনীকে আজনাদাইনের উদ্দেশে অগ্রসর হওয়ার যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তা মুসলিম বাহিনীর দৈহিক অবস্থা এবং সংখ্যার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। তাকে গোয়েন্দা সূত্র বাস্তব রিপোর্ট দিয়েছিল যে, আজনাদাইনে রোমীয়রা মুসলমানদের গাজর-মূলার মত কাটার জন্য যে বিশাল বাহিনী সমবেত করে রেখেছিল তাদের সংখ্যা ৯০ হাজারের বেশি ছাড়া কম ছিল না। পুরো বাহিনী ছিল তাজাদম ও চাঙ্গা। এর বিপরীতে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩০ হাজারের মত। তাও আবার তারা লাগাতার লড়াই করে আসছিল; তারা তাজাদম ছিল না। শুধু বসরায় শহীদ হয়েছিল ১৩০ জন মুজাহিদ এবং অনেকে হয়েছিল আহত।

এখানে তৎকালীন যুগের ইসলামী বাহিনী সম্পর্কে কিঞ্চিত আলোকপাত করা সমীচীন মনে করছি। ইসলামী বাহিনীর নির্দিষ্ট কোনো ইউনিফর্ম ছিল না। যার যেমন কাপড় ছিল সে তেমন পরিধান করত। অনেক এমন দেখা যেত যে, কিছু সিপাহী বহু মূল্যবান বস্ত্র পরিধান করেছে অথচ সালার, নায়েব সালার প্রমুখের পরনে একদম সাদামাটা পোশাক। কারণ এই ছিল যে, সিপাহীরা গণীমতের মাল হিসেবে প্রাপ্ত কাপড় পরিধান করত।

ইসলামী বাহিনীর একটি বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, সেনাপতি-উপসেনাপতিদের কোনো বিশেষ ইউনিফর্ম ও ব্যাজ ছিল না। বর্তমান যুগের মত উর্ধ্বতন কর্মকতা, জেনারেল ও সিপাহীদের যে ভেদাভেদ তা সে সময়ে ছিল না। গোত্রের সর্দারও অনেক সময় সিপাহী হত আর তারই গেত্রের সাধারণ লোক হয়ে যেত কমান্ডার। পদ-পদবীর এত বাছ-বিচার ছিল না। কোনো ব্যক্তি সাধারণ সিপাহী হয়ে বাহিনীতে ভর্তি হওয়ার পর নিজস্ব দক্ষতা ও যোগ্যতা বলে দু'চার দিন পর কমান্ডার হয়ে যেত। সে যুগে দেখা হত যুদ্ধজ্ঞান ও যোগ্যতা। এমনও হত যে, এক যুদ্ধে কেউ অফিসার আবার পরের যুদ্ধে সে সিপাহী হয়ে গেছে।

ইসলামী শিক্ষায় অফিসারগিরি ও অধীনস্থতার চিত্র কিছুটা ভিন্ন ধরনের ছিল। কাউকে অফিসার বানানো হলে দায়িত্বের একটি পর্যায় পর্যন্ত সে অফিসার হত। তার কোনো নির্দেশ ব্যক্তিগত পর্যায়ের হত না। যেহেতু অফিসার নির্বাচনের মাপকাঠি অন্য কিছু ছিল তাই তখনকার সময়ে এ বিষয়ে খোশামোদ ও সুপারিশের কোনো নাম-গন্ধ ছিল না।

বিশাল ইসলামী সাম্রাজ্যের পতন তখন থেকে তরান্বিত হয়, যখন মুসলমানরা অফিসার ও সিপাহীতে ভাগ হওয়া শুরু হয়েছে, কর্মকর্তারা অধীনদের শাসিত মনে করা শুরু করেছে এবং সুপারিশ ও স্বজনপ্রীতির রোগ তাদের আক্রান্ত করেছে।

তৎযুগে মুসলিম বাহিনীর হাতিয়ারের মধ্যে তেমন পার্থক্য ছিল না। ছিল না উঁচু-নিচুর মানদণ্ড। প্রত্যেকে যে যার অস্ত্র নিয়ে বাহিনীতে শামিল হত। বর্ম, শিরস্ত্রাণ প্রত্যেকের ছিল না। মুসলমানরা যে বর্ম ও শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করত তা দুশমনদের থেকে ছিনিয়ে নেয়া ছিল। বর্তমান যুগে যেমন সৈন্যদের উচ্চতা ও বয়স এক ধরনের হয় ইসলামী বাহিনীতে তেমন কোনো নিয়ম ছিল না।

ইসলামী বাহিনীর যাত্রা প্রশিক্ষিত বাহিনীর মত হত না। তারা অবিন্যস্ত অবস্থায় কাফেলার মত চলত। খোরাক ও রসদ তাদের সঙ্গেই থাকত। গরু, গাভী দুম্বা এবং ভেড়া-বকরী যা সৈন্যদের খোরাক হত-তা সৈন্যদের সাথে সাথেই থাকত। রসদের নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা অনেক পরে করা হয়েছিল।

অশ্বারোহীরা চলার সময় পায়ে হেঁটে চলত, যাতে ঘোড়া আরোহী বহন করে ক্লান্ত হয়ে না যায়। আসবাবপত্র উটে বোঝাই করে আনা হত। স্ত্রী এবং বাচ্চারা সঙ্গে থাকত। তাদেরকে উটে চড়িয়ে দেয়া হত।

তৎযুগের ইসলামী সৈন্য দেখে কেউ বলতে পারত না যে, এরা সৈন্য। তাদেরকে কাফেলা মনে করা হত। কিন্তু ইসলামী সৈন্যদের মাঝে একটি ব্যবস্থাপনা ছিল। সবার আগে অগ্রবাহিনী থাকত। নিজেদের দায়িত্ব ও জিম্মাদারী সম্পর্কে তাদের পূর্ণ সচেতনতা থাকত। তাদের পেছনে থাকত সৈন্যদের মূল অংশ। তাদের পেছনে থাকত নারী ও বাচ্চারা। তাদের পেছনে থাকত পশ্চাৎ রক্ষীবাহিনী। এমনিভাবে দুই পার্শ্ব বাহিনীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকত।

সৈন্যরা সাধারণত কঠিন রাস্তা ব্যবহার করত। এতে একটি লাভ এই হত যে, গন্তব্যস্থলের রাস্তা ছোট হয়ে যেত। দ্বিতীয় লাভ হতো, পথিমধ্যে শত্রুদের আক্রমণের সম্ভাবনা থাকত না। শত্রুরা হামলা করলেও ইসলামী বাহিনী তৎক্ষণাৎ এলাকার উঁচু-নীচু স্থানে আত্মগোপন করত। শত্রুরা এমন স্থানে লড়াই করার সাহস করত না।

✪

৬৩৪ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসের শেষের দিকে হযরত খালিদ (রা.)-এর বাহিনী এমনিভাবে আজনাদাইনের উদ্দেশে চলছিল। প্রথমেই বলা হয়েছে যে, মদীনার বাহিনীর চারটি অংশ বিভিন্ন স্থানে ছিল। হযরত খালিদ (রা.) তাদের সালারদের উদ্দেশে বার্তা পাঠান যে, তারা যেন সকলে আজনাদাইনে পৌঁছে যায়।

হযরত খালিদ (রা.) বসরা জয় করে নিয়েছিলেন। রোমীয় ও গাসসানীদের জন্য এই চোট মামুলি ছিল না। বসরা সিরিয়ার বড় একটি শহর ছিল। হযরত খালিদ (রা.) তাদের সালারদের উদ্দেশে বার্তা পাঠান যে, তারা যেন সকলে আজনাদাইনে পৌঁছে যায়।

রোমীয়দের সবচেয়ে বড় ক্ষতি এই হয়েছিল যে, সাধারণ জনতা ও তাদের সৈন্যদের মাঝে মুসলমানদের ব্যাপারে চাপা ভীতি সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল। মুসলিম বাহিনী বসরা পর্যন্ত শুধু বিজয়ীই হয়েছিল, কোথাও পরাজিত হয়নি। কোথাও এক সালারকে পিছপা করা হলে তৎক্ষণাৎ অন্য সালার এসে আসন্ন পরাজয়কে জয়ে বদলে দিয়েছে। এতে করে রোম সম্রাট কায়সারের ঘুম হারাম হয়ে গিয়েছিল। হযরত খালিদ (রা.) যখন বসরা অবরোধ করে রাখেন এবং উদ্ভূত পরিস্থিতি সুস্পষ্ট বলছিল যে, বসরা রোমীয়দের হাত ফসকে যাওয়ার উপক্রম, তখন রোম সম্রাট হিমসের গভর্নর দিরওয়ানের বরাবর একটি বার্তা পাঠিয়েছিলেন।

"তোমরা মদে ডুবে গেছ নাকি তোমরা ঐ মহিলাদের মত হয়ে গিয়েছ যাদের সঙ্গে তোমাদের রাতযাপন হয়?" সম্রাট আরও লিখেন–"আর এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, তোমাদের দিন ঘুমে কাটছে। ঐ মুসলমানদের কাছে এমন কী আছে যা তোমাদের কাছে নেই? যদি আমি বলি যে, রোম সম্রাটের অপমানের জন্য দায়ী তোমাদের মত গভর্নররা তাহলে তোমরা কী জবাব দিবে? হয়ত তোমরা এটাও ভাবছ না যে, মুসলমানদের এভাবে দ্রুত অগ্রযাত্রা এবং বিজয়ের পর বিজয় অর্জন করা কীভাবে রোধ করা যেতে পারে। তবে কি তোমাদের তরবারি জং খেয়ে ফেলেছে? তোমাদের ঘোড়া মরে গেছে? জনতাকে তোমরা কেন বলছ না যে, মুসলমানরা তোমাদের মালামাল লুটে নিবে। তোমাদের স্ত্রী, মেয়ে ও বোনদেরকে তারা হরণ করে নিয়ে যাবে! ... আমাকে

জানানো হয়েছে যে, মুসলমানদের সংখ্যা ৩০ হাজার হতে কিছু কম বা বেশি। তোমরা বেশির থেকে বেশি সৈন্য সমবেত কর এবং আজনাদাইন এলাকায় পৌঁছে যাও। রণাঙ্গনকে এত ছড়িয়ে দাও যে, মুসলমানরাও যাতে তোমাদের দেখে ছড়িয়ে পড়ে। তখন তাদের অবস্থা কাঁচা সূতার মত হয়ে যাবে। ... তাদেরকে নিজেদের সংখ্যাধিক্যে গিলে ফেল। তাদেরকে তোমাদের সংখ্যায় হারিয়ে ফেল।"

রোমীয়দের শাহী দরবারে হৈ চৈ শুরু হয়ে গিয়েছিল। রোমীয় ও ঈসায়ীদের ইবাদত খানায় পাদ্রী ও পুরোহিতরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে অগ্নিঝরা বক্তব্য দিত। তারা বক্তৃতায় বলত, ইসলাম তাদের ধর্মমতকে চিরদিনের জন্য খতম করে দিবে এবং তাদেরকে জোরপূর্বক ইসলাম কবুল করতে হবে। আর এটা এমন ভয়ানক গুনাহ যার শাস্তি বড়ই মর্মন্তুদ হবে।

রোমীয় সৈন্যরা একটি সুশৃঙ্খল বাহিনী ছিল। তাদের কাছে ঘোড়া বেশি ছিল এবং তাদের গাড়ীও ছিল, যা ঘোড়া ও গরু টেনে নিয়ে যেত। রসদের ব্যবস্থাপনা ছিল উন্নত। ইবাদতখানায় পাদ্রীদের বক্তব্য শুনে মানুষ ফৌজে শামিল হতে থাকে। এভাবে সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। হিমসের গভর্নর দিরওয়ান যখন স্বসৈন্যে আজনাদাইন রওনা হয় তখন সৈন্যসংখ্যা ৯০ হাজার ছিল।

মুসলমানদের গোয়েন্দারা এই বাহিনীকে আজনাদাইন এলাকায় তাঁবুতে অবস্থানরত দেখেছিল। এত বিশাল এবং সুশৃঙ্খল বাহিনীর মোকাবেলার জন্য যাওয়াটাই বিরাট দুঃসাহসিকতা ছিল। যুদ্ধ তো থাকল পরের কথা।

✪

৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ জুলাই হযরত খালিদ (রা.) স্বসৈন্যে আজনাদাইন পৌঁছেন। তিনি বায়তুল মাকদিসের দক্ষিণে পাহাড়ী এলাকা হয়ে এসেছিলেন। এই পাহাড়সমূহের এক প্রান্তে প্রশস্ত ময়দান ছিল। হযরত খালিদ (রা.) সেখানে অবস্থানের নির্দেশ দেন। এর প্রায় এক মাইল দূরে রোমীয় সৈন্যরা তাঁবু স্থাপন করেছিল। রোমীয় বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন দিরওয়ান এবং সালার ছিলেন কুবকুলার। রোমীয় সৈন্যরা ছিল মানব সমুদ্রের মত। এর বিপরীতে মুসলিম বাহিনী ছিল ছোট্ট নদীর মত।

মুসলিম বাহিনীর যেসব সৈন্য অন্যান্য স্থানে ছিল তারাও ইতোমধ্যে আজনাদাইনে চলে আসে। এতে করে মুসলমানদের সর্বমোট সংখ্যা দাঁড়ায় ৩২ হাজার। এক মাইল তেমন কোনো দূরত্ব ছিল না। মুসলমানরা উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে রোমীয়দের তাঁবুর দিকে তাকাচ্ছিল। তাদের দৃষ্টি সীমা পর্যন্ত শুধু মানুষ আর ঘোড়া ছিল। দুই-তিন দিন পর হযরত খালিদ (রা.)-কে জানানো হয় যে, মুসলিম বাহিনীর মাঝে কিছুটা ভীতির ভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে।

ঐতিহাসিকগণ লিখেন, হযরত খালিদ (রা.)-এর সঙ্গে যে নয় হাজার সৈন্য ছিল তাদের মধ্যে বিন্দুমাত্র ভয় বা ভীতি ছিল না। কেননা, তারা ঈসায়ী, গাসসানী ও রোমীয়দের বিরুদ্ধে লাগাতার লড়ে আসছিল। তারা রোমীয়দের সংখ্যাধিক্য দেখে ভড়কে যায়নি। অন্যান্য বাহিনীর মনোবল বৃদ্ধির জন্য হযরত খালিদ (রা.) ক্যাম্পে সৈন্যদের মাঝে ঘুরতে থাকেন। তিনি যেখানে দাঁড়াতেন তার চারপাশে মুজাহিদরা এসে জমা হতো। হযরত খালিদ (রা.) সবস্থানে একই কথা বলেন।

"ইসলামের সৈনিকরা, আমি জানি তোমরা একসঙ্গে এত সৈন্য ইতোপূর্বে দেখনি। কিন্তু তোমরা ইতোপূর্বে এমন বড় বাহিনীকে পরাস্ত করেছ। খোদার কসম! তোমরা ভীত হয়ে পড়লে হেরে যাবে। যদি তোমরা এদের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করতে পার তাহলে রোমীয়রা চিরতরে শেষ হয়ে যাবে। আল্লাহর নামে লড়াই করবে। ইসলামের জন্য যুদ্ধ করবে। যদি তোমরা রণে ভঙ্গ দাও তাহলে দোযখের আগুনে জ্বলবে। লড়াই শুরু হয়ে গেলে নিজ নিজ যুদ্ধসারি ঠিক রাখবে। সারিতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে দিবে না। রণাঙ্গনে পা দৃঢ় রাখবে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমার পক্ষ হতে নির্দেশ না পাবে পিছুও হটবে না আর হামলাও করবে না। ... আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে আছেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র রূহ তোমাদের দেখছেন।"

ওদিকে রোমীয়দের সালার দিরওয়ান তার কমাণ্ডারদের বলছিল ঃ

"রোমীয়গণ শোনো! রোমসম্রাট কায়সারকে অপমানের হাত থেকে বাঁচানো তোমাদের দায়িত্ব। রোম সম্রাটের তোমাদের উপর আস্থা আছে। যদি তোমরা আরব মুসলমানদের চূড়ান্তভাবে পরাজিত না করতে পার, তাহলে তারা চিরদিনের জন্য তোমাদের উপর প্রবল হয়ে যাবে। তারা তোমাদের স্ত্রী, কন্যা ও বোনদের ইজ্জত লুণ্ঠন করবে। নিজেদের বিক্ষিপ্ত হতে দিবে না। ক্রুশের সাহায্য চাও। বিজয় তোমাদেরই হবে। মুসলমানদের সংখ্যা খুবই কম। তাদের একজনের মোকাবেলায় তোমরা তিনজন হবে।"

আরও দু'-তিন দিন চলে যায়। হযরত খালিদ (রা.) শত্রুপক্ষের সঠিক সংখ্যা এবং অবস্থা জানতে চাচ্ছিলেন। তিনি এর জন্য যে কোনো গোয়েন্দা পাঠাতে পারতেন। কিন্তু তার যে ধরনের তথ্যের প্রয়োজন ছিল তার জন্য অবশ্যই একজন চৌকস ও বাহাদুর গোয়েন্দার প্রয়োজন ছিল। তিনি তার সালারদের বলেন যে, তারা যেন এমন একজন লোকের সন্ধান দেন।

"ইবনে ওলীদ!" সালার জাররার বিন আযওয়ার বলেন–"আমি কি এ কাজটি করতে পারব না? খোদার কসম আমার থেকে ভাল এই কাজ কেউ করতে পারবে না।"

জাররার সেই সালার ছিলেন, যিনি বসরার যুদ্ধে নিজের বর্মই শুধু খুলে ছিলেন না; বরং জামাও খুলে ফেলে কোমর পর্যন্ত শরীর নগ্ন করে ফেলেছিলেন এবং এমন জযবার সঙ্গে লড়েছিলেন যে, সমস্ত সৈন্যের মধ্যে তার জযবা অনেকগুণ শক্তি বৃদ্ধি করেছিল।

"হা, ইবনুল আযওয়ার!" হযরত খালিদ (রা.) বলেন–"তুমি ছাড়া এ কাজ আর কেউ করতে পারবে না। তুমিই ভাল করে জান যে, সেখানে তোমার দেখার কী কী আছে।"

জাররার জামা খুলে ছুঁড়ে ফেলেন এবং কোমর পর্যন্ত নগ্ন হয়ে যান। তিনি অশ্বপৃষ্ঠে চেপে বসেন। তার এ অবস্থা দেখে হযরত খালিদ (রা.) সহ অন্যান্য সালাররা হেসে ওঠেন।

"খোদা হাফেজ আমার বন্ধুগণ!" জাররার মৃদুভাবে ঘোড়া ছুটিয়ে বলেন।

"আল্লাহ তোমাকে নিরাপদ রাখুন ইবনুল আযওয়ার!"–হযরত খালিদ (রা.) বলেন।

রোমীয়দের অবস্থানস্থলের নিকটেই একটি উচুঁ পর্বতশৃঙ্গ ছিল। জাররার নিচে ঘোড়া রেখে পর্বতশৃঙ্গে উঠেন। মুসলমান আর রোমীয়দের তাঁবুর মাঝে এক মাইল এলাকা ফাঁকা ছিল। দুই বাহিনীর প্রহরীরা এই এলাকায় টহল দিয়ে ফিরছিল। প্রহরীরা ছিল সবাই অশ্বারোহী।

রোমীয় সেন্ট্রিরা জাররারকে দেখতে পাওয়ার অবস্থায় ছিল না। জাররার সেন্ট্রিদের চোখ ফাঁকি দিয়ে পর্বতশৃঙ্গে উঠে পড়েন। অপর পার্শ্বের সেন্ট্রিরা তাকে

দেখে ফেলে। জাররার দ্রুত নিচে আসেন এবং ঘোড়ায় চেপে বসেন। তাকে ধরার জন্য রোমীয় অশ্বারোহীরা পর্বত শৃঙ্গের উভয় দিক থেকে আসে। তাদের সংখ্যা ঐতিহাসিকদের মতে ৩০ জন ছিল। জাররার ঘোড়ায় পদাঘাত করেন কিন্তু ঘোড়াকে দ্রুত চালান না।

রোমীয় অশ্বারোহীরা ঘোড়া দ্রুত চালায় না। তারা এই ধারণায় সতর্কতা অবলম্বন করে যে, হয়ত আশেপাশে মুসলিম সেন্ট্রিরা থাকবে। তারপরও রোমীয় সওয়াররা জাররারের পশ্চাদ্ধাবন অব্যাহত রাখে। জাররার সাধারণ গতিতে চলছিলেন। রোমীয় অশ্বারোহীরা তাকে ঘিরে ফেলতে চারদিকে ছড়িয়ে যায় এবং তারা পরস্পর হতে পৃথক হতে থাকে।

জাররার তাদের বিক্ষিপ্ত হওয়ারই অপেক্ষা করছিলেন। তাঁর কাছে বর্শা ছিল। মুসলিম শিবির কাছাকাছি এসে গিয়েছিল। হঠাৎ জাররার দ্রুত গতিতে ঘোড়াকে পেছনে সরিয়ে আসেন এবং ঘোড়ায় পদাঘাত করেন। তার লক্ষ্য ঐ রোমীয় অশ্বারোহীর প্রতি ছিল, যে তার কাছাকাছি ছিল। তিনি ঐ রোমীয় অশ্বারোহীর কাছে পৌঁছেই বর্শা দ্বারা তাকে আঘাত করেন। আঘাত ছিল জোরদার। রোমীয় আকস্মিক আক্রমণ সামলাতে পারে না। জাররারের আক্রমণ অপ্রত্যাশিত ছিল। বর্শার আঘাতে ঘোড় সওয়ার মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

অপর রোমীয় অশ্বারোহী কিছু বুঝে ওঠার আগেই জাররার তার পার্শ্বদেশে বর্শা ছুঁড়ে মারে। বর্শা তার পার্শ্বদেশে ঢুকে যায়। ইতিমধ্যে তৃতীয় অশ্বারোহী জাররারের পানে এগিয়ে এলে জাররারের বর্শা তাকেও এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেয়। মুসলমানদের শিবির কাছাকাছিই ছিল, তারপরও রোমীয়রা জাররারকে ঘেরাও করার চেষ্টা করছিল। জাররার ছিলেন নামকরা অশ্বারোহী। তিনি রোমীয়দের আয়ত্তে আসছিলেন না। রোমীয়দের সংখ্যা ছিল ২৭ জন। জাররার পালিয়ে যাবার পরিবর্তে তাদের ঘেরাওয়ের মাঝে থেকেই বারবার প্রান্ত বদল করছিলেন। তার বর্শার একটি আঘাতও ব্যর্থ হয় না।

ওকিদী এবং তবারী লিখেন, জাররার বর্শার পশাপাশি তলোয়ারও ব্যবহার করেছিলেন। তাদের লিখিত তথ্য অনুযায়ী ৩০ জনের মধ্যে হতে ১৯ জন রোমীয় অশ্বারোহীকে হত্যা করেছিলেন। জাররারকে পাকড়াওয়ের আওতায় আনতে চেষ্টারত রোমীয়রা মুসলমানদের তাঁবুর আরও নিকটে চলে গিয়েছিল। এতে অনেক মুসলমান জাররারকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসার প্রস্তুতি নেয়। রোমীয়রা ধৃত হওয়ার আশঙ্কা শেষ মুহূর্তে অনুমান করে ফেলে এবং জাররারকে ছেড়ে পালিয়ে যায়।

জাররার যখন তাঁবুতে পৌঁছেন তখন মুজাহিদরা ব্যাপক শ্লোগান দিয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানায়। কিন্তু জাররার হযরত খালিদ (রা.) এর সামনে গেলে খালেদ (রা.)-এর চেহারায় নারাজির ভাব ফুটে উঠল।

আমি তোমাকে কি কাজে পাঠিয়েছিলাম?" হযরত খালিদ (রা.) অসন্তোষের ভঙ্গিতে বলেন। "আর তুমি শত্রুদের সঙ্গে লড়াই শুরু করেছ। তুমি কি স্বীয় দায়িত্বের ব্যাপারে বে-ইনসাফী করনি?

"ইবনে ওলীদ!" জাররার বিন আযওয়ার বলেন। "খোদার কসম! যদি আপনার নির্দেশ এবং অসন্তুষ্টির খেয়াল আমার না থাকত, তাহলে যে রোমীয়রা প্রাণ নিয়ে চলে গেছে তারাও ফিরে যেতে পারত না। তারা আমাকে ঘিরে ফেলেছিল। বাধ্য হয়ে আমাকে অস্ত্র হাতে তুলে নিতে হয়।"

এরপরে হযরত খালিদ (রা.) আর কাউকে রোমীয় শিবিরে গোয়েন্দাগিরি করার জন্য পাঠাননি।

✪

আরও তিন-চার দিন চলে যায়। হযরত খালিদ (রা.)-এর বাহিনী বিশ্রাম করে নেয়। কিন্তু হযরত খালিদ (রা.) দিন-রাত জেগে থাকতেন, চিন্তা-ভাবনা করতেন এবং তাঁবুতে পায়চারী করতেন। নিজেদের থেকে তিনগুণ বেশি শক্তিধর শত্রুকে পরাজিত করা তো অনেক দূরের কথা, তাদের সঙ্গে মোকাবেলায় নামাটাও বড় বাহাদুরী ছিল। কিন্তু হযরত খালিদ (রা.) বিজয় ছাড়া অন্য কিছু ভাবতেন না। তিনি প্রতিদিন সন্ধ্যায় সালার ও কমান্ডারদের ডেকে তাদের থেকে পরামর্শ নিতেন এবং তাদের বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা দিতেন।

রোমীয় ক্যাম্পে কিছুটা অন্যরকম অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল। তাদের সালার কুবকুলার মনোবল ভেঙ্গে পড়েছিল। অনেক ঐতিহাসিক, বিশেষত ওকিদী এই ঘটনা বিস্তারিতভাবে লিখেছেন।

"আমি বড়ই ভাগ্যবান হতাম যদি আমি মুসলিম বাহিনী হতে দূরে থাকতাম" সালার কুবকুলার তার সর্বাধিনায়ক দিরওয়ানকে বলে। "আমার এমন মনে হচ্ছে যে, এ যুদ্ধে তারা আমাদের বিরুদ্ধে জয়ী হবে।"

"এমন অনর্থক কথা আজ প্রথমবারের মত আমি শুনলাম"। দিরওয়ান বলে– "কখনো এক ব্যক্তি কি তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়েছে?"

"এমন কয়েকবারই হয়েছে" কুবকুলার বলে।

"হাঁ, এমনটি কয়েকবার হয়েছে" দিরওয়ান বলে। "আর তারা তোমার মত তিন ব্যক্তি ছিল, যারা রণাঙ্গনে নামার আগেই মনোবল হারিয়ে ফেলেছিল।"

"সে কি একজন ছিল না, যে আমাদের ৩০ জন অশ্বারোহীর মধ্য হতে ১৯ জনকে মেরে ফেলেছে?" কুবকুলার বলে। "৩০ জন অশ্বারোহী একজনকে কাবু করতে পারেনি!"

"তারা ছিল ভীতু, কাপুরুষ" দিরওয়ান বলে "আর তুমি হলে সালার। তুমি এটাও ভুলে গেছ যে, রণাঙ্গনে কাপুরুষের সাজা হল মৃত্যুদণ্ড। ... তবে তার আগে আমাকে বল যে, তোমার হলটা কী? তুমি কি মুসলমানদের জাদুর শিকার হয়েছ?"

"যখন থেকে একজন মুসলমান আমাদের ৩০ জন লোকের মোকাবেলা করেছে এবং তাদের মধ্যে ১৯ জন একজনের হাতে মারা গেছে, তখন থেকে আমি চিন্তায় ডুবে গেছি যে, একজনের মাঝে এত শক্তি কোথা হতে আসে?" সালার কুবকুলার বলে "আমি এক আরব ঈসায়ীকে মুসলমানদের ক্যাম্পে পাঠিয়েছিলাম। সে তিন-চারদিন মুসলিম রূপে তাদের তাঁবুতে থাকে। কাল সে ফিরে এসেছে। সে যা কিছু বলেছে, তা থেকে আমি বুঝেছি যে, তাদের শক্তির উৎস কোথায় এবং কী?"

"সে কী বলেছে?" দিরওয়ান জিজ্ঞাসা করে।

"আমি তাকে সঙ্গে করে এনেছি" কুবকুলার বলে "পুরো বৃত্তান্ত তার মুখ থেকে শুনুন।"

গোয়েন্দাকে ডাকা হয়। দিরওয়ান তাকে জিজ্ঞাসা করে যে, মুসলিম শিবিরে সে কী দেখেছে।"

"সর্বাধিনায়কের মর্যাদা রোম সম্রাটের মত" গোয়েন্দা শ্রদ্ধার সঙ্গে বলে। "আমি তাদের তাঁবুতে আজব লোক দেখেছি। যারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে পরিচয় দেয় তারা আমাদের মত নয়।"

"তুমি এত দিন তাদের মাঝে কীভাবে থাকলে?" দিরওয়ান জানতে চায় "তোমাকে কেউ সন্দেহ করেনি?"

"আমি তাদের ভাষায় কথা বলতে পারি" গোয়েন্দা জবাবে বলে "তাদের নিয়ম-কানুন জানি। তাদের ধর্মমত ও ইবাদাত-পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত। তারা নিজেদের ফৌজে আপনাদের মত ভর্তি করে না। যে কেউ তাদের ফৌজে শামিল হতে চাইলে নিজস্ব অস্ত্র ও ঘোড়া নিয়ে শামিল হয়ে যায়। আমি মুসলমানরূপে তাদের ফৌজে শামিল হয়ে গিয়েছিলাম। ...

"আমি ঐ মুসলমানদের মাঝে কিছু নতুন রীতি-নীতি দেখেছি। রাতে তারা ইবাদাত বন্দেগী করে আর দিনের বেলায় এমন যোদ্ধা হয়, যেন তারা লড়াই করা ও মরা ছাড়া কিছুই জানে না, বুঝে না। নিজেদের আকীদা-বিশ্বাস সংরক্ষণ এবং তার প্রচার-প্রসারের জন্য লড়াই করা এবং জীবন কোরবান করাকে তারা নিজেদের ঈমানী দায়িত্ব বলে মনে করে। তাদের প্রত্যেক সৈন্য এমনভাবে কথা বলে, যেন সে কোনো সালারের নির্দেশে নয়; বরং নিজস্ব স্বার্থে লড়াই করতে এসেছে। তারা সকলে এক পর্যায়ের। পোশাক দেখে সালার ও সৈনিকের পার্থক্য বুঝা যায় না। ...

"আমি তাদের মাঝে সমতার পাশাপাশি ইনসাফও দেখেছি। যদি তাদের শাসক কিংবা আমীরের ছেলেও চুরি করে, তাহলে তারও হাত কাটা হয়। যদি কেউ কোনো মহিলার সঙ্গে যিনা-ব্যভিচার করতে গিয়ে ধরা পড়ে তাহলে তাকে জনসমুক্ষে দাঁড় করিয়ে পাথর মারতে মারতে মেরে ফেলা হয়। তারা এত শান্ত, যেন তাদের কোনো উদ্বেগ ও টেনশন নেই। ...

"জনাব যদি আমাকে মাফ করেন তাহলে আরও বলব ... আমাদের সৈন্যদের মাঝে সেই গুণ-বৈশিষ্ট্য নেই, যা আমি মুসলমানদের মধ্যে দেখে এসেছি। মুসলমানদের কোনো বাদশা নেই। আমাদের সৈন্যরা বাদশার নির্দেশে লড়ে। তারা যখন দেখে যে, বাদশা তাদের দেখছে না, তখন তারা জান বাঁচানোর জন্য চেষ্টা করে। মুসলমানরা এক আল্লাহকে একমাত্র বাদশা বলে মনে করে এবং বলে যে, আল্লাহ সর্বস্থানে বিদ্যমান এবং তিনি সবসময় আমাদের দেখেন।"

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আল্লামা তবারী (রহ.) লিখেন, গোয়েন্দার কথা শুনে সালার কুবকুলার বিড়বিড়িয়ে বলে "আমার মনে চায় যে, আমি ঐ জমিনের নিচে চলে যাই, যে জমিনের উপরে মুসলমানদের সঙ্গে মোকাবেলা হবে। হায়, আমি যদি তাদের নিকটে না যেতাম! আল্লাহ তাদের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য না করুন এবং না আমার বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করুন।"

দিরওয়ান কুবকুলারকে বলেন যে, তাকে অবশ্যই লড়াই করতে হবে। কিন্তু কুবকুলারের লড়াই করার জযবা হারিয়ে গিয়েছিল।

✪

১৩ হিজরীর ২৭ জুমাদাল উলা মোতাবেক ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জুলাই সন্ধ্যায় হযরত খালিদ (রা.) তার সালারদের সর্বশেষ দিক-নির্দেশনা দেন এবং স্বীয় বাহিনীকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করেন।

পরের দিন মুজাহিদরা প্রতিদিনের মত ফজরের নামায জামাতের সঙ্গে আদায় করে। নামায শেষে সকলে কেঁদে কেঁদে মন খুলে দোয়া করে। তাদের মধ্যে অনেকের জন্য এটাই ছিল শেষ নামায। নামায শেষেই তাদের ঐ স্থানে চলে যাবার কথা ছিল, যা তাদের জন্য পূর্ব রাতে ঠিক করে দেয়া হয়েছিল।

সূর্য ওঠার আগেই খালিদ বাহিনী নিজ নিজ স্থানে পৌঁছে গিয়েছিল। রোমীয়রা চিন্তা করেছিল যে, তারা সংখ্যাধিক্যের কারণে নিজেদেরকে এতদূরে ছড়িয়ে দিবে, যাতে তাদের দেখাদেখি মুসলমানরাও ছড়িয়ে দিতে বাধ্য হয়। আর তখন তাদের কাতারে ফাঁকা স্থান সৃষ্টি হবে। কিন্তু হযরত খালিদ (রা.) সংখ্যার স্বল্পতা সত্ত্বেও রণাঙ্গন ৫ মাইলে বিস্তৃত করেন। এতে করে এই শঙ্কার অপনোদন হয় যে, রোমীয়রা মুসলমানদের পশ্চাতে গিয়ে পশ্চাৎ হতে আক্রমণ করবে।

হযরত খালিদ (রা.) বিজ্ঞোচিত দ্বিতীয় কাজ এই করেন যে, স্বীয় বাহিনীর মুখ পশ্চিমমুখী রাখেন; যাতে সূর্য থাকে তাদের পেছনে আর রোমীয়দের সামনে। এতে করে রোমীয়দের চোখে সূর্যের আলো পড়ার কারণে তারা চোখ ঠিকমত খুলতে পারবে না।

চিরায়ত নিয়মানুযায়ী হযরত খালিদ (রা.) তাঁর বাহিনীকে তিন অংশে বিভক্ত করেন। এক পার্শ্ব বাহিনীর সালার ছিলেন সাঈদ বিন আমের। দ্বিতীয় পার্শ্ব বাহিনীর সালার হন আমীরুল মুমিনীনের ছেলে হযরত আব্দুর রহমান (রা.)। মধ্যম বাহিনীর কমান্ডার ছিলেন হযরত মুআজ বিন জাবাল (রা.)। হযরত খালিদ (রা.) উভয় পার্শ্ব বাহিনীর হেফাজত অথবা সংকটকালে তাদের সাহায্যে পৌঁছার এই ব্যবস্থা করেছিলেন যে, প্রত্যেক বাহিনীর সামনে আরেকটি ইউনিট দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন।

হযরত ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ান যে চার হাজার সৈন্যের সালার ছিলেন, হযরত খালিদ (রা.) তাদেরকে মধ্যম বাহিনীর পেছনে সংরক্ষিত রেখেছিলেন। সেখানে এই সৈন্যের প্রয়োজন এ কারণেও ছিল যে, তথায় মহিলা ও বাচ্চারা ছিল।

হযরত খালিদ (রা.) সালারের মর্যদাসম্পন্ন কিছু লোককে নিজের সঙ্গে রেখেছিলেন। উদ্দেশ্য এই ছিল যে, কোনো স্থানে সালারের প্রয়োজন দেখা দিলেই সেখানে তাদের একজনকে পাঠিয়ে দিবেন। তারা ছিলেন উল্লেখযোগ্য ও অভিজ্ঞ চারজন সালার। (১) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) (২) হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) (৩) হযরত জাররার বিন আযওয়ার (৪) রাফে ইবনে উমাইরা।

সূর্য উদিত হলে রোমীয় সেন্ট্রিরা তাদের সালারদের জানায় যে, মুসলমানরা যুদ্ধ বিন্যাসে প্রস্তুত হয়ে গেছে। এ সংবাদে রোমীয়দের মাঝে হৈচৈ পড়ে যায়। তাদের এই আশংকা অমূলক ছিল যে, মুসলমানরা তাদেরকে প্রস্তুতি নেয়ার সুযোগ দিবে না। রোমীয় সালাররা দ্রুত সৈন্যদের প্রস্তুত করে মুসলমানদের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দেয়। উভয় বাহিনীর মাঝে ব্যবধান ছিল মাত্র ৮৮০ গজের মত।

হযরত খালিদ (রা.) তাঁর রণাঙ্গন ৫ মাইলের মত লম্বা করে দিয়েছিলেন। রোমীয়রা তাদের রণাঙ্গন আরও বিস্তৃত করতে পারত কিন্তু তারা তাদের রণাঙ্গন প্রায় ততটুকু দীর্ঘ রেখেছিল যতটুকু হযরত খালিদ (রা.) রেখেছিলেন। এতে হযরত খালিদ (রা.)-এর পেরেশানি দূর হয়ে যায় যে, রোমীয় সৈন্যরা ঘুরে মুসলমানদের পশ্চাতে গিয়ে আক্রমণ করতে পারে। তবে রোমীয় সৈন্যদের গভীরতা বেশি; বরং অনেক বেশি ছিল। এক প্লাটুন সৈন্যের পিছনে আরেক প্লাটুন, তার পিছে আরেক প্লাটুন ছিল। মুসলমানদের জন্য এই মানব প্রাচীর ভাঙ্গা এক প্রকার দুঃসাধ্যই ছিল।

ঐতিহাসিক লিখেন, রোমীয়দের সৈন্যরা যখন সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায় তখন তা দর্শকদের জন্য ভীতিকর ছিল। ছোট-বড় অনেক ক্রুশ সৈন্যদের মাঝে একটু পরপর উঁচু হয়ে ছিল। কয়েক ধরনের ঝাণ্ডা উপরে পতপত করে উড়ছিল। তাদের মোকাবেলায় মুসলমানদের সৈন্য ছিল একান্তই কম এবং অত্যন্ত সাদামাটা।

রোমীয়দের সর্বাধিনায়ক দিরওয়ান এবং সালার কুবকুলার স্বীয় বাহিনীর মধ্যম ভাগের সামনে ঘোড়ায় চেপে দাঁড়িয়েছিল। তাদের সঙ্গে এক দল বডিগার্ড ছিল, বেশভূষার দিক দিয়ে তারা ছিল বড়ই অভিজাত ও বিশিষ্ট শ্রেণীর।

✪

রোমীয়দের সংখ্যা এবং তাদের বাহ্যিক প্রভাব-প্রতাপ দেখে হযরত খালিদ (রা.) অনুভব করেন যে, হয়তবা এতে তার মুজাহিদদের মাঝে এমন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে যে, তাদের জযবা কিছুটা হ্রাস পাবে। সম্ভবত এ কারণে হযরত খালিদ (রা.) তার ঘোড়ায় পদাঘাত করেন এবং ঘোড়াকে তার বাহিনীর এক সাইডে নিয়ে যান। এই প্রথম রণাঙ্গন ছিল। যেখানে তিনি স্বীয় বাহিনীকে ৫ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিলেন। তিনি ঘোড়াকে তার একদল সৈন্যের সামনে গিয়ে থামান।

"স্মরণ রাখবে যে, তোমরা আল্লাহর জন্য লড়তে এসেছ, যিনি তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন" হযরত খালিদ (রা.) উচ্চ আওয়াজে বলেন "আল্লাহ অন্য কোনোভাবেও তোমাদের প্রদত্ত জীবন তোমাদের থেকে ফিরিয়ে নিতে পারেন। আল্লাহপাক তোমাদের সঙ্গে একটি যোগসূত্র স্থাপন করে রেখেছেন। এটা কি ভাল হয় না যে, জান যখন যাবেই তখন তোমরা তা আল্লাহর জন্য কুরবান করে দিবে? আল্লাহ এর প্রতিদান দিবেন। এমনটি ইতোপূর্বেও হয়েছে যে, তোমরা সংখ্যায় ছিলে অল্প আর তোমাদের মোকাবেলা ঐ দুশমনের সঙ্গে হয়েছে যারা তোমাদের থেকে দ্বিগুণ কিংবা তিন গুণ ছিল। কিন্তু তারা তোমাদের হাতে পিটুনি খেয়ে এমনভাবে পলায়ন করেছে, যেমনটি ছাগল বাঘ দেখে এবং শিয়াল কুকুর দেখে ভাগে। ... রোমীয়দের বাহ্যিক শান-শওকত দেখো না। প্রকৃত শান-শওকতের অধিকারী তো ঈমানওয়ালারা। শান-শওকত তাদের মানায় যাদের সঙ্গে আল্লাহ থাকেন। আর আল্লাহ তোমাদের সঙ্গেই আছে। আজ তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের রূহকে দেখিয়ে দাও যে, তোমরা বাতিলের পাহাড় চূর্ণ-বিচূর্ণকারী।"

এসব ছিল উৎসাহ ও প্রেরণাদায়ক কথা, যা হযরত খালিদ (রা.) বলেন এবং এর প্রতিক্রিয়া তেমনই হয় যেমনটি হওয়ার কথা ছিল। হযরত খালিদ (রা.)-এর পাশাপাশি কিছু দিকনির্দেশনামূলক কথাও বলেন। ঐতিহাসিকগণ তার বিবরণ এভাবে তুলে ধরেছেন ঃ

"যখন অগ্রে বেড়ে হামলা করবে তখন সম্মিলিতভাবে চাপ প্রয়োগ করবে, যেন একটি দেয়াল এগিয়ে আসছে। যখন তীর মারবে তখন সকলের তীর যেন একসঙ্গে ধনুক থেকে বের হয়। তীর মারবে ঝাঁকে ঝাঁকে। শত্রুদের নিজেদের সঙ্গে খড়-কুটোর মত ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।"

হযরত খালিদ সমস্ত ইউনিটের সামনে গিয়ে থামেন এবং সবাইকে উক্ত কথাগুলো বলেন। এরপর তিনি পশ্চাতে থাকা নারীদের কাছে যান।

"তোমরা দোয়া করতে থাকবে স্বামীদের জন্য, ভাইদের জন্য এবং পিতাদের জন্য"-হযরত খালিদ (রা.) মহিলাদের নিকট গিয়ে বলেন "তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে, দুশমনের সংখ্যা কত বেশি এবং তাদের তুলনায় আমরা কত কম। এমন হতে পারে যে, দুশমন আমাদের সারি ভেদ করে পশ্চাতে চলে আসবে। খোদার কসম! আমার আশা যে, তখন তোমরা নিজেদের ইজ্জত ও জান বাঁচাতে পুরুষদের মত অস্ত্র হাতে তুলে নিবে। আমরা তাদেরকে যথাসম্ভব তোমাদের পর্যন্ত পৌঁছতে দিব না। কিন্তু অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু ঘটে যেতে পারে। তাই তোমাদের সাবধান ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করলাম।"

"ওলীদের পুত্র!" এক মহিলা বলে "আপনি আমাদের সামনে অগ্রসর হয়ে যুদ্ধ করার অনুমতি দিচ্ছেন না?"

"পুরুষরা জীবিত থাকতে তোমরা মহিলারা কেন লড়বে?" হযরত খালিদ (রা.) বলেন "আর আত্মরক্ষার জন্য লড়াই করা তোমাদের উপর ফরজ। তোমাদের উপর আরও ফরজ হলো, যদি এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যে, পুরুষরা সংখ্যায় স্বল্প হয়ে পড়ে আর ওদিকে দুশমন জয়ী হওয়ার উপক্রম হয়, তখন তোমরা সম্মুখপানে অগ্রসর হবে এবং পুরুষদের মত লড়বে। বসে থেকে জান বাঁচিয়ে অন্য জাতির গোলামী করবে না।"

এটাই ছিল সর্বপ্রথম ঘটনা যে, হযরত খালিদ (রা.) মহিলাদেরকেও দুশমন সম্পর্কে সতর্ক ও সচেতন করেন এবং তাদেরকে আত্মরক্ষায় লড়াই করতে প্রস্তুত রাখেন। এর থেকে বুঝা যায় যে, এ যুদ্ধে তার মনেও কিছুটা হলেও উদ্বেগ ছিল। তিনি কিসরার বাহিনীকে একের পর এক পরাজিত করেছিলেন। কিন্তু রোমীয়রা পারসিকদের তুলনায় অধিক সুশৃঙ্খল এবং শক্তিধর ছিল। হযরত খালিদ (রা.)-এর সামনে অবশ্যই এ দিকটাও ছিল যে, মুজাহিদরা অনেক দিন হল

ঘর-বাড়ি ছেড়ে এসেছে এবং তারা ধারাবাহিক লড়াই করে করে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। আল্লাহর প্রতি এবং আল্লাহর দেয়া রুহানী শক্তির প্রতি তাদের আস্থা ছিল প্রগাঢ়।

উভয় বাহিনী লড়াই করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়।

✪

রোমীয়দের পক্ষ থেকে এক বয়োবৃদ্ধ পাদ্রী সামনে আসেন এবং মুসলমানদের থেকে কিছুটা দূরে এসে থামেন।

"মুসলমানগণ!" পাদ্রী উচ্চকণ্ঠে বলেন "তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে আমার কাছে এসে কথা বলবে?"

হযরত খালিদ (রা.) স্বীয় ঘোড়ার লাগামে হালকা ঝাঁকুনি দেন এবং পাদ্রীর সামনে এসে ঘোড়া থামান।

"তুমি তো সালার" বুড়ো পাদ্রী বলেন। "তোমাদের মাঝে কি আমার মত কোনো ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব নেই?"

"না!" হযরত খালিদ (রা.) জবাবে বলেন। "আমাদের সঙ্গে কোনো ধর্মীয় পণ্ডিত থাকেন না। সালারই ইমাম হন। আমি সিপাহসালার এবং আমি সম্মানিত পাদ্রীকে জানিয়ে দিচ্ছি যে, আমি তত সময় সিপাহসালার থাকব যতক্ষণ আমার জাতি এবং আমার সৈন্যরা চাইবে। যদি আমি এক আল্লাহর বিধি-বিধান এবং তাঁর রসূলের নির্দেশনা হতে বিচ্যুত হই তাহলে আমাকে সিপাহসালার থাকতে দেয়া হবে না। যদি এ অবস্থায় জোর করে সিপাহসালার থাকি তাহলে সিপাহীদের এই অধিকার এসে যায় যে, তারা আমার নির্দেশ মানবে না।"

ঐতিহাসিকরা লিখেন, হযরত খালিদ (রা.)-এর কথায় পাদ্রী নীরব হয়ে যান। তার মুখে কোনো কথা সরে না। তিনি কিছুক্ষণ হযরত খালিদ (রা.) এর মুখপানে চেয়ে থাকেন।

"সম্ভবত এটিই কারণ" পাদ্রী একটু নীচু কণ্ঠে বলেন "হয়তবা এই কারণেই বিজয় সর্বদা তোমার হয়।"

"সম্মানিত পাদ্রী!' সেই কথা বলুন, যা বলতে আপনি এসেছেন" হযরত খালিদ (রা.) বলেন।

"হাঁ!"-পাদ্রী সচকিত হওয়ার মত হয়ে বলেন "সুদূর আরব হতে বিজয়ের উদ্দেশ্যে আগত হে ব্যক্তি! তুমি কি জাননা, যে মাটিতে তুমি ফৌজ নিয়ে এসেছ, ইতোপূর্বে সে মাটিতে কোনো বাদশার পর্যন্ত পা রাখার দুঃসাহস হয় নি? তুমি নিজেকে নিজে কী মনে করে এখানে এসেছ? একসময় পারসিকরা এসেছিল কিন্তু তারা এমন ভয় পায় যে, পালিয়ে গিয়ে বাঁচে। অন্যরাও এসেছে। তারাও বীরত্বের সঙ্গে লড়েছিল কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। ব্যর্থতা এবং নিরাশা ছাড়া তাদের ভাগ্যে কিছু জোটেনি। ফলে এক সময় তারা চলে গেছে।... আমাদের বিরুদ্ধে তুমি কিছুটা সফলতা পেয়েছ ঠিকই কিন্তু এ কারণে এই চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে মুছে ফেল যে, প্রতি রণাঙ্গনে তুমিই বিজয়ী হবে।"

ঐতিহাসিকদের মতে, হযরত খালিদ (রা.) বুড়ো পাদ্রীর কথা নীরবে শুনছিলেন আর পাদ্রী গম্ভীর কণ্ঠে বলছিলেন ঃ

"আমার মুনিব সিপাহসালার তোমার প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ দেখাতে চান" পাদ্রী বলছিলেন। "এর থেকে বড় উদারতা আর কী হতে পারে যে, তিনি তোমার জাতিকে কচুকাটা করার পরিবর্তে আমাকে এই বার্তা দিয়ে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন যে, স্বীয় বাহিনীকে আমাদের দেশ হতে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। আমার মুনিব তোমার প্রত্যেক সৈন্যকে একটি দীনার, একটি জামা ও একটি পাগড়ী দিবেন। আর সেনাপতি হিসেবে তোমাকে ১০০ পাগড়ী, ১০০ জামা ও ১০০ দীনার প্রদান করবেন। তোমার জন্য এই বদান্যতা সাধারণ নয়। তুমি কি দেখছনা যে, আমাদের সৈন্য বালুর কণারাশির মত অসংখ্য? তুমি ইতোপূর্বে যাদের সঙ্গে লড়েছ আমাদের সৈন্য তাদের মত নয়। তুমি জাননা যে, এই সৈন্যদলের প্রতি রোম সম্রাটের হাত ও সমর্থন রয়েছে। তিনি এক অভিজ্ঞ সেনাপতি ও একজন অতি মান্যবর পাদ্রী এই ফৌজকে দিয়েছেন। ... বল ... তোমার জবাব কী?

পুরস্কার নিতে চাও নাকি তোমার বাহিনীর ধ্বংস চাও?"

"দু'টোর একটি!" হযরত খালিদ (রা.) জবাবে বলেন–"আমার দু'টি শর্তের একটি পুরা কর, আমি স্বীয় বহিনী নিয়ে চলে যাব।... আপনার মুনিবকে বলবেন, ইসলাম কবুল করুন অথবা কর প্রদান করুন। যদি এ দুইয়ের কোনোটি পুরা না করা হয় তাহলে আমাদের তলোয়ারই ফায়সালা করবে। আমি আপনার মুনিবের কথায় ফিরে যাব না। ... আপনার মুনিব যে দীনার, জামা এবং পাগড়ী দিতে চেয়েছে তা তো আমরা নিয়েই ছাড়ব।"

"আরেকবার পুনরায় চিন্তা কর আরব সালার!"

"আরবের সালার চিন্তা করেই জবাব দিয়েছে" হযরত খালিদ (রা.) বলেন। "যান, আপনার মুনিবের কাছে আমার জবাব পৌঁছে দিন।"

বুড়ো পাদ্রী রোমীয় সেনাপতি দিরওয়ানের কাছে হযরত খালিদ (রা.)-এর জবাব পৌঁছে দেন।

"আরব ডাকুদের এই দুঃসাহস?" দিরওয়ান রাগে ফেটে পড়ে বলে "সে কি জানে না যে, আমি তাদেরকে প্রথম আক্রমণেই শেষ করে দিতে পারি?" এরপর সে সৈন্যদের পানে ঘোড়া ঘুরিয়ে হুকুম দেয় "তীরন্দাযরা সামনে এসো এবং ঐ হতভাগাদের নির্মূল করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। ক্ষেপণাস্ত্রটিও সামনে নিয়ে এস।"

তীরন্দাযরা সামনে চলে আসলে মুসলমানদের মধ্যম বাহিনীর সালার হযরত মুয়াজ বিন জাবাল (রা.) তার বাহিনীকে হামলা করার জন্য প্রস্তুত হতে বলে "দেরী কর ইবনে জাবাল!" হযরত খালিদ (রা.) বলেন "যতক্ষণ আমি না বলব ততক্ষণ হামলা শুরু করবে না। সূর্য মাথার উপর উঠে যখন হেলতে শুরু করবে তখন আমরা হামলা করব।"

"ইবনে ওলীদ!" হযরত মুয়াজ বিন জাবাল (রা.) বলেন "আপনি কি দেখছেন না যে, তাদের ধনুক আমাদের চেয়ে ভাল এবং বড়। ওটা বহুদূর পর্যন্ত তীর নিক্ষেপ করতে পারে? তা আমাদের তীরন্দাযদের আওতা হতে দূরে। আমি ঐ তীরন্দাযদের উপর আক্রমণ করে তাদের বেকার করতে চাই। তাদের ক্ষেপণাস্ত্রও দেখুন। এটা পাথর বর্ষণ করবে।"

"রোমীয়রা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো" হযরত খালিদ (রা.) বলেন "আমরা যদি প্রথমে আক্রমণ করি তাহলে আমাদের পিছু হটা লাগবে। তাদের সারিবদ্ধতা একটু এদিক-সেদিক হতে দাও। তাদের কোনো না কোনো দুর্বল সাইড আমাদের সামনে এসে যাবে।"

রোমীয়রা কিছুক্ষণ যাবৎ অপেক্ষায় থাকে। মুসলমানরা যুদ্ধ কার্যক্রম শুরু না করলে দিরওয়ানের নির্দেশে তার তীরন্দায বাহিনী তীরের ঝাঁক বর্ষণ করতে শুরু করে এবং ক্ষেপণাস্ত্র দ্বারা পাথর নিক্ষেপ করতে থাকে। এতে কিছু মুজাহিদ শহীদ ও আহত হন। হযরত খালিদ (রা.) এ ক্ষতি সত্ত্বেও আক্রমণ করার নির্দেশ

দেন না। রোমীয় তীরন্দাযদের তীরের দ্বারা প্রতিক্রিয়াশীল জবাব দেয়ার উপায় ছিল না। কারণ, মুসলমানদের ধনুক তুলনামূলক ছোট হওয়ার কারণে দূরে তীর নিক্ষেপ করা যাচ্ছিল না।

ওদিক থেকে তীর এবং পাথর আসতেই থাকে। এতে মুসলমানদের মধ্যে উত্তেজনা ও অস্থিরতা দৃষ্টিগোচর হয়। তারা হামলা করতে চায় কিন্তু তাদের অনুমতি মিলছিল না। সালার জাররার ছুটে হযরত খালিদ (রা.) এর কাছে আসেন।

"ইবনে ওলীদ!" জাররার হযরত খালিদ (রা.)-কে বলেন "আপনি কি চিন্তা করছেন? আপনি কি শত্রুদের এই বার্তা দিতে চান যে, আমরা তাদের ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছি? ...যদি আল্লাহ আমাদের সঙ্গে থেকে থাকেন তাহলে চিন্তা করবেন না। হামলা করার নির্দেশ দিন।"

হযরত খালিদ (রা.)-এর ঠোঁটে মুচকি হাসি খেলে খায়। এটা স্থিরচিত্ত ও প্রশান্তির মুচকি হাসি ছিল। কেননা, তার সালার এবং সিপাহীরা পিছু হটার পরিবর্তে হামলা করার অনুমতি চাচ্ছিল।

"ইবনুল আযওয়ার!" হযরত খালিদ (রা.) বলেন– "তুমি সামনে এগিয়ে গিয়ে শত্রুদেরকে মোকাবেলা করার জন্য আহ্বান জানাতে পার।"

জাররারের দেহে বর্ম ও মাথায় শিরস্ত্রাণ ছিল। তার এক হাতে চামড়ার ঢাল এবং অপর হাতে তলোয়ার ছিল। তিনি পূর্বের এক রণাঙ্গনে এক রোমীয় হতে ঢালটি ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। জাররার সামনে এগিয়ে গেলে রোমীয় তীরন্দাযরা তাদের সালারের নির্দেশে ধনুক নিম্নমুখী করে।

✪

এটা তৎকালীন যুগের প্রথা ছিল যে, সৈন্যদের মুখোমুখি যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে উভয় বাহিনী হতে কোন এক লোক বের হয়ে শত্রুবাহিনীর কাউকে তার মোকাবেলা করার জন্য আহ্বান জানাত। ওদিক থেকে এক লোক সামনে আসত এবং উভয়ে জীবন মরণের খেলায় নামত। একে মল্লযুদ্ধ বলে। এই লড়াই শেষ হলে মূল লড়াই শুরু হত। মল্লযোদ্ধা যুদ্ধে নেমে শত্রুর উদ্দেশে অপমানকর কথাবার্তা বলত।

জাররার বিন আযওয়ার রোমীয় বাহিনীর সামনে যান এবং তাদেরকে তাঁর সঙ্গে ভাগ্য পরীক্ষা করার জন্য আহ্বান জানান।

"আমি সাদা চামড়াধারীদের জন্য মৃত্যুবার্তা নিয়ে এসেছি।

রোমীয়রা শোনো! আমি তোমাদের হত্যাকারী।

আমি আল্লাহর গযব হয়ে তোমাদের উপর পড়ব।

আমার নাম জাররার বিন আযওয়ার।"

নিয়ম হিসেবে জাররারের মোকাবেলা করার জন্য রোমীয় বাহিনী হতে একজন আসার কথা ছিল। কিন্তু চার-পাঁচ জন রোমীয় অশ্বারোহী সামনে আসে। জাররার প্রথমে তার শিরস্ত্রাণ খুলে ফেলেন। এরপর বর্ম খুলে ফেলেন। পরে গায়ের জামাও খুলে ফেলেন। জাররারের মধ্যে যেমন ছিল শক্তি, তেমনি ছিল হিম্মত। জাররার একইসঙ্গে একাধিক লোকের সঙ্গে মোকাবেলা করার বিশেষ যোগ্যতা রাখতেন।

জাররারের মোকাবেলা করার জন্য যে রোমীয়রা আসে তাদের মধ্যে দু'জন সালারও ছিল। একজন তবরিয়া এবং অপরজন আম্মানের শাসক ছিলো। বাকীরাও কোনো সাধারণ সিপাহী ছিল না। তারাও ছিল কমান্ডারের মর্যাদাসম্পন্ন। তারা জাররারকে ঘেরাও করতে ঘোড়ার মুখ ঘোরায়। যাররার হঠাৎ ঘোড়া চালিয়ে দেন এবং যখন তিনি আম্মানের শাসকের নিকট দিয়ে অতিক্রম করেন তখন এই সালার নিজের ঘোড়ার পিঠেই দু'ভাগ হয়ে যায়। এরপর ঘোড়া থেকে গড়িয়ে নীচে পড়ে যায়। জাররারের তলোয়ার তার পার্শ্বদেশ দিয়ে তার দেহে গভীরভাবে গেঁথে গিয়েছিল।

আবার স্বাচ্ছন্দে জাররারের ঘোড়া ঘোরে এবং আরেক রোমীয় তার তলোয়ারে কেটে পড়ে যায়। জাররার এমন চাল চালতেন এবং এমন সুকৌশলে প্রান্ত বদল করতেন যে, রোমীয় অশ্বারোহীদের দু'তিন ঘোড়া পরস্পরে ধাক্কা খেত অথবা একটি অপরটির আগে চলে যেত। এই সুবর্ণ সুযোগ থেকে ফায়দা উঠিয়ে জাররার তাদের মধ্য হতে একজনকে তার তলোয়ার দিয়ে কেটে ফেলতেন।

কোনো রোমীয় অশ্বারোহী পড়ে গেলে মুসলমানরা অত্যন্ত জোশের সঙ্গে নারাধ্বনি দিতেন। জাররারের অবস্থা এমন হয়েছিল, যেন তার মাঝে অস্বাভাবিক শক্তি এসে গেছে। তার মোকাবেলায় আগত বেশিরভাগ অশ্বারোহীকে তিনি হত্যা করেন। তাদের মধ্যে হতে এক-দুইজন যদিও মারাত্মক আহত হয়েছিল কিন্তু তারা ধাবমান ঘোড়ার পদতলে পড়ে পিষে যায়। দু'জন অশ্বারোহী রোমীয় পালিয়ে নিজের বাহিনীতে চলে যায়।

জাররার বিজয়ীর ভঙ্গিতে রক্তঝরা তরবারি উঁচিয়ে নাড়াতে থাকেন এবং রোমীয়দের তার মোকাবেলায় আসার জন্য আহ্বান করছিলেন।

"আমি সাদা চামড়াধারীদের হত্যাকারী। ... রোমীয়রা শোন! আমার তরবারি তোমাদের রক্তের পিপাসু।"

ঐতিহাসিক ওকিদী, ইবনে হিশাম এবং তবারী লিখেন, এবার দশজন অশ্বারোহী রোমীয় ঘোড়া ছুটিয়ে আসে। এরা সকলেই সালার হতে একধাপ নীচের পদবীধারী রোমীয় ছিলো। হযরত খালিদ (রা.) দশ অশ্বারোহীকে ময়দানে আসতে দেখে স্বীয় বডিগার্ড বাহিনী হতে ১০ জনকে নির্বাচন করে তাদের আগে পাঠান।

রোমীয় আশ্বারোহীরা জাররারের দিকে আসছিল। হযরত খালিদ (রা.) নারাধ্বনি দেন "খোদার কসম! আমি জাররারকে একাকী রাখব না।" এর পরপরই তিনি ১০ অশ্বারোহীকে ইশারা করে নিজের ঘোড়া চালিয়ে দেন। দশ অশ্বারোহী তার সঙ্গে সঙ্গে যায়। রোমীয় অশ্বারোহীদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল জাররারের প্রতি। ইতোমধ্যে হযরত খালিদ (রা.) আর তার সঙ্গী দশজন রোমীয় অশ্বারোহীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। একই সময়ে জাররারের তলোয়ারও নড়েচড়ে ওঠে। রোমীয়রা মোকাবেলা করার চেষ্টা করে কিন্তু হযরত খালিদ (রা.) ও তাঁর সঙ্গীদের তীব্র আক্রমণ রোমীয়দের এক পাও এগুতে দেয় না এবং সকলেই কেটে দু'ভাগ হয়ে যায়।

রোমীয় সালার এ ঘটনাকে তার নিজের জন্য বেইজ্জতি মনে করে এবং আরও বেশি সৈন্যকে মল্লযুদ্ধ করার জন্য পাঠায়। জাররার তাদের মধ্যেকার দু'তিনজনকে খতম করে দেন। মোকাবেলায় আসা প্রত্যেক রোমীয়ের সঙ্গে জাররারই মোকাবেলা করতে চান কিন্তু হযরত খালিদ (রা.) তাকে পেছনে ডেকে আনেন এবং অন্যান্য মুজাহিদদের পালাক্রমে সামনে পাঠাতে থাকেন। প্রতিবার মল্লযুদ্ধে মুজাহিদরাই জয়ী হয়। উভয় বাহিনীর মাঝে বহু সংখ্যক রোমীয়র লাশ পড়েছিল।

ঐতিহাসিক তথ্যমতে এই মল্লযুদ্ধের কার্যক্রম প্রায় দু'ঘণ্টার মত চলে এবং সূর্য ঐ স্থানে এসে যায় যেখানে আসলে হযরত খালিদ (রা.) আক্রমণ করতে চেয়েছিলেন।

✪

মল্লযুদ্ধ চলাকালে রোমীয় তীরন্দায বাহিনী ও পাথর নিক্ষেপকারী বাহিনী নীরবে দাঁড়িয়ে ছিল। মল্লযুদ্ধ শেষ হওয়ার আগেই হযরত খালিদ (রা.) তাঁর বাহিনীকে মূল যুদ্ধ শুরু করার নির্দেশ দেন। এটা ছিল সাধারণ মানের হামলা। ইতোপূর্বে রোমীয় তীরন্দায বাহিনী এবং পাথর নিক্ষেপকারী বাহিনী বড় বাধা ছিল। তাদের নিশ্চুপ দেখে হযরত খালিদ (রা.) হামলা চালিয়েছিলেন। হামলা এত জোরালো এবং মুজাহিদদের মাঝে এমন রণমূর্তি ছিল যে, রোমীয় সর্বাধিনায়ক দিরওয়ান কোনো কূটচাল চালার সুযোগই পায় না। সে তার বাহিনীর সামনে দাঁড়িয়ে মোকাবেলা দেখছিল। ঘোরতর যুদ্ধ শুরু হলে সে পেছনে চলে গিয়ে নিজের জীবন বাঁচায়।

সম্ভাবনা তো এই ছিল যে, দিরওয়ান সংখ্যাধিক্যের সুবাদে তার পার্শ্ব বাহিনীকে আরও ছড়িয়ে দিয়ে মুজাহিদ পার্শ্ববাহিনীকে পেছনে রেখে সামনে অগ্রসর হবে এবং মুজাহিদদের পশ্চাতে যাওয়ার চেষ্টা করবে। কিন্তু তখন তার এতটুকু বুদ্ধিও ছিল না। সে তার বাহিনী ছড়িয়ে দেয়ার পরিবর্তে সৈন্যদের গভীরতাকে বেশি করেছিল। অর্থাৎ এক প্লাটুনের পেছনে আরেক প্লাটুন রেখেছিল। তার এই বিন্যাস মূলত ভাল ছিল কিন্তু হযরত খালিদ (রা.)-এর চাল তার বিন্যাসকে তার জন্য একটি সমস্যা বানিয়ে দেয়।

মুসলিম বাহিনী সামনের দিক থেকে হামলা করলে রোমীয়দের অগ্রবাহিনী পিছু হটতে থাকে। এতে পেছনে থাকা বাহিনীকে আরও পেছনে সরে যেতে হয়। এভাবে পিছিয়ে আসার ফলে সৈন্যবিন্যাস ভেঙ্গে পড়ে। এতে মুসলমানদের অনেক লাভ হয়। এটা ঘোরতর এবং রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ছিল।

সূর্য পশ্চিমপানে ঢলে পড়েছিল। হযরত খালিদ (রা.) অনুভব করেন যে, সৈন্যরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তিনি মুজাহিদ বাহিনীকে রণাঙ্গন থেকে সরে আসার নির্দেশ দেন। এতে এমন মনে হয় যে, রোমীয় সালারও এমনটাই চাচ্ছিল। ফলে সেও রোমীয়দের পেছনে সরিয়ে নেয়া ভাল মনে করে। যখন উভয় বাহিনী পেছনে সরে যায় তখন জানা যায় যে, হাজার হাজার রোমীয় নিহত হয়েছে এবং আহতদের সংখ্যাও অসংখ্য। এর বিপরীতে মুসলমানদের ক্ষয়ক্ষতি খুব সামান্যই ছিল।

সূর্য অস্ত যাওয়ার উপক্রম, তাই উভয় বাহিনীর কারো আক্রমণ করার উপায় ছিল না। এভাবে প্রথম দিনের মত যুদ্ধ শেষ হয়।

✪

রাতে উভয় পক্ষের সালাররা নিজ নিজ নায়েব সালারদের ডেকে পাঠায় এবং নিজেদের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করে। আগামী দিনের কার্যক্রম সম্পর্কেও মত বিনিময় করে। রোমীয়দের প্রধান সালার দিরওয়ানের কনফারেন্সে উত্তেজনা ও গরমভাব বেশি ছিল। দিরওয়ান সাফ জানিয়ে দেয় যে, যুদ্ধ এমনভাবেই যদি চলে যেমনটি আজ হয়েছে; তাহলে ফলাফল স্পষ্ট যে, তার ফল কী হবে।

"আমি কি প্রথমেই বলেছিলাম না?" দিরওয়ানের সালার কুবকুলার বলে "আমি এখনও বলছি যে, আরও চিন্তা করুন এবং কারণ খুঁজে বের করুন যে, প্রতি রণাঙ্গনে মুসলমানদেরই শুধু বিজয় অর্জিত হচ্ছে কেন এবং সেই বৈশিষ্ট্য আমাদের সৈন্যদের মাঝে কেন আসছে না। আজকের লড়াইয়ের চিত্র দেখে আমাদের বিজয় সুদূর পরাহত ও সন্দেহপূর্ণ মনে হচ্ছে।"

"তবে কি তুমি বলতে চাও যে, আমরা ময়দান ছেড়ে পালিয়ে চলে যাই?" দিরওয়ান বলে "আমি উপস্থিত সবাইকে বলছি, সকলে নিজ নিজ মত ব্যক্ত করুন যে, আমরা মুসলমানদেরকে কীভাবে পরাজিত করতে পারি।"

কুবকুলারের ঠোঁটে এক আজব ধরনের মুচকি হাসি দেখা যায়। তিনি কোনো মন্তব্য করেন না। এ ছাড়া অন্যান্য সালাররা নিজ নিজ অভিমত পেশ করে। এসব সালারদের মতামত বিভিন্নরূপ ছিল। তবে একটি বিষয়ে সকলের মধ্যে ঐকমত্য ছিল, আর তা হলো, সবাই এ কথা বলে যে, মুসলমানদের অবশ্যই পরাজিত করতে হবে; আর তা হবে এমন পরাজয়, যাতে বেঁচে থাকবে শুধু যুদ্ধবন্দীরা।

"যদি খালিদ তাদের মাঝে না থাকে তাহলে তাদের পরাজিত করা সহজ" এক সালার বলে। "সে যেদিকেই যায়, তার প্রসিদ্ধি ও ত্রাস তার আগে আগে চলতে থাকে। আমাদের মানতে হবে যে, মুসলমানদের এই সালারের মাঝে এত বেশি সমর দক্ষতা আছে যা অনেক কম সালারের মধ্যে থাকে। ... আমি একটি পরামর্শ দিতে চাই।"

সকলের দৃষ্টি পরামর্শকের দিকে নিবদ্ধ হয়।

"মুসলমানদেরকে খালিদ থেকে বঞ্চিত করা হোক" উক্ত পরামর্শদাতা সালার প্রস্তাব পেশ করে বলে। "উপায় মাত্র একটিই...। আর তা হলো 'কতল'।

"আগামীকালের যুদ্ধের সময় তাকে হত্যা করার চেষ্টা করা হবে" দিরওয়ান বলে।

"এটা কোনো পরামর্শ হলো না।"

"আজ পর্যন্ত রণাঙ্গনে তাকে কেউ হত্যা করতে পারেনি।" পরামর্শদাতা সালার আবার বলে। "আমার প্রস্তাব হলো, আমাদের হয়ে একজন দূত খালিদের কাছে যাবে এবং বলবে যে, আমরা অযথা রক্তক্ষয় চাই না। আমাদের কাছে আসুন এবং আমাদের সঙ্গে সাক্ষাতে কথা বলুন। সে যখন আমাদের সালার দিরওয়ানের সঙ্গে কথা বলার জন্য আসবে তখন কমপক্ষে ১০ জন লোক পথিমধ্যে ওঁত পেতে থাকবে। তারা খালিদকে এভাবে হত্যা করবে যে, তার দেহ টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।"

"খুব ভাল প্রস্তাব" দিরওয়ান বলে "আমি এখনই এর ব্যবস্থা করছি। ... দাউদকে ডাক।"

কিছুক্ষণ পরেই দাউদ নামীয় এক ঈসায়ী সালার দিরওয়ানের সামনে এসে দাঁড়ায়।

"দাউদ!" দিরওয়ান ঐ আরব ঈসায়ীকে সম্বোধন করে বলে "এখনি মুসলিম তাঁবুতে যাও এবং তাদের প্রধান সেনাপতি খালিদ বিন ওলীদকে খুঁজে বলবে যে, আমি রোমীয় সালারের দূত। তাকে আমার হয়ে এই বার্তা দিবে যে, আমরা তার সঙ্গে সন্ধির আলোচনা করতে চাই। সে যেন কাল সকালে আসে এবং আমাদের সঙ্গে কথা বলে যে, কোন্ কোন্ শর্তে সন্ধি হতে পারে। তাকে এটাও জানাবে, এই আলোচনায় শুধু সে এবং আমি একা থাকব। আমাদের কারো সঙ্গে একজন বডিগার্ডও থাকবে না।"

দাউদ সাধারণ লোক ছিল না এবং সে ফৌজি লোকও ছিল না। সে রোম সম্রাটের এক ধরনের দূত ছিল এবং তার মর্যাদা দিরওয়ান হতে একধাপ নীচে ছিল।

"দিরওয়ান!" দাউদ বলে। "আমার মতে আপনি রোম সম্রাটের নির্দেশ লংঘন করছেন। সম্রাটের নির্দেশ কি এই নয় যে, মুসলমানদের ধ্বংস ও বরবাদ করে দাও? আমি বুঝতে পারছি না আপনি সন্ধির আলোচনা কার নির্দেশে করছেন। ... আমি সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে যেতে পারব না।"

"তাহলে তো তোমাকে আমাদের গোপন আলোচনার ভাগীদার বানাতে হয়" দিরওয়ান বলে। "আমি মুসলমানদের নির্মূলেরই পরিকল্পনা করছি। আমি খালিদ বিন ওলীদকে সন্ধির নামে ধোঁকা দিতে চাই। সে যদি আমার বার্তা মোতাবেক আসে তাহলে আমার কাছে তার লাশ পৌঁছবে। আমি পথিমধ্যেই তাকে হত্যা করার বন্দোবস্ত করে রেখেছি।"

"যদি ব্যাপারটি এমন হয় তাহলে আমি আপনাদের সঙ্গে আছি" দাউদ বলে। "আমি এখনই মুসলিম শিবিরে যাচ্ছি।"

দাউদ মুসলমানদের ক্যাম্পে যায়। চতুর্দিকে ছোট বড় মশাল জ্বলছিল। দাউদ সেখানে গিয়ে নিজের পরিচয় দেয়, সে রোমীয়দের দূত মুসলমানদের সেনাপতির জন্য বার্তা নিয়ে এসেছে। তাকে তখনই হযরত খালিদ (রা.)-এর তাঁবুতে পৌঁছে দেয়া হয়। দাউদ তাঁবুতে ঢুকেই আদব প্রদর্শন করে এবং নিজের পরিচয় দিয়ে দিরওয়ানের বার্তা হস্তান্তর করে।

তাঁবুতে মশালের আলো ছিল। হযরত খালিদ (রা.) দাউদকে বসতেও বলেন না। দাউদ হযরত খালিদ (রা.)-এর সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। হযরত খালিদ (রা.) ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ান এবং তার কাছে চলে যান। তাঁর দৃষ্টি দাউদের চোখে গভীরভাবে গেঁথে গিয়েছিল। তিনি দাউদকে কিছুই বলেন না, তার চোখে নিজের চোখ নিবদ্ধ রেখে দেখতেই থাকেন। হযরত খালিদ (রা.) দীর্ঘদেহী এবং বলিষ্ট ছিলেন। তার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ প্রতাপ তার চোখের চাহনীর মধ্যে ছিল। তৎযুগের তথ্য-উপাত্ত হতে জানা যায় যে, হযরত খালিদ (রা.)-এর চোখের সামনে কলিজাওয়ালাই কেবল দাঁড়াতে পারত। এটা ঈমানী প্রতাপ ছিল এবং চোখের এই দ্যুতির মধ্যে নবী প্রেম নিষিক্ত ও নিংড়িত ছিল। এ ছাড়াও হযরত খালিদ (রা.)-এর নাম সিরিয়ার ভূখণ্ডে ভীতি ও ত্রাসে পরিণত হয়েছিল।

হযরত খালিদ (রা.) দাউদকে দেখতেই থাকেন। দাউদের ভেতরটা পিশাচরূপী ছিল। ফলে সে হযরত খালিদ (রা.)-এর নূরানী দৃষ্টির তীব্রতা সহ্য করতে পারেনা। ঐতিহাসিকরা লিখেন, হযরত খালিদ (রা.)-এর চেহারায় একটি বা দু'টি ক্ষতের দাগ ছিল। যা তার চেহারাকে বিকৃত না করলেও ক্ষতস্থানের একটি আলাদা প্রতিক্রিয়া অবশ্যই ছিল, যা দাউদের জন্য ভীতিকর হয়ে গিয়েছিল।

"হে আরব সালার!" দাউদ কাঁপাকাঁপা কণ্ঠে বলে "আমি সৈন্য নই; দূত মাত্র।"

"সত্য বল দাউদ।" হযরত খালিদ (রা.) তার আরও কাছে এসে বলেন। "তুমি মিথ্যা ঘাওড়াচ্ছ। এখনও সত্য বল এবং নিজের প্রাণ নিরাপদ কর।"

দাউদকে হযরত খালিদ (রা.)-এর সামনে দাঁড়ানো একজন খর্বাকৃতির মানুষের মত লাগছিল। অথচ দাউদের উচ্চতাও একেবারে কম ছিল না।

"হে আরব সালার!" দাউদ তার মিথ্যার পুনরাবৃত্তি করে "আমি সন্ধির বার্তা নিয়ে এসেছি এবং এতে কোনো ধোঁকা বা প্রতারণা নেই।"

"যদি তুমি ধোঁকা দিতে এসে থাক তাহলে আমার কথা শোনো" হযরত খালিদ (রা.) বলেন। "আমাদের মাঝে যত চালাক লোক আছে তোমাদের মধ্যে তেমনটি নেই। ধোঁকা ও প্রতারণা করে কেউ আমাদের হারাতে পারে না। যদি তোমাদের সালার দিরওয়ান কোনো ষড়যন্ত্রের পেছনে হেঁটে থাকে তাহলে তার পরিণতি এই হবে যে, রোমীয়দের ধ্বংসযজ্ঞ আরও জোরদার হবে। ... আর যদি সে ভাল নিয়তে সন্ধির বার্তা পাঠিয়ে থাকে তাহলে তাকে গিয়ে বল যে, সে যেন কর আদায় করে। এরপর আমরা সন্ধির আলোচনায় বসব।"

দাউদের মধ্যে এতটুকু হিম্মতও ছিল না যে, সে আর কোনো কথা বলবে। সে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে প্রস্থান করে। তাঁবুর দরজা পর্যন্ত গিয়ে পেছনে ফিরে তাকায়। হযরত খালিদ (রা.)-এর নজর তখনও তাকে ঘিরে ঘুরপাক খাচ্ছিল। দাউদ মুখ ফিরিয়ে নেয় কিন্তু হাঁটে না; সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে। সে সেখান থেকেই অনুভব করতে থাকে, যেন হযরত খালিদ (রা.) নজর তার মাথার মধ্যে দিয়ে ঢুকে চোখের মধ্যে প্রবেশ করছে। সে আবার হযরত খালিদ (রা.)-এর দিকে ঘোরে এবং হঠাৎ দ্রুত কদমে এসে হযরত খালিদ (রা.)-এর পায়ে পড়ে যায়।

"ইবনে ওলীদ!" দাউদ ভগ্নকণ্ঠে বলে। "আমি আপনাকে ধোঁকা দিতে এসেছিলাম" এরপর দাউদ দিরওয়ানের চক্রান্ত বিস্তারিতভাবে ফাঁস করে দেয় এবং এটাও বলে দেয় যে, কাল সকালে দিরওয়ানের ১০ জন লোক কোনো এক স্থানে ওঁত পেতে থাকবে।

"তুমি কী বলতে পার" হযরত খালিদ (রা.) দাউদকে জিজ্ঞাসা করেন "তুমি যেতে যেতে কেন থেমে গেলে এবং তুমি সত্য কথা কেন বললে?"

"সত্য বলার প্রতিদান নেয়ার জন্য" দাউদ বলে "আমার নগদ টাকা-পয়সার প্রয়োজন নেই। যে বাহিনীর সালারের নজর মানুষের দেহে তীরের মত বিদ্ধ হয় সে বাহিনীকে কোনো শক্তি পরাজিত করতে পারে না।"...

"হে আরবী সালার! আমার অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান বলছে যে, জয় আপনারই হবে। আমি শুধু এতটুকু প্রতিদান চাই যে, যখন আপনি আমার এলাকা কব্জা করে নিবেন তখন আমার খান্দানের উপর রহম করবেন। তাদের ইজ্জত এবং তাদের জান-মালের প্রতি খেয়াল রাখবেন।" এরপর সে জানায় যে, তার খান্দান কোন বসতিতে থাকে।

দাউদ ফিরে এসে দিরওয়ানকে জানায় যে, সে খালিদকে বার্তা দিয়ে এসেছে এবং খালিদ নির্ধারিত সময়ে একাকী আসবেন।

দাউদ হযরত খালিদ (রা.)-এর ব্যক্তিত্বে এমনভাবে প্রভাবিত হয়েছিল যে, সে নিজেকে এ ব্যাপারে ইয়াকিন দিয়েছিল যে, এ যুদ্ধে অবশ্যই রোমীয়রা হারবে এবং মুসলমানরা বিজয়ী হবে। সে তার সর্বাধিনায়ককে মিথ্যা বলে যে, খালিদ নির্দিষ্ট সময়ে আসবেন।

রাত পেরিয়ে সকাল হয়। হযরত আবু উবায়দা (রা.) হযরত খালিদ (রা.)-এর কাছে আসেন। হযরত খালিদ (রা.) তাকে রোমীয় সালারের চক্রান্তের কথা শোনান।

"হয়ত সেই গুপ্তঘাতক আমাকে হত্যার জন্য অকুস্থলে পৌঁছে গেছে" হযরত খালিদ (রা.) বলেন "আমি চাচ্ছি যে, একাই গিয়ে ঐ দশজনকে হত্যা করে আসি। বড় লোভনীয় শিকার এরা।"

"না, ইবনে ওলীদ!" হযরত আবু উবায়দা (রা.) বলেন "এটা আপনার কাজ নয়। ১০ লোকের মোকাবেলায় গিয়ে আপনি নিহত বা আহত হতে পারেন। আপনি বড়ই মূল্যবান সম্পদ। এমন করুন যে, বাহাদুর দেখে ১০ জন লোক বাছাই করুন। তাকে অকুস্থলের ঠিকানা বলে সেখানে পাঠিয়ে দিন।"

হযরত খালিদ (রা) ১০ জন মুজাহিদ নির্বাচন করেন এবং তাদের বলেন যে, তাদের কোথায় যেতে হবে এবং কী করতে হবে। এই ১০ জনের মধ্যে জাররার বিন আযওয়ার ছিল। তাকে এই ১০ জনের কমান্ডার নিযুক্ত করা হয়।

এক প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক এই ঘটনাটি একটু ভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেন, সিদ্ধান্ত এই হয় যে, হযরত খালিদ (রা.) ও দিরওয়ানের সাক্ষাৎ হবে। দিরওয়ান সাক্ষাতের এক পর্যায়ে হযরত খালিদ (রা.)-কে জাপটে ধরবে এবং তার ডাকে ঐ ওঁত পেতে থাকা ১০ ব্যক্তি ছুটে এসে হযরত খালিদ (রা.)-কে কতল করবে। আরও তিনজন ঐতিহাসিক ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেছেন।

যাই হোক, দিরওয়ান তার নির্বাচিত ১০ গুপ্তঘাতককে রাতের শেষ প্রহরে অন্ধকার থাকতে ওঁত পাততে পাঠিয়ে দিয়েছিল। হযরত খালিদ (রা.)ও প্রায় একই সময়ে তাদের হত্যা করতে ১০ জন মুজাহিদ প্রেরণ করেন। এর পাশাপাশি হযরত খালিদ (রা.) তার সালারদের বলেন, তারা যেন গতকালের মত যুদ্ধবিন্যাসে রণাঙ্গনে দাঁড়িয়ে যায় এবং হামলা করার জন্য প্রস্তুত থাকে।

দিরওয়ান মুসলমানদের যুদ্ধে বিন্যস্ত অবস্থায় দেখে তার বাহিনীকেও যুদ্ধ বিন্যাসে বিন্যস্ত হওয়ার নির্দেশ দেয় এবং সকাল হতেই সে শাহী জঙ্গী পোশাক পরে ঐ স্থানে চলে যায় যেখানে সে হযরত খালিদ (রা.)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে তাকে ডেকেছিল। ওদিকে ঠিক সময়ে হযরত খালিদ (রা.)-ও এসে যান এবং উভয়ে একে অপরের সামনে দাঁড়িয়ে যায়।

"এসো আরবের বুদ্দু!" দিরওয়ান হযরত খালিদ (রা.) কে বলে "তুমি এবং তোমার লোকেরা আরবে না খেয়ে মরতে থাক, তারপরেও তুমি রোম সম্রাটের শাহী বাহিনীর সঙ্গে মোকাবেলা করতে এসেছ?... এসো লুটেরা! আমি কী জানি না যে, তোমরা সেখানে নিকৃষ্ট গরীবানা জীবন-যাপন করছ?"

"এসো রোমীয় কুত্তা!" হযরত খালিদ (রা.) রাগান্বিত কণ্ঠে বলেন। "আমি তোমাকে শেষ বারের মত বলছি যে, হয়ত ইসলাম কবুল কর। নতুবা কর দাও।"

দিরওয়ান চোখের পলকে ঝাঁপিয়ে পড়ে হযরত খালিদ (রা.)-কে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে।

"এসো এসো" দিরওয়ান তার বাহিনীর ১০ জনকে ডাক দেয়, যারা নিকটবর্তী কোথাও লুকিয়ে ছিল।

হযরত খালিদ (রা.) কম শক্তিধর ছিলেন না। কিন্তু দিরওয়ানের শক্তিও কোনো অংশে কম ছিল না। হযরত খালিদ (রা.) দিরওয়ানের বাহুবন্ধন হতে সামান্য মুক্ত হতে জোর প্রয়াস চালান, যাতে খাপ থেকে তলোয়ার বের করতে পারেন কিন্তু পেরে ওঠেন না। তিনি দেখেন যে, ইউনিফর্ম পরা ১০ রোমীয় সৈন্য তাদের দিকে দৌঁড়ে আসছে। এতে হযরত খালিদ (রা.) এটাকে জীবনের শেষ মুহূর্ত বলে ভাবতে থাকেন। তার আশা ছিল যে, জাররার এবং তার সঙ্গী নয়জন মুজাহিদ ওঁত পেতে থাকা দশ রোমীয়দের হত্যা করে ফেলেছেন। কিন্তু এখন

দিরওয়ানের ডাকে দশজনের দশজনই ছুটে আসছিল। এতে হযরত খালিদ (রা.) ভাবেন যে, হয়ত জাররার ও তাঁর এর সঙ্গী রোমীয়দের হাতে নিহত হয়েছে অথবা তারা সময়মত পৌঁছতে পারেনি।

রোমীয় লেবাসধারী দশজন যখন আরও কাছে আসে তখন তাদের একজন তার শিরস্ত্রাণ, বর্ম ও জামা খুলে ছুঁড়ে মারে এবং আল্লাহু আকবার নারাধ্বনি দেয়। তখন হযরত খালিদ (রা.) দেখেন যে, এ তো জাররার। তিনি বাকী নয়জনকেও যখন কাছ থেকে দেখেন, তখন জানতে পারেন যে, তারা তাঁরই নির্বাচিত মুজাহিদ দল।

এই তামাশা জাররার বিন আযওয়ার করেছিলেন। তিনি ওঁত পেতে থাকা রোমীয়দের অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করিয়েছিলেন। অতঃপর তাদের পোশাক খুলে নিজেরা পরে নেন। তিনি জানতেন যে, দিরওয়ান তাদেরকে ডাকবে, তাই তারা দিরওয়ানের ডাকে বেরিয়ে আসেন। দিরওয়ান খুশি হয়েছিল এই ভেবে যে, তার চক্রান্ত সফল হয়েছে।

"পেছনে সরে আসুন ইবনে ওলীদ!" জাররার তলোয়ার বের করে বলেন। "এটা আমার শিকার" এ কথা বলে তিনি দিরওয়ানের দিকে আস্তে আস্তে অগ্রসর হন।

"তোমার কসম খেয়ে বলছি" দিরওয়ান হযরত খালিদ (রা.)-কে বলে। "তুমি আমাকে তোমার তলোয়ার দ্বারা হত্যা কর এবং এই শয়তানকে আমার থেকে দূরে রাখ।"

জাররার নিজেকে ত্রাসের মূর্তপ্রতীক বানিয়ে রেখেছিলেন। দিরওয়ান জাররারকে মল্লযুদ্ধে রোমীয়দের কাটতেও দেখেছিল। তার ভয় ছিল যে, জাররার তাকে তিলে তিলে কষ্ট দিয়ে মারবে। তার জন্য এ মুহূর্তে পালিয়ে যাওয়া অসম্ভব ছিল। সে চাচ্ছিল যে, তাকে দ্রুত হত্যা করা হোক।

হযরত খালিদ (রা.) জাররারকে ইশারা করেন এবং জাররার তার হাত তার দিকে বাড়িয়ে দেন। জাররার তার তলোয়ার হযরত খালিদ (রা.)-কে প্রদান করেন। দিরওয়ান তার মুখ অন্য দিকে ঘুরিয়ে নেয়। হযরত খালিদ (রা.) এক কোপ দিলে দিরওয়ানের মাথা ধড় থেকে পৃথক হয়ে মাটিতে গিয়ে পড়ে।

হযরত খালিদ (রা.) দিরওয়ানকে হত্যা করে আর বিলম্ব করেন না। তৎক্ষণাৎ স্বীয় বাহিনীর কাছে যান এবং তাদেরকে হামলা করার নির্দেশ দেন। এ দিনের হামলাও গত দিনের মত ছিল। হযরত খালিদ (রা.) সম্মুখ এবং দু'পার্শ্ব বাহিনীকে একযোগে আক্রমণ করার নির্দেশ দেন। তিনি সালার ইয়াযিদ এর নেতৃত্বে ৪ হাজার মুজাহিদকে রিজার্ভ রাখেন।

মুসলমানরা হামলা করত এবং পেছনে সরে আসত। এরপর আবার হামলা করত। রোমীয়রা সংখ্যায় অনেক বেশি ছিল। কিন্তু তাদের সর্বাধিনায়ক তাদের মাঝে ছিল না। তার স্থলে সালার কুবকুলার যুদ্ধ পরিচালনা করছিল। রোমীয়রা দৃঢ়তার সঙ্গে যুদ্ধ করছিল কিন্তু মুসলমানদের হামলা ছিল প্রলয়ঙ্করী। তাদের সালার সাধারণ সিপাহীর মত লড়ছিল। স্বয়ং হযরত খালিদ (রা.) সালার হতে সিপাহী হয়ে গিয়েছিলেন। রোমীয় সালার লড়াই করত না; বরং নির্দেশ দিত মাত্র। কিন্তু এ যুদ্ধে সে মুসলমান সালারদের দেখাদেখি নিজেও সিপাহীর মত লড়তে থাকে। যুদ্ধের প্রচণ্ডতা এবং রক্তক্ষয় বেড়েই চলছিল। কোনো পক্ষ কোনো চাল চালতে পারছিল না। অধিক ক্ষতি রোমীয়দের হচ্ছিল। তাদের সৈন্য স্তরের পর স্তর সাজানো ছিল। হযরত খালিদ (রা.) এটা ভেবে জোরদার হামলা করিয়েছিলেন যে, শত্রুদের সর্বাধিনায়ক মারা গেছে। আর মুজাহিদরা এটা দেখে তীব্র আক্রমণ করছিল যে, রোমীয়দের সংখ্যা এত বেশি যে, তারা একে অন্যের মাঝে হারিয়ে গেছে।

হযরত খালিদ (রা.) হামলার আরেকটি অধ্যায় শুরু করতে চাচ্ছিলেন, যার জন্য তিনি মোক্ষম সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। কয়েক ঘণ্টা পর তিনি সে সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে যান। উভয় বাহিনী ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। রোমীয়রা ইতোমধ্যে জানতে পেরেছিল যে, তাদের সেনাপতি তাদের মাঝে নেই। অবশ্য রোমীয় অন্য সালাররা বীর-বিক্রমে লড়ছিল এবং লড়াচ্ছিল।

যখন উভয় পক্ষ ক্লান্ত, ক্লান্তিতে শরীর ভেঙ্গে আসছিল, ঠিক সেই সময় হযরত খালিদ (রা.) হযরত ইয়াযিদ বিন জাবালের নেতৃত্বে যে চার হাজার মুজাহিদকে রিজার্ভে রেখেছিলেন তাদেরকে শত্রুপক্ষের সম্মুখ বাহিনীর উপর হামলা করার নির্দেশ দেন। এই চার হাজার মুজাহিদ ছিল তাজাদম ও চাঙ্গা। তারা যুদ্ধে অংশ নেয়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠছিল এবং নারাধ্বনি দিয়ে নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে যাচ্ছিল। যুদ্ধের নির্দেশ পাওয়া মাত্রই তারা শত্রুর উপর বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মত আছড়ে পড়ে এবং এমন কঠিন হামলা চালায় যে, রোমীয়দের কাটতে কাটতে ব্যূহভেদ করে চলে যায়।

মুজাহিদদের সালাররা রোমীয়দের সালার কুবকুলারকে খুঁজে ফিরছিল। কেন্দ্রীয় ঝাণ্ডা তার কাছেই ছিল এবং সে দিরওয়ানের স্থলাভিষিক্ত ছিল। প্রথমে বলা হয়েছে যে, কুবকুলার সালার দিরওয়ানকে বলেছিল যে, মুসলমানদের সঙ্গে সন্ধি-সমঝোতা করে নেয়া হোক। তার দূরদর্শী চোখ দেখেছিল যে, এ যুদ্ধে মুসলমানরা রোমীয়দের উপর বিজয়ী হবে। এ কথা বলায় দিরওয়ান তাকে বকা-ঝকা করেছিল।

ঐতিহাসিক তবারী এবং আবু সাঈদ লিখেছেন, এক সময় মুজাহিদরা কুবকুলারকে পেয়ে যায়। তাকে দেখে সবাই হতবাক হয়ে যায়। তাকে সালারই মনে হচ্ছিল না। সে যুদ্ধবিমুখ হয়ে একপাশে দাঁড়িয়েছিল। তার মাথায় কাপড় এমনভাবে বাঁধা ছিল যে, তার চোখও প্রায় ঢাকা ছিল। তার বডিগার্ড বাহিনী সাদমাটাভাবে মোকাবেলা করে। হয়ত এ কারণে যে, তারা তাকে অর্ধমৃত মনে করেছিল। এদের থেকেই মুজাহিদরা জানতে পারে যে, এ লোকই কুবকুলার! মুজাহিদরা তাকে যে অবস্থায় পায় সে অবস্থাতেই হত্যা করে। কোনো ঐতিহাসিক মত প্রকাশ করেছেন যে, কুবকুলার তার চোখে কাপড় এই জন্য বেঁধেছিল যে, যাতে সে নিজ চোখে তার বাহিনীর গণহত্যা না দেখে। ব্যাপক রক্তপাত তার সহ্যশক্তির সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

কুবলুলার মারা গেলে রোমীয়দের কেন্দ্রীয় ঝাণ্ডা ভূপতিত হয়। পতাকা পড়ে যেতেই মুসলমানরা এই শ্লোগান তুলছিল যে–

“খোদার কসম! আমরা রোমীয়দের উভয় সেনাপতিকে হত্যা করে ফেলেছি।”

“রোমীয়রা! তোমাদের ঝাণ্ডা কোথায়?”

“রোম সম্রাটকে ডাকো।”

“রোমীয়রা! তোমাদের ক্রুশ এবং ঝাণ্ডা কোথায়?”

মুজাহিদরা তো এক আল্লাহ, তার রসূল এবং একটি আকীদা-বিশ্বাসের বলে বলীয়ান হয়ে লড়ছিল। কিন্তু রোমীয়রা নির্দেশে লড়ছিল। রোমীয়রা যাদের নির্দেশ লড়ছিল তারা মারা গিয়েছিল। মুজাহিদদের কাছে ঈমানী শক্তি ছিল, যা জাদুর মত রোমীয়দের উপর প্রবল হয়েছিল।

✪

রোমীয় সেনারা পালাতে থাকে। তাদের অনেকে বাইতুল মাকদিসের দিকে যাচ্ছিল। কেউ গুযযাহ্ আর কেউ য়াফার দিকে। রোমীয়দের সমরশক্তি পূর্ণাঙ্গভাবে নিশ্চিহ্ন করতে হযরত খালিদ (রা.) তাঁর অশ্বারোহী বাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, পলায়নপর দুশমনের পশ্চাদ্ধাবন করা হোক এবং একজনকেও যেন জিন্দা রাখা না হয়।

সেটি ছিল এক মারাত্মক দৃশ্য। রোমীয়রা প্রাণ বাঁচাতে এদিক ওদিক পালিয়ে যাচ্ছিল আর মুসলিম অশ্বারোহীরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে তাদেরকে নিজেদের বর্শা দ্বারা এফোঁড়-ওফোঁড় করছিল। রোমীয়রা তাদের সংখ্যাধিক্যের উপর ভরসা করেছিল। মদের নেশাকে তারা শক্তি মনে করত। তারা মুসলমানদেরকে গরীব এবং অজ্ঞ-মূর্খ মনে করে তাদেরকে একটি করে দীনার দিতে চেয়েছিল। হযরত খালিদ (রা.) তাদের বলেছিলেন যে, তোমাদের থেকে দীনার তো আমরা অর্জন করেই ছাড়ব। এখন রোমীয়দের পলায়নের স্থান মিলছিল না। রণাঙ্গনে তাদের এত প্রাণহানী হয়নি রণাঙ্গন থেকে পলায়নের সময় যত হয়। তাদের মধ্যে ভাগ্যবান তারাই ছিল যারা প্রাণ নিয়ে বাইতুল মাকদিসে পৌঁছে গিয়েছিল এবং শহরে ঢুকতে সক্ষম হয়েছিল।

এই গণহত্যা তখন থামে যখন সূর্য অস্ত যায় এবং অন্ধকার এত ছেয়ে যায় যে, ঘোড়ার পিঠের আরোহীকে পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল না। সে সময় হযরত খালিদ (রা.) তাঁর তাবুতে ছিলেন। তাকে জানানো হয় যে, দাউদ নামীয় এক আরব ঈসায়ী তার সঙ্গে মিলিত হতে চায়। হযরত খালিদ (রা.) দাউদের নাম শুনেই বাইরে দৌড়ে আসেন।

"খোদার কসম দাউদ!" হযরত খালিদ (রা.) তাকে বুকে টেনে বলেন "তুমি শুধু আমার প্রাণই রক্ষা করনি; বরং আমার বিজয়কেও সহজ করে দিয়েছ। এর জন্য আমি তোমাকে যে পুরস্কারই দিই না কেন তা যথেষ্ট নয়। ... তোমার স্ত্রী, বাচ্চারা কোথায়? কেউ তো তাদের উপর জুলুম করেনি?"

"না ইবনে ওলীদ!" দাউদ বলে "আমি কোনো পুরস্কার নিতে আসিনি। পুরস্কার আমি পেয়ে গেছি। দেখুন, আমি জীবিত এবং আমার পরিবারও জীবিত। এখন আমি একটি পুরস্কার চাই। আর তা হলো, এই ভেদ যেন শুধু আপনার বক্ষেই থাকে যে, আমি আপনাকে কিছু সাহায্য করেছিলাম। রোম সম্রাট এখনও জীবিত। আপনি তার সাম্রাজ্যে পা দিতে শুরু করেছেন মাত্র।"

"তোমার ভেদ রোম সম্রাটের কানে যাবে না" হযরত খালিদ (রা.) বলেন। "আর আল্লাহর কসম! তুমি গনীমতের মালের হকদার। আমি তোমাকে অংশ দিব এবং যা কিছু তুমি চাইবে তা-ও পাবে।"

এর কয়েক দিন পরে মদীনায় ঈদের মত খুশি উদযাপিত হচ্ছিল। হযরত খালিদ (রা.) আমীরুল মুমিনীন হযরত আবু বকর (রা.) বরাবর পত্র লিখেছিলেন যে, তিনগুণ বেশি শক্তিধর রোমীয়দের উপর বিজয় অর্জিত হয়েছে, যার মধ্যে ২৫ হাজার রোমীয় সৈন্য মারা গেছে। এর বিপরীতে হারাতে হয়েছে মাত্র ৪৫০ জন মুজাহিদকে। হযরত খালিদ (রা.)- এর এই পত্র প্রথমে মসজিদে নবীতে পড়ে শোনানো হয়। এরপর মদীনার অলি-গলিতে মানুষ জমা করে শোনানো হয়। খুশির ও মহাবিজয়ের এই সংবাদ শুনে মানুষ নাচতে শুরু করে। পরস্পরে কোলাকুলি করতে থাকে। মদীনা বিজয় ও খুশির লহরে ভাসতে থাকে।

হযরত খালিদ (রা.) আমীরুল মু'মিনীনকে এটাও লিখেছিলেন যে, এবার তিনি দামেস্ক শহর অবরোধ করবেন, যা সিরিয়া তথা রোম সাম্রাজ্যের একটি বড়ই গুরুত্বপূর্ণ শহর ছিল। রোম সাম্রাজ্য অত্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

যখন মদীনা এবং আশ-পাশ অঞ্চলের লোকেরা জানতে পারে যে, হযরত খালিদ (রা.) রোমীয়দের উপর একটি বিজয় অর্জন করে দামেস্ক অভিমুখে রওনা হচ্ছেন তখন কতক মুসলমান নতুন করে হযরত খালিদ (রা.)-এর ফৌজে শামিল হওয়ার প্রস্তুতি নেয়। তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব হযরত আবু সুফিয়ান (রা.) অন্যতম ছিলেন। তিনি স্ত্রী হিন্দাকে নিয়ে রওনা হয়ে যান।

✪

১ হাজার ৩৫২ বছর পূর্বে আগষ্ট মাসের কোনো এক দিনে যখন মদীনায় মুসলমানেরা আজনাদাইনের বিজয়ে খুশি উদাপন করছিল, ঠিক তখনি মদীনা হতে অনেক দূর উত্তরে রোম সাম্রাজ্যের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ শহর হিমসে নিরাশা ও হতাশার অবস্থা বিরাজ করছিল। রোম সম্রাটের শাহী মহলে অগ্নিঝরা আওয়াজ উচ্চকিত হচ্ছিল। বসরার পরাজয়ের সংবাদ নিয়ে আসা দূত যদি সেখান থেকে কৌশলে সরে না আসত, তাহলে রোম সম্রাট তার কল্লা কেটে দিত।

"আমাদের সেনাপতি দিরওয়ানের কী হয়েছে?" রোম সম্রাট ক্রুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন।

"মারা গেছেন"- কম্পিত একটি কণ্ঠে তিনি জবাব পান।

"আর সে কুবুকুলার? ... যে বলত, আমার তলোয়ারের বাতাসেই দুশমন দিখণ্ডিত হয়ে যায়!"

"তিনিও মারা গেছেন।"

"আর ফামুস?"

"তিনি মূল যুদ্ধের পূর্বে মল্লযুদ্ধে মারা গিয়েছিলেন।"

রোম সম্রাট এক এক করে সেসব সালারদের নাম উচ্চারণ করেন, যারা আজনাদাইনের যুদ্ধে শামিল ছিল এবং যাদের বীরত্ব ও চৌকস নেতৃত্বের উপর তার অগাধ আস্থা ছিল। কিন্তু প্রত্যেকবার তার একটি জবাবই মিলতে থাকে "মারা গেছেন অথবা মারাত্মক আহত হয়েছেন।' সবাই কিন্তু নিহত বা আহত হয়নি। তাদের কেউ কেউ পালিয়ে গিয়েছিল।

"...এখন মুসলমানরা দামেস্কপানে অগ্রসর হচ্ছে" রোম সম্রাটকে জানানো হয়।

"দামেস্কের দিকে?" রোম সম্রাট উদ্বেগের সঙ্গে বলেন– "না ... না ... আমি তাদের দামেস্ক পর্যন্ত পৌঁছতে দিব না। তারা দামেস্ক দখল করতে পারবে না। সেখানে আমার একজন বাঘ রয়েছে। ... তুমা ... দামেস্কের সালার তুমা।"

রোম সম্রাট দ্রুত পা ফেলে নিজের শাহী কামরায় যাচ্ছিলেন এবং তার এক হাতের উপর অপর হাত দ্বারা আঘাত করছিলেন। তার চাটুকাররা, দরবারীরা, খাস খাদেমরা এবং তার সেবায় থাকা সুন্দরী ললনারা জানত যে, যখন সম্রাট এ ধরনের উদ্বেগ ও ক্রোধান্বিত থাকতেন তখন সবচেয়ে সুন্দরী ললনা মদ পেশ করে থাকে।

পাতলা রেশমি বস্ত্র পরিহিতা প্রায় নগ্ন এক সুন্দরী বালিকা রূপার পেয়ালায় মদ নিয়ে আসে এবং অগ্নিশিখার রূপে হিরাকেলের সামনে যায়। রোম সম্রাট হিরাকেল ক্লান্ত ষাঁড়ের মত ফুলছিল। তিনি বালিকার হাতে সূরাপাত্র দেখে অত্যন্ত জোরে পাত্রের নিচে হাত দিয়ে আঘাত করেন এতে মদের পাত্র বালিকার মুখে গিয়ে লাগে। সূরাপাত্র কামরার ছাদে লেগে আবার ফিরে আসে। হিরাকেল মেয়েটিকে ধাক্কা দিলে সে দরজার উপরে আছড়ে পড়ে।

"মদ... মদ .... মদ ...!"–হিরাকেল ক্রোধের সঙ্গে বলেন। "তোমরা মদ এবং সুন্দরী নারীদের দ্বারা চিত্ত বিনোদনকারীদের পরিণতি দেখনি? তোমরা দেখছনা যে, তারা রোম সাম্রাজ্যকে অপমান ও অবমাননার পঙ্কিল আবর্তে ছুঁড়ে মারছে?

... এর বিপরীতে যারা আমাদের পরাস্ত করেছে তারা নিজেদের উপর মদ হারাম করে রেখেছে।" তিনি নির্দেশ দেন "ঘোড়া প্রস্তুত কর। আমি ইন্তাকিয়া যাচ্ছি এবং আমি সেখান থেকে তখন ফিরব, যখন আমি শেষ মুসলমানেরও লাশ দেখব।"

সম্রাট যুদ্ধের জন্য যখন যাত্রা করতেন, তখন তার জন্য বহু ধরনের ব্যবস্থা নিতে হত। বডিগার্ড বাহিনী এবং পছন্দের নারীরা সঙ্গে সঙ্গে যেত। এমন ব্যবস্থা সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাকত। কিন্তু এবার হিরাকেল উড়ে ইন্তাকিয়ায় যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। তার যাত্রার বন্দোবস্ত করার দায়িত্বশীলদের উপর কেয়ামতসম অবস্থা সৃষ্টি হয় এবং তারা বন্দোবস্তের কাজে লেগে যায়।

✪

হযরত খালিদ (রা.) আজনাদাইনে সাত দিন থাকেন। তিনি তার সালারদের জানান যে, শত্রুদেরকে কোথাও অলসতা ছাড়াবার এবং দম নেওয়ার সুযোগ দিও না। তাদের এতটুকু সুযোগ দিও না যে, তারা তাদের বিক্ষিপ্ত শক্তিকে একত্রিত করতে পারে। এই নীতির ভিত্তিতে দামেস্ক পানে তাদের যাত্রা অত্যন্ত দ্রুতগতির ছিল। তিনি গোয়েন্দাদের আগেই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এবার হযরত খালিদ (রা.) গোয়েন্দাগিরির ক্ষেত্রে সংস্কার সাধন করেন। এই বাস্তবতা উপেক্ষা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না যে, রোম সাম্রাজ্যের পরিধি অত্যন্ত বিস্তৃত এবং তাদের সৈন্যসংখ্যাও অনেক উন্নত। এমন সৈন্যদের উপর জয়ী হওয়ার জন্য তাদের অবস্থা ও প্রকৃতি ইত্যাদি সম্পর্কে আগে-ভাগে জানা জরুরী ছিল। জরুরী ছিল এলাকার ভোগৌলিক অবস্থা সম্পর্কেও খোঁজ-খবর রাখা যেখানে তাদের সৈন্যরা অবস্থানরত। সৈন্যদের আচার-আচরণ ও কার্যক্রম সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা রাখাও অতি প্রয়োজন ছিল।

পথিমধ্যে বাইতুল মাকদিস পড়ে। হযরত খালিদ (রা.) এই গুরুত্বপূর্ণ শহর এড়িয়ে খানিকটা সামনে এগিয়ে যান। কিন্তু একটি স্থান উপেক্ষা করা কঠিন

ছিল। সে বসতির নাম ছিল ফাহাল। এটা একটি মজবুত দূর্গ ছিল। হযরত খালিদ (রা.) ফাহালের কাছাকাছি পৌঁছলে পাগলের মত এক ফকীর তার গতিরোধ করে। হযরত খালিদ (রা.) তাকে নিজের কাছে ডেকে নেন।

"কী খবর নিয়ে এসেছ?" হযরত খালিদ (রা.) ফকিরকে জিজ্ঞাসা করেন। পাগলরূপী ফকির হযরত খালিদ (রা.) এর গুপ্তচর ছিল।

"এই বসতির নাম ফাহাল" গোয়েন্দা বলে। "আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে, এটা একটা কেল্লা। এর অভ্যন্তরে সৈন্য আছে। বাইরে কিছুই নেই। সামনে যেখানেই রোমীয়দের সঙ্গে আমাদের লড়াই বাঁধবে এই কেল্লা হতে রোমীয়দের সব ধরনের সাহায্য মিলবে।"

হযরত খালিদ (রা.) এই কেল্লার অবরোধ জরুরী মনে করেন না। তিনি তার সৈন্য কম করতে চাচ্ছিলেন না। দামেস্ক পদানত করা চাট্টিখানি ব্যাপার ছিল না। বরং পরাজয়ের সমূহ সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পাচ্ছিল। হযরত খালিদ (রা.) তাঁর এক নায়েব সালার আবুল আওয়ারকে ডাকেন এবং তাকে নির্দেশ দেন যে, সে যেন নিজের সঙ্গে একটি অশ্বরোহী দল রাখে এবং ফাহালের কাছাকাছি কোথাও প্রস্তুত অবস্থায় থাকে। তার দায়িত্ব হলো, এই কেল্লা হতে সৈন্য বের হলে তাদের উপর তীর বর্ষণ করা এবং কাউকে বের হতে না দেয়া।

হযরত খালিদ (রা.) সেখানে আসেন না। আবুল আওয়ার একটি দল রেখে দেন। কেল্লা হতে বের হওয়ার যতটা দরজা ছিল প্রত্যেক দরজার সামনে সৈন্য নিযুক্ত করে রাখেন। আরোহীদেরকে তিনি ঘোড়া হতে নামা এবং দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়ানোর অনুমতি প্রদান করেন।

✪

হযরত খালিদ (রা.) ৩২ হাজারের কিছু কম সৈন্য নিয়ে চলছিলেন। বাহ্যত তার বাহিনী অবিন্যস্ত অবস্থায় কাফেলারূপে দামেস্কপানে চলছিল। কিন্তু তার প্রত্যেকটি দলের কর্তব্য ও করণীয় সম্পর্কে ভালভাবে জানা ছিল। একটি অগ্রবর্তী দলও ছিল এবং পশ্চাৎ ও দুপার্শ্ব হেফাজতের দায়িত্বশীল দলও ছিল। পুরো বাহিনী অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে চলছিল। যে কোনো স্থানে এবং যে কোনো সময়ে তাদের উপর হামলা হওয়ার আশংকা ছিল। দাউদ ঈসায়ী হযরত খালিদ (রা.)-কে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, তিনি সবেমাত্র রোম সাম্রাজ্যে পা দিয়েছেন এবং রোম সাম্রাজ্যের পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক।

ইতোমধ্যে রোমীয় সৈন্য যেখানে যেখানে ছিল প্রত্যেকস্থানে রোম সম্রাটের এই নির্দেশ পৌঁছে গিয়েছিল যে, মুসলিম বাহিনীকে যেন আটকে দেয়া হয়। এই নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে দামেস্কগামী রাস্তায় রোমীয়রা তাদের গোয়েন্দা পাঠিয়ে দিয়েছিল। ইয়ারমুক নদীর পাড়ে 'ওয়াকুচা' নামীয় একটি এলাকা ছিল। কোনো এক রোমীয় গোয়েন্দা হযরত খালিদ ও তাঁর বাহিনীকে আসতে দেখতে পায় এবং ফিরে গিয়ে সে এ খবর জানিয়ে দেয়। যখন হযরত খালিদ (রা.) ওয়াকুচার কাছাকাছি পৌঁছেন তখন রোমীয় সৈন্যদের অনেকগুলো দল হযরত খালিদ (রা.)-এর গতিরোধ করার জন্য প্রস্তুত ছিল।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, আজনাদাইনের যুদ্ধে পলায়নপর কতক রোমীয় সৈন্য ওয়াকুচায় পৌঁছে গিয়েছিল। তাদেরকেও ঐ দলে শামিল করে নেয়া হয় যারা মুসলমানদের গতিরোধ করতে যুদ্ধ বিন্যাসে অপেক্ষমাণ ছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে যুদ্ধ করার মনোবল স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল। কেননা তাদের উপর মুসলমানদের ত্রাস বিদ্যমান ছিল। যেসব কমান্ডার এবং সিপাহীরা এখন পর্যন্ত মুসলমানদের সঙ্গে লড়াই করেনি, তারা আজনাদাইনের পলাতক সৈন্যদের কাছে জিজ্ঞাসা করত যে, মুসলমানরা যুদ্ধে কেমন?

"চিন্তা করে দেখ" প্রশ্নকারীদের এমন কিছু জবাব মেলে "৩০ হাজার সৈন্য ৯০ হাজার সৈন্যকে এভাবে পরাজিত করেছে যে, সেনাপতি থেকে নিয়ে ছোটখাটো সালার পর্যন্ত কেউ জিন্দা নেই। ... তারা আমাদের অর্ধেক সৈন্য মেরে ফেলেছে। আহতদের তো কোনো হিসাবই নেই। ... বন্ধুরা! জিজ্ঞাসা করোনা। প্রশ্ন করোনা। আমি তাদেরকে মানুষই মনে করি না। তাদের কাছে নিশ্চয় কোনো জাদু আছে অথবা তারা জিনদের মত অন্য কোনো মাখলুক।... তাদের এক একজন দশজনের মোকাবেলা করে। ... তাদের সামনে কেউ দৃঢ়তার সঙ্গে লড়তে পারে না। ... জিজ্ঞাসা করছ কেন তারা আসছে। নিজেরাই দেখতে পাবে।"

"তারা" আসে এবং "তারা" দেখে ফেলে।

এটা দেখে ফেলে যে, যারা ইতোপূর্বে অবিন্যস্তভাবে কাফেলার মত আসছিল, দেখতে দেখতে তারা যুদ্ধ বিন্যাসে বিন্যস্ত হয়ে যায়। মহিলা ও বাচ্চারা পেছনে থাকে এবং তাদের রক্ষাকারী দল নিজেদের স্থানে চলে আসে। হযরত খালিদ (রা.) তার মুহাফিজ প্রমুখকে সঙ্গে নিয়ে সামনে চলে আসেন এবং উভয় ফৌজ মুখোমুখী হয়ে যায়।

প্রথমে বর্ণনা করা হয়েছে যে, হযরত খালিদ (রা.)-এর জঙ্গিচাল এবং মুজাহিদদের কঠিন হামলায় শত্রুসেনাদের মধ্যে ভীতি সঞ্চারিত হয়ে যেত। যে সৈন্য পালিয়ে যেত, সে যেখানেই যেত, সে ভীতিকে নিজের সঙ্গে করে নিয়ে যেত এবং তা অন্যান্য সৈন্যের মাঝে ছড়াত। তার উদ্দেশ্য হত এটা বুঝানো যে, সে অযথা পালায়নি। সে এই ভীতিকে বাড়িয়ে বাড়িয়ে এবং এমনভাবে বলত যে, শ্রোতারা তা শুনে এটাই মনে করত যে, মুসলমানদের মধ্যে কোনো অস্বাভাবিক শক্তি আছে। এ প্রক্রিয়ায় হযরত খালিদ (রা.) শত্রুদের উপর মানসিক প্রভাব বিস্তার করে রেখেছিলেন; যা প্রত্যেক রণাঙ্গনে তার কাজে লাগত।

এই শক্তি বলতে গেলে অস্বাভাবিকই ছিল। আকীদা-বিশ্বাসের সত্যতা, ঈমানী সুদৃঢ়তা এবং প্রেরণার আধিক্য হতে এই শক্তি সৃষ্টি হয়েছিল। মুসলমানরা আল্লাহর হুকুমে লড়ছিল। তাদের মনে অন্য কোনো স্বার্থ লালসা ছিল না।

ওয়াকুচার ময়দানে যখন রোমীয়রা মুসলমানদের মোকাবেলায় আসে, তখন তাদের মাঝে বীরত্ব ও বাহাদুরিতা ছিল এবং দুর্বার আক্রমণকারী বলেও মনে হচ্ছিল। কিন্তু যখন হযরত খালিদ (রা.) হামলা করেন, তখন দেখা যায় যে, রোমীয়দের লড়াইয়ের জযবা ততটা প্রবল নয়, যতটা তাদের মাঝে থাকার দরকার ছিল। হযরত খালিদ (রা.) সম্মুখভাগে হামলা করেন এবং উভয় পার্শ্ববাহিনীকে ছড়িয়ে দিয়ে এই নির্দেশ দিয়ে সামনে পাঠিয়ে দেন যে, তারা যেন অগ্রে বেড়ে দুশমনের পার্শ্ব বাহিনীতে গিয়ে আক্রমণ করে।

ঐতিহাসিকদের মতে, রোমীয়রা সম্মুখভাগের হামলা প্রতিরোধ করতে গিয়ে এমন অবস্থা সৃষ্টি করে ফেলে যে, পার্শ্ববাহিনীর আগমন তারা টের পায় না। যখন তাদের উপর ডান-বাম পার্শ্ব থেকেও হামলা হতে থাকে এবং তাদের ডান-বাম বাহিনী মুসলমানদের চাপের মুখে ভেতর পানে সংকুচিত হতে থাকে, তখন তারা ঘাবড়ে যায় এবং ভীতি তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। এই ভীতিই এক সময় রোমীয়দের পা নড়বড়ে করে দেয়।

এই রোমীয় বাহিনীর প্রতি নির্দেশ ছিল যে, তারা যেন মুসলমানদেরকে বেশির থেকে বেশি দিন আটকে রাখে। কারণ এই ছিল যে, দামেস্কে যে রোমীয় সৈন্য ছিল, বিভিন্ন স্থান থেকে সৈন্য এনে তার সংখ্যা বৃদ্ধি করা হচ্ছিল। রোম সম্রাট এই চেষ্টায় ছিলেন যে, তার প্রেরিত বাহিনী যেন মুসলমানদের পূর্বেই দামেস্কে পৌঁছে যায়। এর জন্য জরুরী ছিল ওয়াকুচায় মুসলমানদের আটকে রাখা

এবং এমন পন্থায় লড়াই করা, যাতে যুদ্ধ বিলম্বিত হয়। এমন উদ্দেশ্যে লড়াইয়ের ধরন অন্যরকম হয়। হযরত খালিদ (রা.) তাদেরকে কোনো কিছু বুঝে উঠার সুযোগই দেন না। রোমীয়রা অগণিত লাশ ও আহতদের রণাঙ্গনে ফেলে পালিয়ে যায়।

হযরত খালিদ সেখানে এতটুকু সময় অবস্থান করেন যে, শহীদদের জানাযা পড়িয়ে দাফন করেন, আহতদের সঙ্গে নিয়ে নেন এবং মালে গনীমত জমা করে আবার রওনা হয়ে যান।

এটা ছিল ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দের আগষ্ট মাসের তৃতীয় সপ্তাহের ঘটনা।

✪

রোম সম্রাট হিরাকেল ইন্তাকিয়া যান এবং সেথায় নিজের হেডকোয়ার্টার স্থাপন করেন। হিমস থেকে ইন্তাকিয়া রওনা হওয়ার পূর্বে তিনি দামেস্কের রোমীয় সৈন্যদের সালার-তুমা, হারবীস ও আযাযীর-এর উদ্দেশে বার্তা পাঠিয়েছিলেন যে, তারা যেন অতি শীঘ্র ইন্তাকিয়া পৌঁছে। সম্রাট ইন্তাকিয়া যেতে যেতে ঐ তিন সালারও তথায় গিয়ে পৌঁছে।

"তোমরা কি শুনেছ যে, তোমাদের সালার দিরওয়ান এবং কুবকুলারও মারা গেছে?" সম্রাট তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন "তোমরাও কি তাদের মত রোম সম্রাটের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রতাপ মাথা হতে মুছে ফেলবে? তোমাদের দৃষ্টিতেও কী ক্রুশের পবিত্রতা শেষ হয়ে গিয়েছে?"

"মুসলমানরা তো এখনও আমাদের সামনেই আসেনি" সালার তুমা বলে "আমাদেরকে এখনও না আপনি পরীক্ষা করেছেন, না মুসলমানরা। তাদেরকে আসতে দিন। আমি আপনার কন্যার সামনে মাথা নত হতে দিব না।"

তুমা রোম সম্রাটের জামাতা ছিল এবং সে দামেস্কের সেনাপতিও ছিল! বড় মজবুত ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ছিল এবং সে খ্রিস্ট ধর্মের প্রচার ও হেফাজতের জন্য সরগরম থাকত।

"তুমা!" হিরাকেল তাকে বলেন। "তুমি ধর্ম নিয়ে এত বেশি মত্ত থাক যে, দামেস্কের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার উপর তোমার পূর্ণ দৃষ্টি নেই।"

"আমি তো এমন বুঝি যে, ধর্ম না থাকলে দামেস্কও থাকবে না" তুমা বলে "আপনি কি জানেন না যে, মুসলমানদের সঙ্গে লড়াই করাটাও ধর্মীয় কাজের অন্তর্গত?

... আমি এখানে তো একাকী নই; বরং সমর বিশেষজ্ঞ সালার হারবীস এবং সালার আযাযীরও আমার সঙ্গে আছেন। আযাযীর কী পারসিকদের এবং তুর্কীদের কয়েক যুদ্ধে পরাস্ত করেনি?"

"আমার যতটুকু ভরসা আযাযীরের উপর আছে, তোমাদের দু'জনের উপর ততখানি নেই" হিরাকেল বলেন "আযাযীর অভিজ্ঞ সালার। এবার তোমাদের দু'জনকে প্রমাণ দিতে হবে যে, তোমরা আযাযীরের সমমানের।"

আযাযীর রোমীয়দের বড়ই যোগ্য এবং বীর সালার ছিল। সে অনেক যুদ্ধ লড়েছিল এবং প্রতি রণাঙ্গনে বিজয় অর্জন করেছিল। আরবী ভাষায় তার পাণ্ডিত্য এত সুগভীর ছিল যে, সে যখন আরবী বলত, তখন সন্দেহ হত যে, সে সম্ভবত আরবের লোক। দামেস্কের বাহিনীর মূলত কমান্ডার সে-ই ছিল।

ইন্তাকিয়ায় কুলূস নামে এক রোমীয় সালার ছিল। হিরাকেল তাকে পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে দামেস্ক যেতে বলেন।

"সম্রাট হিরাকেল!' কুলূস বলে- "আমি হলফ করে বলছি যে, আমি আপনার সামনে তখন আসব যখন আমার বর্শার ফলায় মদীনার সালার খালিদ বিন ওলীদের মস্তক গাঁথা থাকবে।"

"তুমি শুধু আমাকে হলফ দ্বারা খুশি করতে পারবে না" হিরাকেল বলেন। "আমি শুধু ইবনে ওলীদের মস্তক নয়; বরং সমস্ত মুসলমানের লাশ দেখতে চাই। ... এখনই দামেস্ক চলে যাও। সেখানে সাহায্যের প্রয়োজন। সবাই চলে যাও এবং একযোগে দামেস্ক বাঁচাও।"

সকল সালার তৎক্ষণাৎ রওনা হয়ে যায়। হিরাকেলের কাছে শুধু তার এক ব্যক্তিগত উপদেষ্টা ছিল।

"সম্রাট হিরাকেল!" ঐ উপদেষ্টা বলে। "সালার কুলূসকে দামেস্কে না পাঠালে ভাল হত। যদি তাকে পাঠাতেই হয় তাহলে সালার আযাযীরকে দামেস্ক হতে প্রত্যাহার করুন।"

"কেন?"

সম্রাট কি ভুলে গেছেন যে, তাদের দু'জনের মাঝে এমন বিরোধ রয়েছে যা শত্রুতার রূপ পরিগ্রহ করতে পারে" উপদেষ্টা বলে। "তাদের পরস্পরের মধ্যে বাক্যালাপ বন্ধ।... মূলত কুলূস আযাযীরের খ্যাতি ও প্রসিদ্ধতায় হিংসা করে। অন্য কারণও হতে পারে।"

"তবে কি তুমি আশংকা করছ যে, তারা যুদ্ধের সময়ে একে অপরের ক্ষতি করতে চেষ্টা করবে?" হিরাকেল জিজ্ঞাসা করেন।

"জ্বি হাঁ সম্রাট!" উপদেষ্টা বলে "আমি এমন শংকাই অনুভব করছি।"

"এমনটি হবে না" হিরাকেল বলেন। "তাদের এ কথা তো অবশ্যই জানা থাকার কথা যে, তারা এক হয়ে না লড়লে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হবে। তারা আমাকে খুশি করতে এবং অন্যকে আমার দৃষ্টি হতে ফেলে দিতে অমিততেজে লড়বে।... যদি তারা একে অপরকে ক্ষতি করতে চেষ্টা করে তাহলে তাদের অবশ্যই জানা আছে যে, তার শাস্তি কেমন হবে।"

উপদেষ্টা সম্রাটের কথা শুনে চুপ হয়ে যায় কিন্তু তার চেহারায় উদ্বেগের চিহ্ন আরও প্রকটভাগে প্রকাশ পায়।

[উপন্যাসটি ৬ষ্ঠ খন্ডে সমাপ্ত]

অন্তত একবার পড়ুন

ইতিহাস স্তব্ধ। সমর বিশেষজ্ঞগণ বিস্মিত। সকলের অবাক জিজ্ঞাসা - ইয়ারমুকের যুদ্ধে মুসলমানরা রোমীয়দের কিভাবে পরাজিত করল? রোমীয়দের সেদিন চূড়ান্ত পরাজয় ঘটেছিল। এ অবিশ্বাস্য ঘটনার পর বাইতুল মুকাদ্দাস পাকা ফলের মত মুসলমানদের ঝুড়িতে এসে পড়েছিল।

এটা ছিল অভূতপূর্ব সমর-কুশলতার ফল। ইয়ারমুক যুদ্ধে হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রহ.) যে সফল রণকৌশল অবলম্বন করেছিলেন আজকের উন্নত রাষ্ট্রের সেনা প্রশিক্ষণে তা গুরুত্বের সাথে ট্রেনিং দেয়া হয়।

ইসলামের ইতিহাস অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ির সম্মুখীন হয়েছে। বিভিন্ন ঐতিহাসিক এবং জীবনীকার কোন কোন ঘটনায় পদস্খলনের শিকার হয়েছেন। একই ঘটনা একাধিকরূপে চিত্রিত হয়েছে। ফলে তা হতে সত্য ও বাস্তব তথ্য আহরণ পাঠকের জন্য গলধঃকরণের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।....

এ উপন্যাসের প্রত্যেকটি ঘটনা সত্য-সঠিকরূপে পেশ করতে আমরা বহু গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছি। সম্ভাব্য যাচাই-বাচাই করেছি এবং অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তা লিখেছি।

যে ধাঁচে এ বীরত্বগাঁথা রচিত, তার আলোকে এটাকে একটি উপন্যাস বললে বলতে পারে, কিন্তু এটা ফিল্মি স্টাইল এবং মনগড়া কাহিনী-নির্ভর বাজারের অন্যান্য ঐতিহাসিক উপন্যাসের মত নয়। এর পাঠক উপন্যাসের চাটনিতে ঐতিহাসিকতার পথ্য গলধঃকরণ করবেন গোগ্রাসে। এতে ঐতিহাসিকতা বেশী, ঔপন্যাসিকতা কম।

এটা কেবল ইতিহাস নয়, ইসলামী ঐতিহ্যের অবয়ব। মুসলমানদের ঈমানদীপ্ত কাজ। পূর্বপুরুষের গৌরব-গাঁথা এবং মুসলিম জাতির জিহাদী জযবার প্রকৃত চিত্র। পাঠক মুসলিম জাতির স্বকীয়তা জানবেন, [illegible] উপভোগ করবেন এবং রোমাঞ্চ অনুভব করবেন।

বাজারে প্রচলিত চরিত্রবিধ্বংসী উপন্যাসের পরিবর্তে সত্যনির্ভর এবং ইসলামী ঐতিহ্য-উদ্ভূত উপন্যাস পড়ুন। পরিবারের অপর সদস্যকে পড়তে দিন। নিকটজনদের হাতে তুলে দিন মুসলিম জাতির এ গৌরবময় উপাখ্যান।

এনায়েতুল্লাহ আলতামাশ

ISBN-984-32-1818-3

পরিবেশক

আল হিকমাহ্ পাবলিকেশন্স

(মাতৃভাষা বাংলায় বিশুদ্ধভাবে ইসলামী জ্ঞান সম্প্রসারণের একটি নিবেদিত প্রয়াস)

১১/১, ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন: ০১৫১১-৪২৩৫২১, ০১৯১৩-৪২৭২২৫